পাঁচমুড়োর পঞ্চাননমঙ্গল

প্রীতম বসু

BanglaBook.org

"১২০০ হইতে ১৪৫০ অব্দের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের কোনো নিদর্শন তো নাই-ই, বাঙ্গালা ভাষারও কোনো হদিশ পাওয়া যায় না।"

—ডঃ সুকুমার সেন
(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস)

কেমন ছিল সে যুগের বাংলা ভাষা, বাংলা লিপি?

চয়নবিলের তলা থেকে আবিস্কৃত হল পাথরে খোদাই করে ১৪০০ সালের কথ্য বাংলা ভাষায় ও লিপিতে লেখা পঞ্চাননমঙ্গল কাব্য। কিন্তু সেখানে কেন পঞ্চানন ঠাকুরের পূজার মন্ত্রে আমাদের পূর্বপুরুষরা লুকিয়ে রেখেছিল অজস্র আধুনিক অঙ্কের সূত্র?

ছ'শ বছর আগেকার বাঙালীর অজস্র অজানা পারদর্শিতার আলেখ্য দেখে গর্বে বুক ফুলে উঠবে, কিন্তু এক অশুভ বৈদেশিক শক্তি পঞ্চাননমঙ্গল ধ্বংস করার জন্য কেন উন্মত্তপ্রায়? বক্তিয়ার খিলজি নালন্দা ধ্বংস করে তিন মাস ধরে মহামূল্যবান পুঁথি পুড়িয়ে আমাদের অতীত মুছে দিয়েছিল। তবে কি পঞ্চাননমঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাবে প্রাচীন বাঙালীর বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শনের শেষ দলিল?

পাঁচমুড়োর পঞ্চাননমঙ্গল

পাঁচমুড়োর পঞ্চাননমঙ্গল

প্রীতম বসু

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

Pnachmuror Panchananmangal
by
Pritam Basu

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল, ২০১৫
দ্বিতীয় প্রকাশ
১৫ আগস্ট, ২০১৭

স্বত্ব প্রীতম বসু

প্রকাশক
প্রীতম বসু
56 Valleywood Drive
Glenville, NewYork 12302 USA
518-372-7359 (USA)

৯সি শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন
কলকাতা ৭০০ ০৫৪

যোগাযোগ : ৯১ ৮৫৮৪৯ ৩৩৮৫৮
basupritamalb@yahoo.com

প্রচ্ছদ : দেবাশীষ রায়

মুদ্রণ :
রায় এন্টারপ্রাইজ
কলকাতা

মূল্য (ভারত) ১৫০ টাকা

মার্জনাদি, রত্নেশ্বরকাকু, অনিরুদ্ধ

এবং

বাবুদাকে

"পাঁচমুড়োর পঞ্চাননমঙ্গল" এর সকল ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। কোনও জীবিত অথবা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কোনও মিল থাকলে তাহা নিতান্তই আকস্মিক।

প্রাককথন

১৪২৬ সাল

অত্যধিক বর্ষণে বেগবতীতে ঝাঁড়াঝাঁড়ির বান ডেকেছে। দোনা, দুনি, ছিপ, ডিঙি, ভেলা, বালাম কারও চিহ্নমাত্র নেই কূলপ্লাবী বেগবতীর স্ফীত তরঙ্গায়িত শরীরে। দু-চারজন পাটাবুক ধীবর এ পরিস্থিতিতেও দুর্বার ঝঞ্ঝার সঙ্গে লড়াই করে দোদুল্যমান নৌকোর ভিজে চুবুচুবু পিয়াল পাটায় দাঁড়িয়ে বেগবতীর গর্জনের দিকে ঝাঁকিজাল ছোড়ে বটে, কিন্তু আজ সুলতানের আদেশে বল্লালগ্রামের কোনো মাল্লার সাহস নেই বেগবতীর জলে একটা কাঠের পাটাতনও ভাসায়।

বাদলা অপরাহ্নের প্রায় মুছে যাওয়া আলোকে সুলতানের রণপোত বল্লাল গ্রামের ঘাটে নোঙর ফেলল। রণতরী থেকে বেরিয়ে সহস্রাধিক বর্মাবৃত পদাতিক সেনা তির, ধনুক, ঢাল, কুঠার, ভল্ল, বল্লম, কুকরি, কৃপাণ, মশাল, ধ্বজাদণ্ড, রণবাদ্য হাতে গ্রামের জলমগ্ন পথে শ্রেণিবদ্ধ ভাবে চলে উপস্থিত হল চয়নবিলের পাড়ে। অগ্রভাগে অশ্বপৃষ্ঠে তরবারি হস্তে সুলতানের সেনাপতি অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে স্তম্ভিত হয়ে লক্ষ্য করল যে সুলতানের আদেশে যে মন্দির ধ্বংস করতে সুদূর গৌড় থেকে আসা, জমিতে সে মন্দিরের লেশমাত্র চিহ্ন নেই, মন্দির যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

'কোথায় মন্দির?' সেনাপতি গর্জে উঠল।

'কাল সূর্যাস্তেও মন্দির এই মাটিতে দেখেছি।' সুলতানের বল্লালগ্রামের চর কসম খেয়ে বলল। 'এত বড়ো পাথরের মন্দির, বিশাল বিগ্রহ সব ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেল? অবিশ্বাস্য।'

সেনানীর মধ্যে ভয়ের গুঞ্জন পর্ণমোচীর বনে শীতের হাওয়ার মত ছড়িয়ে গেল—'শয়তান তার মন্দির উড়িয়ে নিয়ে গেছে জাহান্নামে। "শয়তানের পুঁথি"তে নাকি ঠিক এরকমই লেখা আছে।'

'বেঁধে আন পুরোহিতকে', ক্রুদ্ধ সেনাপতি আদেশ দিল।

দু-জন সেনা মন্দিরের পাশে পুরোহিতের চারচালা তন্নতন্ন করে খুঁজে এসে বলল—পুরোহিতের কোনো সন্ধান নেই।

'পুরোহিত ঐ সঙ্ঘারাম-বিহারে সন্ধ্যা অতিবাহিত করে,' চর চয়নবিলের পশ্চিমতীরের বৌদ্ধমঠ দেখিয়ে বলল।

'বৌদ্ধ-বিহারে হিন্দু ব্রাহ্মণ পুরোহিত সন্ধ্যা কাটায়?' সেনাপতির কণ্ঠে অবিশ্বাস।

'আমি স্বচক্ষে দেখেছি,' গুপ্তচর বলল। 'বিহারে শুধু স্তূপাকৃত পুঁথি। কোনোটা আধপোড়া, কোনোটা ভেঙেচুরে গেছে, কোনোটা বা বন্যার জলে প্রায় মুছে গেছে। সেই সব পুঁথি সেখানে নকল করা হয়, পুঁথি নকলের পর সেই পুঁথি নাকি হিমালয়ের বরফ ঢাকা গিরিপথ পেরিয়ে তিব্বতের বৌদ্ধবিহারগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়—দ্রেপাং, দোরজি দ্রাক, মেনরি—'

'ধরে আন ওকে,' অসহিষ্ণু সেনাপতি আদেশ দিল।

আয়ুধ হস্তে পদাতিক সেনারা হৈ হৈ করে ছুটে বৌদ্ধবিহারে পৌঁছে দেখল বিহারের বহির্দ্বার উন্মুক্ত, বিহার আজ জনহীন, সেখানে বিভিন্ন কক্ষে স্তূপাকৃত হাজার হাজার তালপাতার পুঁথি ; পুরোহিতের সন্ধান পাওয়া গেল না।

—আগুন লাগা, ক্রুদ্ধ সেনাপতি আদেশ দিল।

মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা ভারী বর্ষণের সঙ্গে লড়াই করে আকাশের বাদল মেঘের দিকে ধূম্রকুণ্ডলীর স্পর্ধা ছুঁড়ে দিল। খড়, বাঁশ, পুঁথির শুকনো তালপাতা অগ্নিতে ইন্ধন জুগিয়ে অমানিশা মুছে চড়চড় করে ফাটতে লাগল, জ্বলতে লাগল কয়েক'শ বছরের বাঙালির দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য।

প্রায় এক প্রহর পরে, ভোরের নরম আলো ক্রুর অগ্ন্যালোকের সঙ্গে মেশার স্বল্প আগে, রণপোতের দিকে সেনাসহ ফিরে যাওয়ার সময় সুলতানের সেনাপতি ভাবতে লাগল কী ভাবে অত বড়ো একটা মন্দির এক রাতে ভোজবাজির মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল?

BanglaBook.org

॥ এক ॥

১৯৯৬ সাল

পাঁচমুড়োর জমিদার বাড়ির বৈঠকখানায় কালাচাঁদ চোরের মনে টানটান উত্তেজনা। বৃদ্ধ জমিদার সদানন্দ ভট্টাচার্য গত আধঘণ্টা ধরে চুপচাপ ঘড়ি সারানোর লেন্স চোখে লাগিয়ে, ফাটা শ্বেতপাথরের টেবিলে ঝুঁকে, একটা ঘুণদষ্ট, জীর্ণ তালপাতার পুঁথি নিরীক্ষণে ব্যস্ত, জমিদারের বাঁপাশে একটা মোড়ার ওপর কালাচাঁদ চোর টেনশনে দাঁত দিয়ে কুটকুট করে ডান হাতের নখ কেটেই চলেছে এবং ডানপাশে চেয়ারে কোট-টাই পরা মাঝবয়স্ক এক ভদ্রলোক। সদানন্দ ভটচাজ এবার বিড়বিড় করে পড়লেন—

বিধুর পাছেঁত নেত্র পক্ষশূন্য।
নবহুঁ নবহুঁ গীত রসে পুণ্য॥

কালাচাঁদ একটা বড়োসড়ো নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'বাব্বা, এ যেন চোরকাঁটা ভরা মাঠ থেকে অষ্টফলক দুব্যোঘাস খুঁজে আনার কাজ। কম মেহনত কর্তামশাই? কিন্তু আমিও কি হারবার পাত্র? ঠিক খুঁজে এনেছি। হেঁয়ালিটা দেখেই আমার কেমন যেন সন্দেহ হল—বিধু মানে চাঁদ, এক-য়ে শস্ত্র, তার পশ্চাতে নেত্র, তিন-য়ে নেত্র, তার মানে হল তেরো—'

যাকে এত সব বলা সেই কর্তামশাই কালাচাঁদের উৎসাহের আতিশয্যে এতটুকু প্রভাবিত না হয়ে বিড়বিড় করে পড়ে চললেন—

বাশুলি আদেশ শুনি গৌরচন্দ্রিকা ভণি
পদাবলী রচে চণ্ডিদাসে।
নাহিআঁ যমুনা নীরে রাধিকা উইল তীরে
যমুনা উছলিল উচ্ছ্বাসে।

BanglaBook.org

রূপের অনল কায় নয়ন ঝলসি যায়
ভাষা নাহি রূপ গান গাই।
ভুরুহীযুগল ধনু বিজুরি নাচএ তনু
তবু নিতি সুখহীনা রাই।
আনমনা আননে কদম্ব কাননে
পিআসিত আঁখি কারে খোঁজে।
শ্যামের পিরিতী বান মনে খরসোঁত টান
মোহনবাঁশীতে মন মজে॥

'ত্রিপদীর পদ্যটা কাকে দিয়ে লিখিয়েছিস?' সদানন্দ বললেন।

'আমি লেখাতে যাব কেন?' কালাচাঁদ প্রতিবাদ করল। 'এটা চণ্ডীদাস।' কালাচাঁদ হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল, 'আহা কী লেখা, রগরগে নায়িকার রূপ বর্ণনা অথচ ভক্তিরসে ভরপুর—রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ, কাম গন্ধ নেই তায়—আ-হা।'

সদানন্দ ভ্রূ কুঁচকে আবার পড়লেন—'গৌরচন্দ্রিকা ভণি—'

'মহাজনী পদাবলি— ভাবলেই গায়ে শিহরন হয়,' কালাচাঁদ উত্তেজিত। 'চিদানন্দ কর্তা দেড় লাখে বেচার জন্য লোভ দেখালি, কিন্তু কালাচাঁদ পণ্ডিতের কথা ভীষ্মের বচন। চণ্ডীদাস আপনারই, পঞ্চাশ হাজার যদি কমও দ্যান, তবুও—'

চোখ থেকে লেন্সটা খুলে কালাচাঁদের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে সদানন্দ বললেন, 'এক থাপ্পড়ে বিয়াল্লিশটা দাঁত মুখ থেকে খসিয়ে দেব।'

'এর বিয়াল্-লিশটা দাঁত।' কোট-টাই পরা লোকটা অবাক।

'গাধাদের বিয়াল্লিশটাই থাকে,' সদানন্দ বললেন। 'তোর সাহস তো কম না, এ বাড়িতে জাল পুঁথি বেচতে এসেছিস।'

'জাল। অসম্ভব।' কালাচাঁদ বলল। 'এটা খাঁটি চণ্ডীদাস। সালটা ভালো করে দেখুন। দুইয়ে পক্ষ, পক্ষ শূন্য মানে বিশ। তেরো আর বিশ মিলিয়ে হল তেরোশো বিশ শকাব্দ। ৭৮ জুড়লে ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দ। ওই সময়ে কবি চণ্ডীদাস ছাড়া আর কোনো বাঙালি কবি ছিলেন যার এলেম ছিল এরকম কবিতা লেখার? তারপর নবহুঁ নবহুঁ—তার মানে—'

'আর এটা?' সদানন্দ তর্জনী দিয়ে পুঁথিতে টোকা মারলেন।

'গৌরচন্দ্রিকা ভণি,' কালাচাঁদ পড়ে বিজ্ঞের মতো বলল। 'আগেকার দিনে কবিরা কাব্যের শুরুতে গৌরচন্দ্রিকা লিখত।'

'ফেউরে বাঘের হাগার গন্ধ চেনাইতে আইসস?' সদানন্দের কথায় অষ্টি মাসের

BanglaBook.org

তাত। 'ষাট বছর ধরে তেরেট, তুলট, তালিপটের পিছনে ঘুরে ঘুরে গায়ের চামড়া তন্দুরের তাওয়ার মুরগির মতো ঝলসে ফেললাম, আর আজ শ্রীমান কৃষ্ণচন্দ্র তস্কর আইলেন আমায় গৌরচন্দ্রিকা শিখাইতে।' পুঁথিটা এক ধাক্কায় সরিয়ে সদানন্দ বললেন, 'শোন গাধা, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অঙ্গ ধবধবে গোরা ছিল তাই তাঁর নাম ছিল গৌরাঙ্গ। বৈষ্ণব কবিরা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের নাম স্মরণ করে পদাবলি লেখা আরম্ভ করতেন। গৌরাঙ্গের থেকেই এই গৌরচন্দ্রিকা কথাটা এসেছে।'

'তা এই পুঁথিতেও গৌরচন্দ্রিকা আছে, তবে গণ্ডগোলটা কোথায়?'

'আবার বলছিস গণ্ডগোলটা কোথায়? ফোর টোয়েন্টি!'

'আজ্ঞে, ফোর টোয়েন্টি না থার্টিন টোয়েন্টি—তেরোশো বিশ শকাব্দে—'

'চোপ! চারশো বিশ। চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের আটাত্তর বছর আগে জন্মেছিলেন। গৌরাঙ্গের জন্মের আগেই গৌরচন্দ্রিকা শব্দটা লিখল ক্যামনে?' তারপর সদানন্দ মাথাটা ঘুরিয়ে পিছনে রঙচটা প্লাস্টার খসা দেওয়ালে টানানো বিশাল বিশাল পিতৃপুরুষদের অয়েল পেন্টিংগুলোর দিকে তাকিয়ে কাকুতির স্বরে বললেন, 'নিজেরা সব পয়সাকড়ি মেয়েছেলের পিছনে না উড়িয়ে দিয়ে কিছু যদি অন্তত রেখে যেতে তবে পাঁচমুড়োর জমিদার বংশের শেষ প্রদীপ ঘি-এর বদলে এই কেরোসিন তেল দিয়ে জ্বালাতে হত না।'

এবার কালাচাঁদের মনে হল হরু ঠাকুর তাকে কবিরাজি পাচন বলে বিছুটি পাতার নির্যাস খাইয়ে দিয়েছে। এখন সম্মুখে ভাগান্তির একশেষ।

'কোথা থেকে গেঁড়িয়েছিস এটা?' সদানন্দের কঠোর গলা।

'আজ্ঞে, এটা—'

'ঠিক আছে, আমাকে না বললে পুলিশকে বলিস।'

কালাচাঁদ হাঁউমাঁউ করে কেঁদে উঠল—'চিঁ চিঁ—'

'চিঁ চিঁ করছিস কেন?'

'চিদানন্দ', কালাচাঁদ হরু ঠাকুরের নামটা চেপে গেল।

'চিদানন্দ তোকে ফুসলেছে? ওই চিটিংবাজটার পাল্লায় পড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে এই পাঁচমুড়োর অজ পাড়াগাঁয়ে সন্ধ্যার পর থেকে আমি ম্যালেরিয়ায় কাঁপি। অত রমরমা অ্যান্টিকের ব্যবসা—'

কালাচাঁদ হাঁউমাঁউ করে উঠল, 'মায়ের চিকিচ্ছের জন্যে বিশ হাজার টাকা চেয়েছিলাম, উনি বললেন—যা এই চণ্ডীদাসটা ইয়েটাকে বেচে টাকা জোগাড় কর।'

'ইয়েটাকে? ইয়েটাকে মানে কী?'

'আজ্ঞে,' কালাচাঁদ ভয়ে ভয়ে বলল—'বিয়াল্লিশ দাঁতওয়ালা—'

'গাধা? চিদানন্দ আমাকে গাধা বলল?'

কালাচাঁদ তটস্থ হয়ে মাথা নাড়ল।

'হারামজাদা চিদেটাকে শঙ্কর মাছের চাবুক দিয়ে চাবকালেও মাথা ঠান্ডা হবে না। ব্যাটা কঞ্জুষ, বাপের শ্রাদ্ধে পাঁচটি হাজার টাকাও খরচা করল না, ও তোকে খয়রাত করবে বিশ হাজার টাকা?'

কালাচাঁদ দু-কান মুলে বলল, 'মা কালীর দিব্যি কর্তামশাই, জানতাম না এটা জাল পুঁথি। জাল পুঁথি বেচলে হাতে কুষ্ঠ হয়। বাবা মরার আগে বলে গেছিল—কালা, চুরি কর আমার আপত্তি নেই, কিন্তু পুঁথি হল ইতিহাস, ওটা বিকৃত করবি না। না খেয়ে মরে যাবি, তবু ও পাপ কক্ষনো করবি নে।'

'লাস্ট-ওয়ার্নিং দিলাম,' সদানন্দ ভটচাজ বললেন। 'পরের বার শঙ্কর মাছের চাবুক দিয়ে চাবকাবো, তারপর পুলিশে দেব।' এরপর সদানন্দ সাড়হীন বাঁ হাতটা ডান হাত দিয়ে ধরে তুলে জোড় হাতে ভদ্রলোককে বললেন, 'আমাকে মাফ করবেন ডক্টর ধাড়া, আপনার অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করে দিলাম, কিন্তু জাল জিনিস আমি মরে গেলেও বেচব না।'

কালাচাঁদ কান মুললো—'এমনটি আর কক্ষনো হবে না কর্তামশাই, মা কালী বলছি।'

'কে জানিস ইনি?' সদানন্দ ভটচাজ বললেন। 'বিলেতে বড়ো বড়ো মিউজিয়ামে এনাকে সবাই তোয়াজ করে চলে। বিলেতে থাকেন বটে কিন্তু শিরা-ধমনীতে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী বইছে—একদম খাঁটি দেশের মৃত্তিকা হল এনার দেহ।'

'ভটচাজ মশাই, ওসব কথা ছেড়ে দিন,' ভদ্রলোক লজ্জা পেলেন।

'না না, আমায় বলতে দিন, এর জানা দরকার,' সদানন্দ ভটচাজ বললেন। 'লন্ডনে নিজের মিউজিয়াম আছে। দ্যাখান-দ্যাখান, ডক্টর ধাড়া, আপনার একটা ভিজিটিং কার্ড এই গাধাটারে, তবে ও বুঝবে আপনি কী লেভেলের লোক।'

ভদ্রলোক ইতস্তত করে কোটের পকেট থেকে কয়েকটা আইভরি রঙের বিজনেস কার্ড বের করে একটা কার্ড টেবিলে রেখে বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'মিউজিয়াম টিউজিয়াম নয়, ছোটোখাটো একটা গ্যালারি—'

'এরা অশিক্ষিত, গ্যালারি-ফ্যালারি বুঝবে না,' সদানন্দ বললেন। 'বাংলার স্বর্ণযুগের ইতিহাস ওনার ব্যক্তিগত মিউজিয়ামে থরে থরে সাজানো আছে, বুঝলি। কী চাস—চর্যাপদ থেকে শুরু করে রূপ গোস্বামী, রামাই পণ্ডিত, কাশীরাম দাস, ভারতচন্দ্র কী নেই? আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের মতো চুনোপুঁটিদের সঙ্গে ইনি কারবার করেন।'

'ঠিক আছে ভটচাজমশাই, আর বলতে হবে না।' ধাড়া যেন প্রসঙ্গটা শেষ হলে বাঁচে।

BanglaBook.org

কালাচাঁদ তেরছা চোখ দ্রুত বুলিয়ে নিলে কার্ডের ওপর—

ডক্টর অংশুমান ধাড়া,
ধাড়া গ্যালারি অফ ওরিয়েন্টাল আরকিওলজি,
গ্রেট রাসেল স্ট্রিট, লন্ডন—ডবুসি ওয়ান বি থ্রীডিজি,
ইউনাইটেড কিংডম

কালাচাঁদ চোরের হাজারটা দোষের মধ্যে একটা গুণ এই যে একবার কিছু দেখলে বা শুনলে তো ব্যাস, যেন পাথরে আঁক কেটে গেল, কিছুতেই মন থেকে মুছবে না।

'ছি ছি, বিলেতের লোকেরা যদি এটা ধরে ফেলত তবে? এই হারামজাদা, কান ধরে উঠবস কর,' সদানন্দের রাগ কমেনি।

'আঃ, কী হচ্ছে?' ধাড়া জোর করে পুঁথিটা বন্ধ করে কালাচাঁদের হাতে দিল। 'ওকে যেতে দিন।'

রাগে, লজ্জায় কালাচাঁদ অর্জুনের মতো প্রতিজ্ঞা করল যে আজ সূর্যাস্তের আগে হরু ঠাকুরের অন্ধের যষ্টি বাই-ফোকাল চশমাটা বাসের চাকার নীচে চুরমার করে দেবে, নাহলে ও চুরি করা জন্মের মতো ত্যাগ করবে। জোর করে তাকে এই পাঁচমুড়োতে পাঠালে, বললে—দো-আঁশলা কাস্টমার, ভালো দাম দেবে, বুড়ো কর্তার প্যারালিসিস হবার পর থেকে আর পুঁথি-টুথি পড়ে না। দালালি করে বুড়োও টু-পাইস কামাবে।'

'আর কক্ষনো তোর ছায়া যেন না পড়ে এই পাঁচমুড়োতে,' সদানন্দ ভটচাজ বললেন। 'সাহেবের কতটা দামি সময় নষ্ট করে দিল। নিয়ে আয় ব্যাটা ওই পাথরটা তুলে এদিকে।'

কালাচাঁদ চুপচাপ উঠে দাঁড়াল। হরু ঠাকুর ঠিকই বলে—রাজা হরিশ্চন্দ্র। কিন্তু বুড়ো যে পুঁথির সতীত্ব পরীক্ষা করে তাকে বেকায়দায় ফেলবে সেটা কালাচাঁদের হিসাবের মধ্যে ছিল না। যাক গে, যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন যত তাড়াতাড়ি বিদেয় হওয়া যায় ততই মঙ্গল—এসব ভাবতে ভাবতে উঠে দাঁড়াল কালাচাঁদ।

।। দুই ।।

বৈঠকখানার যেদিকে দেওয়ালে মুখ খেঁচানো বাঘের মুণ্ডুটা লটকানো আছে,তার ঠিক নীচে মেঝেতে একটা পেল্লায় কালো রঙের চৌকোনা পাথর দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো। পাথরটা তুলে কর্তামশাইয়ের কাছে আনতে আনতে কালাচাঁদের মতো ল্যাকপ্যাকে তালপাতার সিপাইয়ের প্যান্ট খুলে যাবার জোগাড়।

BanglaBook.org

'সাবধানে-সাবধানে,' সদানন্দ চেঁচিয়ে বলল। 'পাথরের একটা কণাও যদি খসে পড়ে, তোর মুণ্ডু খসিয়ে দেব। চোদ্দশো সালের শিলালিপি।'

হাতির ওজনের শিলালিপিটা তুলে আনতে কালাচাঁদের পা মাতালের মতো টলোমলো। কোনো রকমে সদানন্দ ভটচাজের পক্ষাঘাতগ্রস্ত পায়ের কাছে এনে পাথরটা রাখল।

'এত পুরোনো শিলালিপি আপনার পাঁচমুড়োর বিলের নীচে এত বছর পড়েছিল? সত্যি কি আশ্চর্য,' ধাড়া বলল।

'এটা দেখাবার জন্যই তো আপনার এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনাকে লন্ডন থেকে তাড়াতাড়ি ডেকে আনালাম,' সদানন্দ বললেন। 'দু'দিনে খবর চাউর হয়ে যাবে চারদিকে আর সরকারি আরকিওলজি ডিপার্টমেন্টের লোকগুলো এসে শবদেহে শকুনের মতো হামলে পড়বে। চয়নবিলের জলের তলায় পাথুরে ঢাকা চোরাগুহা ছিল, এই ভূমিকম্পে সেই গুহার মুখটা ফেটে গেছে আর এই পাথরগুলো বেরিয়ে এসেছে। আরও অনেক এরকম পাথর আছে। ভাবলাম দু'দিনে সব প্রাচীন পাথর ভাগাভাগি হবে—কুকুরের বাচ্চা ভাগ করার মতো কোনোটা যাবে দিল্লির মিউজিয়ামে, কোনোটা বোম্বের, কোনোটা মাদ্রাজের। সরকার তো নিয়েই নেবে, ভাবলাম তার আগে আপনি আপনার মিউজিয়ামে না হয় দুটো পাথর রেখেই দেবেন। এত বছরের সম্পর্ক আপনার সঙ্গে। এর মধ্যে এই উটকো উচ্চিংড়ের মতো লাফাতে লাফাতে এই ব্যাটা কালাচোর জুটল বগলে চণ্ডীদাসের জাল পুঁথি নিয়ে!' সদানন্দের রাগ এখনো পড়েনি।

ধাড়ার চোখ খুশিতে রংমশাল। চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে লেন্স দিয়ে পাথরটার গায়ের লিপি দেখে বলল, 'বাংলা অক্ষরগুলো কেমন কেমন লাগছে না?' ধাড়া লেন্সে চোখ রেখে লিপিটা পড়ার চেষ্টা করে বলল, 'লেখাগুলো পড়ে কি বুঝতে পারছেন এখানে কী লেখা আছে?'

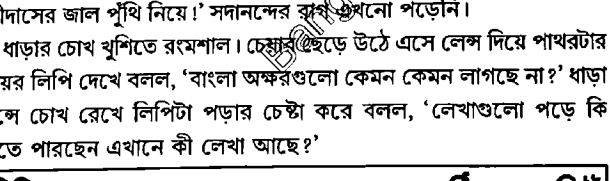

'আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, এখানে লিখে রেখেছি,' সদানন্দ ডান হাতটা পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে একটা কাগজ বের করে ধাড়াকে দেখাল—

ত্রিদিবেশ

চন্দ্রচূড় মহেশ্বর ধেআই চরণ।
চতুর্দ্দিশ ভকতীএঁ ভরায়িলেঁ মন॥
ঈশর ত্রিদশগণের শৈবলিনী মাথ।
পঞ্চানন দেহযুতী দেব ভোলানাথ॥
গ্রহ তারা ভজে সম্ঝে শিব শম্ভু দাতা।
হাথে বরাভয় দেব জগদীশ ত্রাতা॥
ঋতুচক্র তোহ্মার নামে নীললোহিত।
পঞ্চমুখ গুণগানে ভক্ত গাআঁ গীত॥
ত্রিলোচন তিন লোকেঁ দেব ত্রিদিবেশ।
পঞ্চবটী বনে দেব ধূর্জটি মহেশ॥
বসুন্ধরা পুজে তোহ্মে হর সব দুখ।
রসের সাগরে দেব ভরায়িলিঁ সুখ॥

'শিবের বন্দনা,' সদানন্দ থামলেন।

'শব্দগুলোর তো মানেই ঠিক মতো বোঝা যাচ্ছে না'—ধাড়া বলল। 'অনেক শব্দ কখনও শুনিই নি।'

'১২০০ থেকে ১৪৫০ সালের মধ্যে বাংলা ভাষাটা আশ্চর্য ভাবে যেন হঠাৎ লুকিয়ে পড়েছিল। এই সময়কার বাংলা কেমন ছিল তার কোনও হদিশ আমাদের বাঙালিদের কাছে নেই,' সদানন্দ বললেন।

'বলেন কি মশাই!' ধাড়া একথাটা প্রথমবার শুনছে।'

'পণ্ডিতেরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের কোনো নিদর্শন পায় নি এই আড়াইশো বছরের। তাই আমরা কেউ পরিচিত নই এই সময়কার বাংলার সঙ্গে। এই পাথরে লেখা ভাষা হল বিরল লভ্য সেই যুগের ভাষা,' সদানন্দ এক তৃপ্তির হাসি হাসলেন। 'তুর্কিরা এদেশে আসার আগে বা সেই সময় বাঙালি এই ভাষায় কথা বলত।'

'বলেন কি মশাই?' ধাড়া বলল। 'তবে তো এ পিওর গোল্ড। তবে এই আড়াইশো বছরের বাংলা সাহিত্যের কোনো নিদর্শন নেই কেন?'

'থাকবে কী ভাবে? সব বাংলা পুঁথিগুলোকে তুর্কী, আফগান, পাঠান ইত্যাদিরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল।' সদানন্দ দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

'আপনি বুঝলেন কী ভাবে যে এটা কোন কালের ভাষা?'

BanglaBook.org

'অক্ষরগুলো দেখে। ডোম্মনপালের সুন্দরবন তাম্রশাসন, লক্ষ্মণ সেনের অনুলিয়া তাম্রশাসন, বিজয় সেনের দেওপাড়া শিলালিপি পড়লে এই অক্ষরগুলোর সঙ্গে অনেক মিল পাবেন। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা অক্ষরগুলোতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। যেমন, আগেকার কালে 'চ' উলটো করে 'ব' এর মতো করে লেখা হত, এখন 'চ' সোজা করে লিখলেও 'ঞ্চ' এর চ-টা আজও উলটোই রয়ে গেছে। 'চ'-টা দেখুন একবার।'

ধাড়া ভালো ভাবে পাথরটা দেখে বলল, 'ঠিকই তো।'

'অক্ষরগুলো দেখে মনে হচ্ছে এই শিলালিপির বয়স চোদ্দশো সালের প্রথম দিকের বা মাঝামাঝি হবে।'

'হারিয়ে যাওয়া বাংলা ভাষা?' বিস্ময়ে ধাড়ার চোখের পাতা পড়ে না।

'কথার চালে চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে মিল আছে। তার মানে আমার অনুমান মিথ্যা নয়। তাছাড়া তেরশো-চোদ্দশো সালে এরকম ভাবেই বাংলা লেখা হত। প্রত্নলেখের অক্ষরগুলো দেখেই তো আমরা সাল তারিখ বলতে পারি। আপনার মিউজিয়ামে মানাবে ভালো।'

'লন্ডনে মিউজিয়ামে একটা বিশাল এক্সিবিশন করে এটা ইন্ট্রোডিউস করব, ' ধাড়া উত্তেজিত হয়ে হাতের তালুতে তালু ঘষল। 'আপনার পক্ষে যদি যাওয়া সম্ভব হত আপনাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতাম।'

সদানন্দ ডান হাত অনড় বাম হাতে বুলিয়ে বলল, 'ভগবান সে উপায় রাখেন নি। ডাক্তার অবশ্য বলেছে ভালো করে ফিজিওথেরাপি করলে এখনও হয়তো আশা আছে। কিন্তু—' সদানন্দ নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

ধাড়া কিছু বলার আগেই পড়িমড়ি করে একজন কাঁচাপাকা চুলওয়ালা লোক ঢুকে উত্তেজিত ভাবে বলল, 'কঙ্কাল! বাগদিরা চয়নবিলের নীচ থেকে একটা কঙ্কাল তুলে এনেছে।' সদানন্দ একটুও বিচলিত না হয়ে বললেন, 'ওটাকে আবার জলের নীচে ডুবিয়ে দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে বল।'

কাঁচাপাকা চুলওয়ালা লোকটা একবার অপরিচিত লোকদের সামনে বলবে কিনা ভেবে তারপর সদানন্দ ভটচাজের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কী বলতে লাগল, একবার সেলেট পাথরের দিকে আঙুল দিয়েও কী দ্যাখাল। কালাচাঁদ লক্ষ করল উত্তেজনায় সদানন্দ ভটচাজের চোয়াল যেন শিকার দেখা বিড়ালের মতো শক্ত হয়ে গেল।

'বলিস কি?' সদানন্দ ভটচাজ লাঠি ধরে কষ্ট করে উঠে দাঁড়ালেন—'ধাড়া সাহেব, আমি এখুনি আসছি, আপনি বসুন, চলে যাবেন না। আপনার কপাল ভালো থাকলে আজ একটা বিশাল কিছু দেখে যেতে পারবেন।' তারপর সদানন্দ

BanglaBook.org

ভটচাজ কালাচাঁদের দিকে তাকিয়ে হুকুম দিলেন, 'এই হতভাগা, সাহেবের হাত-পা টিপে দে ততক্ষণ।'

আগেকার দিনে এই পাঁচমুড়োর জমিদার বাড়িতে নাকি পালকি, সুসজ্জিত অশ্ব, হস্তী, ঝুমঝুমি লাগানো ঘোড়ায় টানা টমটম, উর্দি পরা সহিস ইত্যাদি থাকত ; আজ সদানন্দ ভটচাজের জমিদারবাড়ির গতাড়ম্বর সদর ফটকের পাশে দণ্ডায়মান সাইকেল রিকশা। কাঁচাপাকা চুলওয়ালা লোকটা এবং হাফপ্যান্ট পরা রিকশাচালক মিলে সদানন্দ ভটচাজকে ধরাধরি করে রিকশায় বসিয়ে দিল।

'চয়নবিলে চল,' সদানন্দ ভটচাজ বললেন। রিকশা চলতে লাগল আর কাঁচাপাকা চুলওয়ালা লোকটা পাঁচিলের পাশে গুয়েবাবলা গাছে শিকল দিয়ে বাঁধা সাইকেলের তালা খুলে সাইকেলে চেপে রিকশার পিছনে পিছনে চলতে লাগল।

এবার ধাড়া নামের লোকটা পকেট থেকে ক্যালকুলেটরের মতো যন্ত্র বের করে তাতে নম্বর টিপে টিপে কানে লাগিয়ে বলল—হ্যালো। তারপর ইংরেজিতে ফটাং-ফটাং করে কী কী বলতে লাগল। কালাচাঁদ সেদিনই প্রথম পকেট টেলিফোন দেখল। কর্তামশাই যদি গাধা-টাধা বলে ইজ্জত ধূলিসাৎ না করে যেত তবে কালাচাঁদ নিশ্চয়ই যন্ত্রটা একবার হাতে নিয়ে দেখত। এখন আর সাহস হচ্ছে না চাইবার। লোকটা অবহেলা করে কালাচাঁদের দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। কিন্তু ও জানে না কালাচাঁদের মস্তিষ্কে শিয়ালের ঘিলু। সে সাহস করে গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'স্যার আপনার একটা কার্ড রাখতে পারি?'

ধাড়া নিরুত্তর।

'আমরা তো গ্রামে গ্রামে ঘুরে পুঁথির খোঁজ করি, সব পুঁথিই যে খারাপ হবে তার তো কোনো মানে নেই। যদি কোনো পুরানো পুঁথি-টুথি পেয়ে যাই—তবে ভাবছিলাম আপনাকে—এই মানে সস্তায় পেয়ে যাবেন। আমাদের রেট তো আর কর্তামশাই এর মতো এত বেশি না। একবার ট্রাই করে—'

এবার ধাড়া লোকটা চোখ তুলে বলল, 'আমরা খুব চেনাশোনা লোক না হলে জিনিস কিনি না।' আবার ধাড়ার চোখ ফোনে। কালাচাঁদ এবার তুরুপের তাসটা ফেলল—'একটাকিয়ার ভাতুড়িয়াদের এক বংশধরকে চিনি,' কালাচাঁদ গলার আওয়াজ নামিয়ে আনল। 'পিতৃপুরুষের টাকা-কড়ি-মোহর এসব রেস খেলে উড়িয়ে বাবু এখন পুঁথিগুলোতে হস্ত রেখেছেন। এক ট্রাঙ্ক পুঁথি, মা কালীর দিব্যি স্যার, নিজের চোখে দেখেছি। অল্প বয়স, সেয়ানা মাল,' কালাচাঁদ জিভ কাটল, 'সরি স্যার'। এবার গলা আরও নামিয়ে বলল, 'যদি চান তবে একটা গোপন মিটিং-এর ব্যবস্থা করিয়ে দিতে পারি। কাকপক্ষীতেও টের পাবে না।' ধাড়ার শরীরে যে একটা শিহরন বহে গেল সেটা কালাচাঁদ বেশ বুঝতে পারল।

BanglaBook.org

'রেখে দাও কার্ডটা,' ধাড়ার গলার স্বর যেন একটু নরম—'আমাদের বিজনেসে গোপনীয়তা খুব এসেন্সিয়াল। আমরা সরকারি ঝামেলায় ফাঁসতে চাই না।'

'মা কালীর দিব্যি স্যার,' কালাচাঁদ চটপট কার্ডটা পকেটে ঢোকাল।

'এটাও রেখে দাও, এটা আমার হোটেলের কার্ড। একটা ফোন করে একটাকিয়ার ভাতুড়িয়াদের যুবরাজকে নিয়ে চলে এস—কথাবার্তা হবে। তোমার নাম ঠিকানাটা এখানে লিখে দাও। আর কাক-পক্ষী ব্যাপারটা যেন মাথায় থাকে।' ধাড়া একটা ছোটো কাগজ দিল, কালাচাঁদ সেখানে নিজের নাম-ঠিকানা লিখে দিতে ধাড়া সেটা কোটের পকেটে রাখল। কালাচাঁদ বলল—'ফোন তো নেই—'

কাঁচাপাকা চুলওয়ালা লোকটা হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল, কালাচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে চুপ। লোকটা উত্তেজিত হয়ে ধাড়াকে বলল, 'শিগগির চলুন, কর্তাবাবু আপনার জন্যে রিকশা পাঠিয়েছেন।'

ধাড়ার ভুরুতে বিস্ময়—'ভটচাজ মশাই কোথায়?'

'চয়নবিলে। বললেন শিগগির ডেকে নিয়ে আয় সাহেবকে।'

'এই চয়নবিল নিয়ে হঠাৎ এত তোলপাড় কেন বল তো?' ধাড়া জিজ্ঞাসা করল।

'হঠাৎ হতে যাবে কেন? চয়নবিলের রূপকথা তো ছোটোবেলা থেকেই শুনে আসছি,' কাঁচাপাকা চুল বলল। 'বারো ভুঁইয়াদের কোনো এক ভুঁইয়া যেন মোগল না কাদের আক্রমণের সময় প্রাসাদের সোনাদানা এই বিশাল জলাশয়ের নীচে লুকিয়ে ফেলেছিল। কত লোক যে কতবার ডুবুরি নামিয়ে জাল ফেলে খোঁজাখুঁজি করেছে তার কি কোনো ইয়ত্তা আছে? গতমাসে যে বিশাল ভূমিকম্পটা হল তাতে নাকি বিলের নীচের জমি ফেটে অনেক কাঁসার বাসনপত্র, পিতলের দেবদেবীর মূর্তি এসব পাওয়া গেছে। এতে জমিদারবাবুর গুপ্তধনের বাসনা আবার জেগে উঠল। বাগদিদের জলে নামিয়ে জাল ফেলে খোঁজাখুঁজি শুরু করতেই বেরিয়ে এল এইসব পাথর। চলেন স্যার, দেরি হলে জমিদারবাবু রাগ করবেন।'

ধাড়া ব্যস্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এল, পিছনে পিছনে কালাচাঁদ। রিক্সাওয়ালা রিক্সার সামনের চাকার সামনে বসে কী সব মেরামতি করছিল। সেদিকে ধাড়া তাকিয়ে আছে দেখে কাঁচাপাকা চুল বলল—'বেয়ারিং খুলে সামনের চাকাটা বেরিয়ে গড়গড়িয়ে খালে নেবে গেছিল, তাই আসতে একটু দেরি হল।'

'ওই ভাঙা রিক্সায় আমি যাব না,' ধাড়া দৃঢ়কণ্ঠে বলল।

'নাটবল্টুগুলো টাইট করে নিলেই দেখবেন এই রিক্সা পক্ষীরাজের মতো গেরামের পথে উড়ে যাবে,' কাঁচাপাকা চুল বলল।

'গাড়ি যাবে না?' ধাড়া বলল।

কাঁচাপাকা চুলওয়ালা লোকটা দাঁত বের করে বলল, 'আপনার অত বড়ো

গাড়ি কি আর গেরামের রাস্তায়—' তারপর বোঝাবার সুবিধের জন্য সুর করে একটা উপমা দিল, 'ময়ূরপঙ্খি কি আর খালে মানায়? তবে পিছনে শর্টকার্ট হাঁটা রাস্তা আছে।'

কালাচাঁদ বলল, 'পক্ষীরাজ, ময়ূরপঙ্খি—আপনি কবিতা লেখেন বুঝি?'

লোকটা লাজুক মুখে বলল, 'হ্যাঁ, একটু-আধটু। সারাদিন জমিদারবাবুর কাজ করি আর রাতে নিজের জন্য সময় বাঁচিয়ে একটু কবিতা লিখি—'

'আপনার নাম কী?'

'দুলাল। জমিদারবাবুর নায়েব, গোমস্তা, বাজার সরকার, ফুলটাইম কাজের লোক সবই আমি।'

'চল, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই।' কালাচাঁদ ভাবল আজকের আসাটা বৃথা হল না, একটা শাঁসালো কাস্টমারের সঙ্গে যোগাযোগ হল। হরু ঠাকুর নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে। তবে শিবের কবিতাটা বড্ড বড়ো আর কঠিন কঠিন শব্দ, মনে রাখা মুস্কিল। চৌর্যবৃত্তির স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশত কালাচাঁদের হাতের দুটো বিশ্বস্ত আঙুল সফলের অজান্তে ত্রিদিবেশের কবিতার কাগজটা তুলে তার প্যান্টের পিছনের পকেটে গুঁজে দিল। চোরদের নাকি একটা সজাগ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে, সে কথা যদি সত্যি হয় তবে কালাচাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস এই পাঁচমুড়োতে কোনো বিশাল রহস্য লুকিয়ে আছে। তাকে আরও সজাগ থেকে জানতে হবে কী সেই রহস্য?

BanglaBook.org

।। তিন ।।

রহস্যের আভাস পেতেই কালাচাঁদ চোরের পাঁচটা ইন্দ্রিয় যেন নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেল। মনে তীব্র উত্তেজনা চেপে জমিদার বাড়ি থেকে পিছনের সরু রাস্তায় ধাড়া আর দুলাল নায়েবের পিছনে পিছনে হেঁটে চলল কালাচাঁদ, পিছনে লেজুড়ের মতো চলল রাস্তার একটা কৌতূহলী অর্ধনগ্ন রুগ্ন বাচ্চা ছেলে, ঘুনসিতে কড়ি বাঁধা। পাঁচমুড়ো গাঁয়ের স্টেশন রোডেই একমাত্র কালেভদ্রে পিচ ঢালা হয়, গাঁয়ের বাকি সব রাস্তা ইটখোলার পরিত্যক্ত ভাঙা ইট, ঘেঁস, খোয়া ফেলা নড়বড়ে। খড় বা উলুর ছাউনি দেওয়া মাটির কুঁড়ে তাতে দরমার আগড়, কঞ্চির বেড়া, বোটকা গন্ধে ভরা কচুরিপানায় ঢাকা পুকুর, রাস্তার পাশে হেলায় বেড়ে ওঠা বনঝামা, ফণিমনসা, আশ-শ্যাওড়া, হরকোচের ঝাড়। টিনের চাল দেওয়া শীতলা মন্দির, পাশে টিউকল, মুদির দোকান, ঘুঁটে আটকানো পাঠশালার মাটির দেওয়াল পেরিয়ে, বাঁশবনের পাশ দিয়ে চাষের মাঠে এসে রাস্তা শেষ। এটাই নাকি শর্টকাট, রিক্সা যায় স্টেশন রোড দিয়ে অনেক ঘুরে।

মাঠের আলের ওপর দিয়ে মিনিট দশেক হেঁটে ধাড়া হাঁপিয়ে থেমে থেমে চলতে লাগল। দুলাল নায়েব গম্ভীর গলায় বলল—'স্যার, একটা খরিশকেউটে কাল বিকালে ঠিক এইখানেই গগন ঢালির নাতিটাকে তেড়ে এসে পায়ের ওপর ছোবল মেরে মুখের বাঁদিকের বিষের ঠুলিটা খালি করে দিয়েছিল। হাসপাতালে যমে-মানুষে টানাটানি চলছিল, এতক্ষণে বোধহয় একটা ডিশিসন হয়ে গেছে। জায়গাটা ভালো না, একটু পা চালাতে হবে।'

আঁতকে উঠে বাকি পথ ধাড়া পক্ষীরাজের মতো উড়ে উড়ে শেষ করল—বিশ মিনিটে চয়নবিল।

চয়নবিলের ধারে আট-দশজন দেহাতি মানুষের জটলা, একটা হাড় জিরজিরে বুড়ো বসে বসে পায়ের বুড়ো আঙুলের ফাঁকের হাজা চুলকাচ্ছে। বিলের পাড়ে শরবাছির ঝোপের পাশে কিছু বড়ো বড়ো স্লেটের পাথর ডাঁই করে রাখা, কালাচাঁদ বুঝল এগুলোই জলের নীচ থেকে তোলা হয়েছে আর এদের আড়ালেই কঙ্কালটা ছিল। বটগাছের গোড়ার একটা মোটাসোটা শিকড়ে বসে সদানন্দ ভটচাজ ঝুঁকে কী যেন দেখছে। কালাচাঁদ কাছে এসে ভাঙাচোরা কঙ্কালটা দেখতে পেল—বুকে লোহার শিকল দিয়ে একটা বড়োসড়ো স্লেটে পাথর বাঁধা। লোহার শিকল মরচে ধরে প্রায় গলে গেছে। কঙ্কালের বুকের পাথরের ফলক খোদাই করে কিছু একটা লেখা, শ্যাওলা আর মাটিতে ঢাকা।

একটা দেহাতি লোক পাথরটা সাবধানে জল দিয়ে পরিষ্কার করছে। কালাচাঁদ ভাঙাচোরা কঙ্কালটার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল। ধীরে ধীরে লেখাটা ফুটে উঠতে লাগলে পাথরে। সদানন্দ ভটচাজ উত্তেজিত—কষ্ট করে ভেঙে ভেঙে লেখাটার পাঠোদ্ধার করতে লাগলেন—

ছান্দে অঙ্কে পক্ষী পদ্ম বান্ধে নন্দীধন।
পঞ্চমুন্ডে পঙ্কে গুপ্ত কাব্য পঞ্চানন॥

'তার মানে পঞ্চাননমঙ্গল সত্যি সত্যি ছিল!' সদানন্দ ভটচাজের চোখের দৃষ্টিতে যুগপৎ বিস্ময় ও রহস্য উদ্ধারের খুশি মিলেমিশে একাকার। তারপর একটু ধাতস্থ হতে ধাড়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শয়তানের পুঁথি। আমরা বাঙালির হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের এক রহস্যময় বন্ধ দরজার সামনে উপস্থিত হয়েছি। এ দরজা যদি খুলে যায় তবে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এক অসামান্য কৃতিত্ব দেখতে পাব।'

ধাড়া তখনও হাঁপাচ্ছিল, ঝুঁকে প্যান্টের নীচের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'ব্যাপারটা কী একটু বুঝিয়ে বলবেন। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। এই পঞ্চাননমঙ্গল ব্যাপারটা কী?'

সদানন্দ চুপ করে কী ভাবলেন, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'পঞ্চাননমঙ্গল এক রহস্যে মোড়া প্রাচীন কাব্য। এই কাব্য কেউ কখনো দেখেনি, শুধু জনশ্রুতিতে বেঁচে আছে। যেমন সাপের মাথার মণির কথা সকলে শুনেছে, কেউ দেখেনি—সেরকম। আরবরা নাকি একে বলতো 'শয়তানের পুঁথি' আর তাই ওরা এই পুঁথি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল। এর কথা বলতে গেলে রাত ভোর হয়ে যাবে, আমার গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠছে।' কঙ্কালের দু'পায়ের ভাঙা গোড়ালি ধরে সদানন্দ ভটচাজ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। তারপর ধুতির কোঁচা দিয়ে চোখ মুছে বললেন, 'এনাকে সসম্মানে দাহ করতে হবে। এঁর জন্যেই পাঁচমুড়োর মানুষের বংশনাশ হয়ে যায় নি।'

কালাচাঁদের মনে হল যে একটা বিশাল কিছু আবিষ্কার হয়েছে, কাহিনিটা কী সেটা না জানা অবধি তার তর সইছে না। ধাড়ার অবস্থাও তথৈবচ। ধাড়া সতর্ক ভাবে বলল, 'একটা কঙ্কাল পুড়িয়ে দেবেন, পুলিশে খবর দেবেন না?'

'নাঃ,' সদানন্দ ভটচাজ বললেন। 'পনেরো শতাব্দীর এই কঙ্কাল দিয়ে পুলিশ কী তদন্ত করবে? তার চেয়ে এনাকে এবার শান্তিতে স্বর্গে যেতে দিন, লোকের পুণ্যের জন্যে অনেক কষ্ট করেছেন। আর পুলিশের টানাহ্যাঁচড়ার দরকার নাই।'

'প-নে-রো-শতাব্-দী! মানে ফিফটিনথ সেঞ্চুরি!' ধাড়ার চোখ কপালে। 'বলেন কি মশাই! সে তো চৈতন্যদেবের আমলের চেয়েও পুরোনো।'

'তা হবে। জনশ্রুতি হল পঞ্চাননমঙ্গল সেই আমলেই পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল।'

'ভটচাজমশাই, অন্নদামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এসবের কপি আমার মিউজিয়ামে আছে—কিন্তু পঞ্চাননমঙ্গলের নাম কখনও শুনিনি।'

সদানন্দ ভটচাজ বললেন, 'পঞ্চাননমঙ্গল অতীতে মুছে যাওয়া একটা অতি বিতর্কিত পুঁথি। অনেক বলে, এই পুঁথির পঞ্চানন স্তোত্রে শিব মহিমার আড়ালে কিছু প্রাচীন বৈদিক যুগের এমন কিছু গুপ্তকথা লিখে রাখা ছিল, যা নাকি আরবের পণ্ডিতরা পড়ে তাদের জন্যে শয়তানের হুমকি বলে মনে করেছিল।'

'ডবল মিনিং! স্ট্রেঞ্জ!' ধাড়া বলল।

'ডবলমিনিং আমাদের প্রাচীন কাব্যে নতুন কিছু নয়,' সদানন্দ ভটচাজ বললেন। 'বৈদিকযুগ থেকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা কাব্যে হেঁয়ালি ব্যবহার করে আসছে। চণ্ডীমঙ্গলে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লিখেছেন—

'প্রহেলিকা' কহে শুক রাজার সমাজে।
নৃপতির আদেশে পণ্ডিতগণ বুঝে।'

ধাড়া বলল, 'ইনটারেস্টিং।'

সদানন্দ ভটচাজ বললেন, 'চণ্ডীমঙ্গলে আছে—

'বিধাতা নির্মিত ঘর নাহিক দুয়ার।
যোগেন্দ্র পুরুষ তায় আছে নিরাকার॥
যখন পুরুষবর হয় বলবান।
বিধাতার ঘর ভাঙি করে খান খান॥

বলুন এই হেঁয়ালির অর্থ কী?'

ধাড়া বলল, 'মনে হচ্ছে ধ্যানে বসে যোগী সাধনায় সিদ্ধিলাভ—'

'পাখির ডিম,' কালাচাঁদ পিছন থেকে বলল। 'ডিমে কোনো দুয়ার থাকে না। পাখির বাচ্চার গায়ে জোর হলে সে ডিমের খোলস ফাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।'

সদানন্দের হতাশ দৃষ্টি দেখে কালাচাঁদের মনে হল তার মতো একজন নগণ্য মানুষ এই ধাঁধার উত্তর বলে দেওয়ায় ধাঁধার কৌলীন্য খর্ব হল। সদানন্দ কালাচাঁদকে বলল, 'এটা তোর জানা ছিল, তাই না?'

কালাচাঁদ ছোটোবেলায় এরকম অনেক ধাঁধা তার ঠাকুমার কাছ থেকে শুনেছে। এটাও তার জানা ধাঁধা। 'আপনার দিব্যি কর্তামশাই, ছোটোবেলা থেকে আমার হেঁয়ালিতে মাথা ভালো কাজ করে।'

সদানন্দ বললেন, 'বাঙালি কবিরা এরকম ডবল মিনিং বিভিন্ন কাব্যের অনেক জায়গায় লিখে গেছেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্যটার তো প্রতিটি শ্লোকের দু'রকম মানে। একদিকে রামকাহিনি, অন্যদিকে পালরাজা রামপালের কীর্তি কথা। সুতরাং পঞ্চাননমঙ্গল দ্ব্যর্থবোধক এতে আমি এতটুকুও অবাক না। অবাক হলাম এটা জেনে যে পঞ্চাননমঙ্গল সত্যি ছিল। এতগুলো বছর লাগল এটার প্রমাণ পেতে।'

'কিন্তু পঞ্চাননমঙ্গল পুঁথি কে জ্বালালো, কখন আর কী ভাবে?' ধাড়া বলল।

'কে জানে? প্রায় চারশো বছরের অরাজকতা। হবে তার মধ্যে কোনো এক সময়।' সদানন্দ ভটচাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন।

'এই মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে কিছু জানতে পারেন নি?' ধাড়া জিজ্ঞেস করল। 'কী ছিল তাতে?'

'যখন গ্রামে গ্রামে ঘুরে পুঁথি সংগ্রহ করতাম তখন অনেক খোঁজ করেছিলাম। লোকের মুখে মুখে পঞ্চাননমঙ্গলের সম্বন্ধে নানা গল্প গ্রামে গ্রামে শুনেছি—কেউ বলে পঞ্চাননমঙ্গলে নাকি লেখা ছিল সূর্যের রথের ঘোড়া কত জোরে ছোটে, কেউ বলে লেখা ছিল কোন গাছের শিকড়ের রসে নাকি মৃতসঞ্জীবনী সুধা বানানো যায়—পঞ্চাননদেবতা নাকি তার মন্দির হাওয়ায় মিলিয়ে দিয়েছিলেন—এসব নানা গল্প—অথচ পঞ্চাননমঙ্গলের টিকিটি খুঁজে পাই নি। শেষে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে, পঞ্চাননমঙ্গল কাব্যটা সত্যি সত্যি ছিল না, ওটা গ্রামের মানুষের মুখে প্রচলিত একটা রূপকথা মাত্র। এখন দেখছি আমার অনুমান ভুল।'

'বলেন কি?' ধাড়া চমৎকৃত। 'সূর্যের রথের ঘোড়া কত জোরে ছোটে? এটা যদি আপনার কথা অনুযায়ী ডবল মিনিং হয়, তার মানে স্পিড অফ লাইট! ফিফটিনথ সেঞ্চুরিতে মেপে ফেলেছিল? বাপরে, এসব যদি সত্যি হয় তবে এই বই আবিষ্কার হলে তো চারদিকে সাড়া ফেলে দেবে। মিউজিয়ামগুলো কোটি টাকা ফেলে এই পুঁথি কিনতে চাইবে,' ধাড়া কঙ্কালের পাশে মাটিতে বসে পড়ল। 'আপনি কী ভাবে এই কঙ্কালটা দেখে বুঝলেন যে পঞ্চাননমঙ্গল সত্যি?'

সদানন্দ ভটচাজ পকেটের রুমাল দিয়ে ভেজা পাথরটা মুছে লেখাটার ওপর কিছুটা শুকনো মাটি ঘষে দিলেন, লেখাটা এবার যেন পাথর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এলো—

সদানন্দ ভটচাজ বললেন—

ছান্দে অঙ্কে পক্ষী পঙ্খ বান্ধে নন্দীধন।
পঞ্চমুন্ডে পঙ্কে গুপ্ত কাব্য পঞ্চানন।।'

কাব্য পঞ্চানন মানে পঞ্চাননমঙ্গল কাব্য, আর নন্দীধন এই হারিয়ে যাওয়া কাব্যের কবি।

পুঁথি ঘাটতে ঘাটতে পাঁচমুড়োর এই বুড়োর নিজের মুড়ো খারাপ হয়ে গেছে, কালাচাঁদ ভাবল। একটা কঙ্কালের বুকে বাঁধা পাথর দেখে ইতিহাস চর্চা হচ্ছে। কালাচাঁদ কঙ্কালটাকে সহ্য করতে পারছিল না। কালাচাঁদের মাথা ঘুরতে লাগল, গা গোলাতে লাগল, কালাচাঁদ হড় হড় করে ধাড়ার দামি কোটে বমি করে দিল। কালাচাঁদের এই একটা রোগ—মৃতদেহ ও একদম সহ্য করতে পারে না—পেটের ভিতরের আগ্নেয়গিরির লাভা মুখ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। সদানন্দ হাঁউমাঁউ করে উঠল, কিন্তু ধাড়া যেন গ্রাহ্যই করল না, সে তখন অন্য জগতে—'পিওর গোল্ড!'

ধাড়ার কোট নিয়ে যেন সদানন্দের চিন্তার শেষ নেই—'হবে চোদ্দশো সালের এদিকওদিক—কিন্তু আপনার এত দামি কোট—' কালাচাঁদের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাল সদানন্দ ভটচাজ। কালাচাঁদ লজ্জায় সিটিয়ে গিয়ে ধাড়াকে মিনমিন করে বলল—'আপনার কোটটা পুকুরের জলে ধুয়ে দিই?'

ধাড়া কোটটা খুলে কালাচাঁদের হাতে দিয়ে বলল, 'এটাকে ড্রাই-ক্লিন করতে হবে। এটাকে একটা থলে-টলেতে ঢুকিয়ে আমায় যাওয়ার সময় দিও।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, চয়নবিলের পাশের গাছগাছালিতে পাখিরা আজ সান্ধ্য জনসমাবেশে বিরক্ত। একটা টিয়া প্রকাশ্যে ট্যা ট্যা করে বিরক্তি প্রকাশ করে মাথার ওপর দিয়ে এক চক্কর খেয়ে উড়ে গাছের পাতার আড়ালে গিয়ে বসল। সদানন্দ ভটচাজ তার ভৃত্যের সাহায্যে উঠে দাঁড়িয়ে বাগদিদের বললেন, 'একে

BanglaBook.org

কাল সকালে দাহ করা হবে, তোরা পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে খবর দে, আমি নিজে এঁর মুখাগ্নি করব।'

সদানন্দের একবার অনুরোধেই ধাড়া কষ্টেসৃষ্টে রিক্সায় বসল, কালাচাঁদ ভাবল তাকে তো মানুষের মধ্যেই ধরে না ওরা। রিক্সা চলতে লাগল।

কালাচাঁদের থেকে কোটটা নিতে এলে সে দুলাল নায়েবকে জিজ্ঞেস করল, 'খরিশ কেউটের গল্পটা কি সত্যি?'

'জানি না,' কোটটা বিরক্ত মুখে ভাঁজ করতে করতে দুলাল বলল। 'ওটা খরিশ হতে পারে, তেঁতুলেও হতে পারে, আবার কালকেউটে বা পদ্মগোখরোও হতে পারে, কে দেখতে গেছে? এই সন্ধ্যাবেলায় সব ধেড়ে মেটে ইঁদুর ধরতে ধানগাছের গোড়ায় গোড়ায় ঘুরে বেড়ায়। সবকটাই হিংস্র, তেড়ে এসে ছোবল মারে।'

রিক্সার পিছনে পিছনে সাইকেল নিয়ে ছুটল নায়েব দুলাল। কালাচাঁদ চয়নবিলের ধারে তেঁকাটালের ঝোপের পাশে তালগাছের সিঁড়িতে বসে চণ্ডীদাসের জাল পুঁথিটা পাশে রেখে আঁজলা ভরে জল নিয়ে কুলকুচি করল, ঘাড়ে মাথায় জল থাবড়ে একটু সুস্থ বোধ করল। বাগদিরা পাথর থেকে কঙ্কালটা আলাদা করে পাঁজাকোলা করে হাঁটা লাগালো। জলের পাশে সেলেট পাথরগুলো ডাঁই করে রাখা। সবকটার ওপর পুরু মাটি-শ্যাওলার আস্তরণ। কালাচাঁদ উঠে এসে একটা পাথরে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘষল—মাটি সরে খোদাই করা লিপির বাংলা অক্ষর আত্মপ্রকাশ করল। কালাচাঁদ পকেট থেকে কর্তামশাইয়ের হাতের লেখা কাগজটা বের করল—ত্রিদিবেশের কবিতাতে পঞ্চাননের কথা আছে। আচ্ছা এটাই সেই হারিয়ে যাওয়া পঞ্চাননমঙ্গল থেকে লেখা হয়নি তো? কালাচাঁদের শরীরে যেন ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি লাগল। ধাড়া বলে গেল—কারা যেন পেলে কোটি কোটি টাকায় কিনে নেবে। কিন্তু এই পদ্যে শয়তানের লেখা কিছু তো চোখে আসছে না। কালাচাঁদ ভাবল কলকাতায় ফিরে গিয়ে আজই হরু ঠাকুরকে দিয়ে এটা বদন ছোঁড়াটাকে দেখাতে হবে। দেখতে হবে পঞ্চাননমঙ্গলকে আরবেরা 'শয়তানের পুঁথি' কেন বলতো?

।। চার ।।

বোনের বাড়ির দরজার বাইরে রাস্তায় চারমিনার খাচ্ছিল হরু ঠাকুর। কালাচাঁদকে দেখে হরু ঠাকুর বিস্মিত—'তুই এখানে?'

'একটা বিরাট ঘটনা ঘটে গেছে,' কালাচাঁদ উত্তেজিত। 'তোমার বাড়িতে তালা দেখে এখানে এলাম। তোমার কাপালিক ভাগ্নেটা ঘরে আছে?'

'খবরদার কালা,' হরু ঠাকুর আঙুল তুলে বলল। 'বদন শুনলে অনর্থ বাধাবে।

ও বলেছে তুই এ বাড়ির ধারে-কাছে এলে দু'হাতে ইলেকট্রিক তার পেঁচিয়ে বেঁধে অ্যায়সা শক দেবে যে চুরি করার কথা মনে এলেই তোর হাত থর থর করে কাঁপবে।'

'ও ছোঁড়ার কাপালিকের লগ্নদোষ আছে,' কালাচাঁদ বলল। 'লাল টকটকে চোখ দু'টো দেখলে মনে হয় নরবলি-টলি ওর কাছে নস্যি, ইলেকট্রিক শক তো ও হাসতে হাসতে লাগিয়ে দেবে।'

'ফালতু কথা ছাড়,' হরু ঠাকুর বলল। 'পুঁথিটা বিক্রি হল?'

'বিক্রি? আমায় হাজতে পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছিলে তুমি।'

'সে কি রে, তোকে কত করে শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠালাম—রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ, কাম গন্ধ—'

'থাম তো, রজকিনী রূপ,' কালাচাঁদ ভেঙ্চে উঠল। 'কতবার তোমায় বলেছি ভাঙের গুলি খেয়ে পুঁথি লিখবে না। দিয়েছিলে আমার বারোটা বাজিয়ে, অন্য কাস্টমার হলে এতক্ষণে আমি হাজতে। কান ধরে উঠবস করতে বলেছিল,' কালাচাঁদের গলা কাঁদো-কাঁদো।

'সদানন্দ ভটচাজ? ওই ঘাউড়াটা তো শুনেছিলাম পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। ও আবার পুঁথি যাচাই শুরু করেছে? তোকে তো পাঠালাম দো-আঁশলাটাকে পুঁথিটা বেচতে।'

যে দেশি লোকেরা বিলেতে থাকে—'এনারাই' না কী যেন বলে, হরু ঠাকুর তাদের দো-আঁশলা বলে। হরু ঠাকুর সাহেবদের খুব ঘেন্না করে। কী যে হয়েছিল সেটা হরু ঠাকুর কখনও বলে না। হরু ঠাকুরের পেট থেকে কথা বের করা কোষ্ঠকাঠিন্যের বুড়োর পেট থেকে মল বের করার মতো কঠিন ব্যাপার।

'চণ্ডীদাসের হাত দিয়ে গৌরচন্দ্রিকা খেয়ে করাচ্ছ আজকাল?' কালাচাঁদ বলল।

কালাচাঁদ চোরের হম্বিতম্বিতে হরু ঠাকুরের মাথায় হাত। 'সব্বোনাশ, বলিস কি রে? এজন্যেই কখনও দুটো কাস্টমারের কাজ এক সঙ্গে করতে চাই না। সব গোলমাল হয়ে গেছে রে। চণ্ডীদাসে গৌরচন্দ্রিকা ঢুকিয়ে দিয়েছি, তার মানে গোবিন্দদাস কোবরেজের পুঁথিতে নিশ্চয়ই বাশুলিকেত্তনটা ঢুকে গেছে। তা তুই এখানে কেন এসেছিস? তোর কি প্রাণে ভয় নেই? বদন দেখলে—'

'হাতে সময় খুব কম,' কালাচাঁদ উত্তেজিত। 'কাল-পরশুর মধ্যে দেখবে পাঁচমুড়ো খবরের কাগজের হেডলাইনে। একটা বড়োসড়ো দাঁও মারার সুযোগ হাতের কাছে মশার মতো ভনভন করছে। এক থাপ্পড়ে ব্যাটাকে মারতে হবে। তোমার ভাগ্নেটা আছে? ওকে আজ দরকার।'

'দাঁড়া দাঁড়া, হড়বড় করিস না। কী হয়েছে বলবি তো।'

'পাঁচমুড়োর পুকুর থেকে কঙ্কাল উঠেছে, ছিকল দিয়ে পাথরে বাঁধা। সেই পাথরে অনেক কিছু লেখা। অনেক পুরোনো কালের কঙ্কাল।'

'অ—এই কথা,' হরু ঠাকুরের ঠান্ডা উত্তর। 'আগেকার কালে অনেকে পিতলের কলসি আর দড়ি গলায় বেঁধে জলে ঝাঁপ দেবার আগে হাঁড়ির গায়ে আঁচড় কেটে মনের দুঃখের কথা লিখে যেত।'

'তাই বলে পদ্য লিখবে?' কালাচাঁদ রাগ-রাগ গলায় বলল।

'পদ্য?'

কালাচাঁদ এবার স্মৃতি হাতড়ে বলল—

'ছান্দে অঙ্কে পক্ষী পদ্ম বান্ধে নন্দীধন।
পঞ্চমুন্ডে পঙ্কে গুপ্ত কাব্য পঞ্চানন।।'

কালাচাঁদের পদ্য শুনতে শুনতে হরু ঠাকুরের চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হতে লাগল। আধখাওয়া সিগারেটটা অন্যমনস্কভাবে পায়ের চপ্পলের নীচে চেপে বলল—'বলিস কী রে? তার মানে পঞ্চাননমঙ্গল কাব্য সত্যি সত্যি ছিল?'

'জমিদারবাবুও একই কথা বললেন—এই পঞ্চাননমঙ্গল মালটা কী বল তো?'

'পঞ্চাননমঙ্গলের কথা শুনিস নি?' হরু ঠাকুর অবাক। 'পঞ্চাননমঙ্গল অনেকটা নাগিনের মাথার মণির মতো, সবাই এই মূল্যবান বস্তুটার কথা শুনেছে অথচ কেউ দেখেনি। আমাদের পূর্বপুরুষদের এ এক মহান কীর্তি। পঞ্চাননমঙ্গল কাব্যের শিবের বন্দনার ভিতর নাকি লুকিয়ে রাখা ছিল মারাত্মক সব গুহ্য কথা, যেন ঝিনুকের ভিতর লুকিয়ে আছে মুক্তো। আমাদের দুর্ভাগ্য যে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিয়ে গেল।'

'কে গো মামা? দরজায় কার সঙ্গে ফিসফিস করছ?' ঘরের ভিতর থেকে চন্দ্রবদনের বাজখাঁই গলা। কালাচাঁদ সরে পড়ার আগেই গোটা দরজা জুড়ে চন্দ্রবদন ঘটোৎকচের মতো পিছনে এসে দাঁড়াল। কালাচাঁদকে দেখে বদনের কপালে অশীতিপর বৃদ্ধের কপালের মতো আঁকাবাঁকা বলিরেখা আবির্ভূত হল। হরু ঠাকুরকে দরজার আড়ালে টেনে নিয়ে বদন নীচু গলায় বললেও কালাচাঁদ তার বাজখাঁই গলার ধমক শুনতে পেল—'এ লোকটা আবার এ বাড়িতে এসেছে? তোমাকে না বলেছি ভদ্রলোকের বাড়িতে চোর-ডাকাতদের আনবে না—'

'ডাকাত?' কালাচাঁদ বদনের মিথ্যা ভাষণে মনে মনে ছি ছি করে উঠল। কালাচাঁদের মোটেই ডাকাত বলার মতো গুরু অপরাধ ছিল না। বাইরের ঘরে একলা সুযোগ পেয়ে বইয়ের তাক থেকে বদনের একটা বই জামার নীচে পেটে গুঁজে নিয়েছিল মাত্র। আর ওটাই নাকি বদনের অঙ্ক বইগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় অঙ্ক বই। অঙ্ক বইদের মধ্যেও যে সবচেয়ে প্রিয় অঙ্ক বই হয় এরকম অদ্ভুত কথা কালাচাঁদ কখনও শোনেনি। এই বদন ছোঁড়াটাই অদ্ভুত—কানপুর থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে জলপানি পেয়েও বিলেত গেল না। মাথায়

BanglaBook.org

ভুত চেপেছে কম্পিউটারের ব্যবসা করবে। কম্পিউটারের ব্যবসা কি মুখের কথা, কত টাকা চাই, কিন্তু ছোকরা কিছুতেই চাকরি করবে না। ছোকরা এখন বাড়িতে কম্পিউটার বানিয়ে বেচে পয়সা জোগাড় করছে। এই উদ্ভট ছোঁড়ার হবিও উদ্ভট—অঙ্কের বই পড়া। হরু ঠাকুর বলে সারাদিন কম্পিউটার বানিয়ে বানিয়ে যখন ক্লান্তিতে দু'চোখ বুজে আসে, তখন চন্দ্রবদন নাকি অঙ্কের বই পড়ে রিল্যাক্স করে, মন খারাপ হলে নাকি চন্দ্রবদন অঙ্কের বই পড়ে মন ভালো করে।

কালাচাঁদ গলা উঁচু করে ভয়ে ভয়ে বলল, 'হরু ঠাকুর, এখন আসি—'

হরু ঠাকুর ভাগ্নের ওপর হঠাৎ খেপে উঠল, 'সব সময় গোঁয়ার্তুমি করবি নে বদন। তোর যদি এর ওপর অত রাগ থাকে তবে পুলিশে রিপোর্ট করে দে, কথায় কথায় লোককে এরকম হেনস্থা করবি নে। বেচারা আমাকে সাহায্য করার জন্যে এসেছে এ বাড়িতে এত রিস্ক নিয়ে।'

কালাচাঁদ মিনমিন করে বলল, 'এই পদ্যটা পাঁচমুড়োর পুকুরের জলের নীচে পাওয়া পাথরে খোদাই করে লেখা ছিল। প্রত্নলিপি। কেউ কেউ বলছে যে শিবের বন্দনার নীচে নাকি গূঢ় কোনো সঙ্কেত লুকোনো আছে। তাই হরু ঠাকুরকে দেখাতে এলাম—' কালাচাঁদ ত্রিদিবেশের পদ্য লেখা কাগজটা হরু ঠাকুরকে দিল। হরু ঠাকুর পকেট হাতড়াল, 'চশমাটা ফেলে এসেছি। বদন, এটা পড়ে শোনা তো বাবা।'

বদনের চোখে বিরক্তি ঝরে পড়ছে—যেন গোবরে পা পড়েছে। শরীর থেকে গোবর ঝড়াতে পারলে বাঁচে। তাড়াহুড়ো করে পদ্যটা পড়া শুরু করে হঠাৎ থমকে গেল, তারপর আবার প্রথম থেকে পড়া শুরু করল—এবার ধীরে ধীরে, থেমে থেমে।

কবিতা পড়া শেষ হলে হরু ঠাকুর বলল, 'বাঃ, শিববন্দনা—অপূর্ব, অক্ষরবৃত্ত পয়ারে লেখা।' হরু ঠাকুর দু'চোখ বুজে কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করল। 'কী অপূর্ব ভক্তির কবিতা।'

বদন বললে, 'শিববন্দনার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে অঙ্কের চিহ্নটাকে।'

'অঙ্ক! এর মধ্যে অঙ্ক কোথায় দেখছিস বদন? কে অঙ্কের চিহ্ন লুকিয়ে রেখেছে?' হরু ঠাকুর বলল।

'সে আমি কি জানি। যে পদ্যটা লিখেছে সে লুকিয়ে রেখেছে,' বদন বলল। 'ছোটোবেলা এক-য়ে চন্দ্র, দুই-য়ে পক্ষ, তিন-য়ে নেত্র মুখস্থ করেছিলে?'

কালাচাঁদ আগ বাড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ চারে বেদ, পাঁচে পঞ্চবাণ, ছয়ে ঋতু—'

'হয়েছে হয়েছে, থামো,' বদন গম্ভীর গলায় বলল। কালাচাঁদকে যেন সে সহ্য করতে পারে না। 'এটা একটা বাচ্চাও বলতে পারে।' কালাচাঁদ ভয়ে থেমে গেল।

'এই পদ্যটার প্রত্যেক লাইনের প্রথম অক্ষরগুলো জুড়ে একটা সংখ্যা হয়।

BanglaBook.org

প্রথম অক্ষরগুলো হল—বদন পড়ে পড়ে বলতে লাগল—চন্দ্রচূড়—এক-য়ে চন্দ্রের এক, চতুর্দ্দিশ-চারদিক, ঈশর মানে ঈশ্বর একমেবাদ্বিতীয়মের এক, পঞ্চাননের পাঁচ, গ্রহ—নবগ্রহের নয়, হাথে মানে দুই, ছয় ঋতু, পঞ্চমুখ মানে পাঁচ, ত্রিলোচনের তিন, পঞ্চবটীর পাঁচ, বসন্ধুরা-বসুন-ধরা এটা?' বদন তার কাকের বাসার মতো রুক্ষ চুল চুলকাতে লাগল।

'বসু-হলে আটে অষ্টবসু। সরি,' কালাচাঁদ জিভ কাটল।

বদন বলল, 'আট'। তারপর বলল, 'রসের সাগর। সাগর মানে সাত সাগর। মামা, কত রকমের রস আছে যেন?'

হরু ঠাকুর বলল, 'নব রস—শৃঙ্গার, হাস্য, রৌদ্র, কারুণ্য, বীভৎস, ভয়ানক, অদ্ভুত, বীর আর শান্ত।'

'তাহলে সংখ্যাটা হল ১৪১৫৯২৬৫৩৫৮৯৭ আর এদের সবার ওপর লেখা পদ্যের নাম ত্রিদিবেশ। ত্রিদিবেশের তিন এদের একঘর ওপরে লিখলে দাঁড়াল ৩.১৪১৫৯২৬৫৩৫৮৯৭। অবিশ্বাস্য!'

'কী হল?'

'এটা জলের তলায় পাথরে লেখা ছিল?'

'হ্যাঁ', কালাচাঁদ বলল। 'পাঁচমুড়োর জমিদার বলল যে, এগুলো নাকি চৈতন্যদেবের চেয়েও পুরোনো।'

'কী হল রে?' হরু ঠাকুর বলল।

'জানো এই সংখ্যাটা কী?'

'কী?'

'এটা হল গ্রিক সংখ্যা 'পাই' এর ভ্যালু।'

'পাই? সেটা আবার কী রে বদন?'

'যে কোনো বৃত্তের পরিধিকে বৃত্তের ব্যাস দিয়ে ভাগ করলে সব সময় যে সংখ্যাটা পাবে সেটাই হল পাই—সংখ্যাটা তোমার এই শিববন্দনায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে। সংখ্যাটা এখানে শেষ নয়, চলতেই থাকবে। বোধহয় শেষ লাইনে নয়ের পাশাপাশি সাত লিখে সেটাই বোঝানো হচ্ছে। কোথা থেকে পেলে এটা?'

'একটা চোদ্দশো সালের পাথরে এই পদ্যটা লেখা ছিল', হরু ঠাকুর বলল, 'হ্যাঁ রে বদন, তার মানে চোদ্দশো সালে এদেশের মানুষ তোর এই পাই-এর ব্যাপারটা জানত?'

বদন বলল—চতুরাধিকম শতমাস্টগুণম দ্বষস্টিস্তথা
সহস্রানম অয়ুতদ্বয়াভিস্কন্তাস্যসন্ন বৃত্তাপরিনাহ—আর্যভট পড়েছ?'

'না,' হরু ঠাকুর বলল।

BanglaBook.org

'আর্যভট পাঁচশো সালের সময়কালে আমাদের দেশের একজন নামজাদা অঙ্কের ও জ্যোতিষের জিনিয়াস ছিলেন। একসময় উনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল ছিলেন। অনেকে ওনাকে আর্যভট্ট নামেও জানেন।'

'এই সংস্কৃত শ্লোকটার মানেটা বুঝি তাই?'

'না না এর মানে—একশ'র সঙ্গে চার যোগ কর, তাকে আট দিয়ে গুণ কর, তার সঙ্গে ৬২০০০ যোগ কর, যা পাবে তাকে ২০০০০ দিয়ে ভাগ কর, তবে বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের অনুপাতের কাছাকাছি সংখ্যা পাবে। আর্যভট এভাবে পাই-এর মান বলে গেছিলেন। পিরামিড জানো তো?' বদন বলল।

'মিশরে তো?' কালাচাঁদ বলল।

বদন কালাচাঁদের কথার কোনো উত্তর দিল না। সে হরু ঠাকুরকে বলল, 'মিশরের গিজাতে যে পিরামিডটা আছে তার উচ্চতা ও ভূমির অনুপাত হল পাইয়ের দুগুণ।'

জীবনে সব থেকে যে বিষয়টা কালাচাঁদের অপছন্দ তা হল অঙ্ক। তার জীবনের অঙ্ক কক্ষনও মেলে না। না হলে হরু ঠাকুর, যার নামে তার কাছে খবর আছে যে, সাহেবদের আমলে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে পুঁথি চুরির দায়ে জেলে গেছিল, সেও বদনের নাকের ওপর দিয়ে দিব্যি ভদ্রলোক সেজে ঘোরাফেরা করে, অথচ কালাচাঁদের সামান্য চুরির শাস্তি ইলেকট্রিক শক! অঙ্ক না বুঝলেও কালাচাঁদ এটুকু বুঝল যে, সে আজ এমন একটা কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছে যা দিয়ে ঠিকমতো চমক লাগাতে পারলে ধাড়ার কাছ থেকে মোটা মালকড়ি কামিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু অঙ্কের সঙ্গে পুঁথি জ্বালিয়ে নষ্ট করার কী সম্পর্ক আছে তা কালাচাঁদ ভেবে পেল না।

BanglaBook.org

।। পাঁচ ।।

সাতসকালে কঙ্কাল পোড়ানো দেখতে শ্মশানে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না কালাচাঁদের, তাই পরদিন ইচ্ছা করেই দেরি করে দুপুর নাগাদ পাঁচমুড়োতে গেল সে। জমিদার বাড়ির বাইরে ঝাঁ চকচকে গাড়িটা দেখে বুঝল ধাড়া ভিতরে। বৈঠকখানায় ঢুকে কালাচাঁদ দেখল ধাড়া জমিদার সদানন্দ ভটচাজের পাশে মোড়ায় বসে ঝুঁকে আরেকটা কালো সেলেট পাথরের লিপি দেখছে। এই পাথরটা কাল এখানে ছিল না। সব কটা ঘুলঘুলিতে পায়রার বাসা। একটা পায়রা পতপত করে উড়ে এক ঘুলঘুলি থেকে অন্য একটা ঘুলঘুলিতে গিয়ে বসল। মুখ তুলে বিরক্ত মুখে পায়রার উড়ান দেখতে গিয়ে কালাচাঁদের দিকে

দৃষ্টি গেল সদানন্দ ভটচাজের। সঙ্গে সঙ্গে তার কপালে একরাশ বিরক্তি যেন উচ্ছের খোসার ভাঁজের মতো আবির্ভূত হল। সদানন্দ ভটচাজের দিকে হাতজোড় করে একগাল হাসল কালাচাঁদ চোর, তারপর বলতে লাগল—

চন্দ্রচূড় মহেশ্বর ধেআই চরণ।
চতুর্দ্দিশ ভকতীএঁ ভরায়িলেঁ মন॥
ঈশর ত্রিদশগণের শৈবলিনী মাথ।
পঞ্চানন দেহযুতী—'

'আজ সঙ্গে কে, চণ্ডীদাস না কালিদাস?' সদানন্দ ভটচাজ কোলাব্যাঙের মতো ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে বলল।

রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল কালাচাঁদের, তবু সে হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'পঞ্চাননমঙ্গলের আবৃত্তি করে জিহ্বা পবিত্র করছি।'

'জানতাম,' সদানন্দ ভটচাজের গলার স্বরে অবহেলা। 'কাল কোটি টাকা গুনলি আর আজ পঞ্চাননমঙ্গল তোর জিহ্বায় হাজির।'

'আজ্ঞে, সে স্পর্ধা কি আর আমার হবে?' কালাচাঁদ বিনয়ের সঙ্গে বলল। 'চয়নবিলের নীচ থেকে যে পাথরে লেখা পদ্যটা আপনি দেখালেন সেটা কাল কঙ্কাল দেখতে যাবার তাড়াহুড়োয় আমার কাছে রয়ে গেছিল। ওটা বাড়ি গিয়ে মাথা ঠান্ডা করে পড়ে দেখি শিববন্দনাটা তো একটা আলখাল্লা মাত্র, ওর নীচে লুকিয়ে আছে এক বিশাল অঙ্ক।'

'আবার গপ্পো ফাঁদছিস?'

'এক মিনিট ভটচাজ মশাই,' ধাড়া সদানন্দ ভটচাজকে থামিয়ে দিল। 'তুমি ধরতে পেরেছ এর মধ্যে জটিল অঙ্ক লুকিয়ে আছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' কালাচাঁদ বিনয়ের সঙ্গে মাথা নাড়ল। 'এর অর্থ খুবই সোজা। এটা প্রাচীন বাংলার পুরোনো টেকনিক। প্রতি লাইনের প্রথম অক্ষরগুলোতে পদ্যের হেঁয়ালিটা রয়েছে। ত্রিদিবেশের-তিন উপরে, তার নীচের ঘরে চন্দ্রচূড় মানে এক-য়ে চন্দ্রের এক, চতুর্দিশ-মানে চার, ঈশর মানে ঈশ্বর একজন, পঞ্চাননের পাঁচ, গ্রহ-নবগ্রহের নয় এ ভাবে যে সংখ্যাটা হয় সেটা হল ৩.১৪১৫৯২৬৫৩৫৮৯৭।'

'তাতে কী এমন দেশ উদ্ধার হয়ে গেল?' সদানন্দ ভটচাজ নিরাসক্ত গম্ভীর গলায় বললেন।

'ওই সংখ্যাটা হল গ্রিক সংখ্যা পাই-এর ভ্যালু।'

'কিসের ভ্যালু?' সদানন্দ ভটচাজ ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন।

'পাই হল বৃত্তের পরিধিকে ব্যাস দিয়ে ভাগ করলে—'

'স্টপ-স্টপ,' সদানন্দ ভটচাজ কালাচাঁদকে থামালেন। 'তুই আবার অঙ্ক কবে থেকে

BanglaBook.org

শিখলি রে কালা? অত্তবড়ো একটা সংখ্যা বললি, তার সঙ্গে বৃত্ত, ব্যাস-ট্যাস, কেমন যেন বামুন পণ্ডিতের মুখে কোরান পাঠ শুনছি মনে হচ্ছে। মতলবটা কী বলত?'

'মতলব আবার কী,' কালাচাঁদ গুঁইগাঁই করে বলল। 'আমার কথা তো আপনি বিশ্বাসই করেন না।'

'তোর কথা কাল বিশ্বাস করলে এক লাখ টাকা জলে যেত ধাড়া সাহেবের। আজ আবার নতুন একটা গপ্পো নিয়ে এসেছিস, বোরখার ভিতর অঙ্ক।'

'বোরখা না আলখাল্লা, এই রইল আপনার পদ্য,' কালাচাঁদ রুষ্ট ভাবে প্রণাম করে বেরিয়ে আসছিল—

'দাঁড়াও!'

এবার ধাড়া সাহেবের গলা। 'আমি জানি "পাই" কাকে বলে। এরিয়া অব সার্কেল হল পাই আর স্কোয়ার। আমার গাট ফিল হচ্ছে যে, আমরা সোনার খনির সামনে পৌঁছে গেছি।'

সদানন্দ ভটচাজ ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'কিন্তু তুই যে এত বড়ো পণ্ডিত সেটা জানতুম না তো কালা—'

'আর্যভটের নাম শুনেছেন?' কালাচাঁদ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল। 'অনেকে অবশ্য ওকে আর্যভট্ট নামে জানে।'

'আর্যভট্‌টো?' সদানন্দ ভটচাজের চোখে বিস্ময়। 'সে তো মহাপণ্ডিত লোক।'

'হ্যাঁ, আর্যভট্ট যখন নালন্দার প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন তখন উনি কয়েকটা কঠিন কঠিন অঙ্কের ধাঁধা লিখেছিলেন, পয়ারে।'

'কিন্তু বাবা কৃষ্ণচন্দ্র, তুমি এ সব জানলে কী ভাবে?' সদানন্দ ভটচাজ যেন নিজের দু'কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

'এশিয়াটিক সোসাইটিতে রোজ পড়াশোনা করলে এগুলো জানা মোটেই কঠিন নয়।'

'এশিয়াটিক সোসাইটি! তুমি এশিয়াটিক সোসাইটিতে যাও?' ধাড়া বলল।

কালাচাঁদ মাথা নাড়ল এবং সেই সঙ্গে জিভের ডগা দিয়ে সামনের ভাঙা দাঁতটা স্পর্শ করল। শেষবার সে এশিয়াটিক সোসাইটিতে গেছিল ছ'মাস আগে, লালশালুতে জড়ানো ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের একটা পুঁথি বগলদাবা করে নিয়ে তিরের বেগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালাতে গিয়ে সদ্য সাবান ধোওয়া সিঁড়িতে পিছলে পড়ে পুরো এক বেলা জ্ঞানহীন অবস্থায় হাসপাতালে এবং পরের তিন মাস সামনের দাঁতের অর্ধেকটা হারিয়ে জেলে কাটিয়েছিল।

ধাড়া বলল, 'কাল আমরা বুঝতে পারিনি, কিছু মনে কোরো না ভাই।'

সদানন্দ ভটচাজ বিড়বিড় করে বললেন, 'আর্যভট্ট পয়ার লিখত এটা প্রথম শুনলাম।'

BanglaBook.org

ধাড়া বলল, 'এটাই তো আমাদের প্রবলেম, আমরা হিস্ট্রিটা ভালো ভাবে ডকুমেন্ট করে রাখিনি। তাই আমরা জানি না যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা কে কী আবিষ্কার করে গেছেন। আর এই সুযোগ নিয়ে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড আমাদের আবিষ্কার ওদের বলে চালাচ্ছে।'

'যাকে বলে পুকুর চুরি,' কালাচাঁদ চোর বলল।

'আরে পিথাগোরাসের থিওরেম নিয়ে তো আমেরিকায় খুব হৈ চৈ পড়ে গেছে', ধাড়া বলল। 'আমাদের শুল্বশাস্ত্রে নাকি একদম ডিটটো পাওয়া গেছে এই উপপাদ্য।' ধাড়া কালাচাঁদের দিকে তার বক্তব্যের সম্মতির জন্য তাকালেন। ধাড়া যে কী আগডুম-বাগডুম বলছে তার কিছুই কালাচাঁদ বুঝতে না পারলেও সে বুঝল এই পিথাগোরাস নামের ভদ্রলোক একটা কেউকেটা হবে। সে বলল, 'হুম, ব্যাপারটা প্রমাণিত হলে খুব কেলেঙ্কারি।'

সদানন্দ ভটচাজ একটু কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, 'আপনারা যে কী বিষয়ে কথা বলছেন সেটা আমি সত্যি বুঝছি না। আমার অঙ্কের দৌড় তো শুভঙ্করের আর্যা পর্যন্ত।'

'বৈদিক যুগে জ্যামিতিকে বলা হত শুল্ব,' ধাড়া বলল। 'বৌধায়ন, আপস্তব, কাত্যায়ন এরা সব আমাদের দেশের নামকরা শুল্বকার ছিলেন। মুশকিলটা এই যে আমাদের দেশে কোনো কিছুই ভালো ভাবে ডকুমেন্টেড হত না। ঐতিহাসিকরা বলেন যে বৌধায়ন নাকি খ্রিস্টের আটশ বছর আগে এদেশে ছিলেন আর পিথাগোরাস জন্মেছিলেন খ্রিস্টের পাঁচশো সত্তর বছর আগে। তার মানে বৌধায়ন পিথাগোরাসের থেকে অন্তত দু'শো বছর বড়ো। কিন্তু এসব অনুমান কি আর তর্কে ধোপে টেকে? আরে বাবা, লিখে তো রেখে যা তোরা কে কবে জন্মেছিস। বিদেশিরা সব নিজেদের বলে চালাচ্ছে।'

'কেন, আমাদের দেশে তো কুলজী ছিল, ওতে পূর্বপুরুষদের নাম লেখা থাকত,' সদানন্দ বললেন।

'ঘোড়ার ডিম থাকত,' ধাড়া রাগে গজগজ করে বলল। 'আত্রেয় আর সুশ্রুতের নাম শুনেছেন?'

'বাঃ, এদের নাম কে না জানে, এরাই তো ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক,' সদানন্দ শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন।

এদের নাম যারা জানে না তাদের দলের একজন হল কালাচাঁদ, তবু সে বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়িয়ে সদানন্দের কথায় সায় দিল। সদ্য সে আর্যভট্টের পয়ার নিয়ে লেকচার দিয়েছে তার এত বিখ্যাত লোকের নাম অজানা থাকা উচিত নয়।

'ঠিক কথা, আরে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড হিপোক্রেটিসের শপথ নিয়ে ফোঁপর দালালি করে, হিপোক্রেটিস তো দু'দিনের ছোঁড়া, খ্রিস্টের মোটে ৪৬০ বছর

BanglaBook.org

আগে জন্ম। সুশ্রুত হিপোক্রেটিসের থেকে কম করে একশো দেড়শো বছর আগে নিজে এদেশে রাইনোপ্ল্যাস্টি করতেন।'

'রাইনোপ্ল্যাস্টি?' সদানন্দ আবার হোঁচট খেলেন।

'মনুসংহিতায় লেখা আছে যে ব্যভিচারের শাস্তি হিসাবে তখন অপরাধীদের নাক কান কেটে ফেলার নির্দেশ ছিল। ফেমাস সার্জন সুশ্রুত পাছা থেকে চামড়া কেটে নাকের ওপর বসিয়ে সেলাই করে সার্জারি করতেন। আমাদের ডকুমেন্টেশন ছিল না, বিদেশিরা নাম কিনল। চরক সংহিতা-য় লেখা আছে যে সুশ্রুতের গুরু ছিলেন কাশীরাজ ধন্বন্তরি, ধন্বন্তরির গুরু ছিলেন ইন্দ্র ঋষি, ইন্দ্রের গুরু ছিলেন অশ্বিনীকুমার দুই ভাই, অশ্বিনীকুমাররা ডাক্তারি বিদ্যা শেখেন প্রজাপতি দক্ষের কাছ থেকে এবং দক্ষকে নাকি এই ব্রহ্মবিদ্যা শেখান স্বয়ং ব্রহ্মা। এতক্ষণ ইন্ডিয়ায় হিস্ট্রি চলতে চলতে বংশলতিকা হঠাৎ লাফ দিয়ে স্বর্গে দেবতার কোলে গিয়ে পড়ল, বুঝুন ঠ্যালা। বিদেশীরা বলে সব গুল।'

'আগেকার দিনে ঋষি-মুনিরা সবাই নিজেদের ভগবানের সঙ্গে জুড়ে রাখত,' সদানন্দ বললেন।

'আমাদের ডকুমেন্টেশনের অভাব ছিল,' ধাড়া বলল। 'ভাবতে পারেন শ্রীচৈতন্যদেব যখন নিমাই পণ্ডিত ছিলেন তাঁর টোলে কত ছাত্র পড়িয়েছেন, অথচ ওনার একটাও হাতের লেখা আমাদের দেশে কারও কাছে রাখা নেই। অথচ ইতালিতে দেখুন বতিচেল্লির আঁকা 'বার্থ অব ভেনাস' যা ১৪৮৫ সালে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের এক বছর আগে আঁকা সেটা কেমন যত্ন করে বাঁচিয়ে রেখেছে।'

'থাকবে কী ভাবে? আমাদের সব ডকুমেন্ট তো তুর্কি, আফগান, পাঠান, মুঘল সব এসে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই বানিয়ে দিয়েছে,' সদানন্দ বললেন। 'বারশো চার-এ বক্তিয়ার খিলজি লক্ষ্মণ সেনকে তাড়িয়ে তো বাংলার রাজা হল। সে সবচেয়ে বেশি সর্বনাশ করে গেছে। কিন্তু সেও বেশিদিন সেই রাজত্ব ভোগ করতে পারল না। পাকামো করে তিনি গেলেন তিব্বত জয় করতে। কামরূপের রাজার কাছে অ্যায়সা মার খেলেন—সমস্ত সৈন্যটৈন্য খুইয়ে কোনোরকমে রোগে প্রায় শয্যাশায়ী অবস্থায় গৌড়ে ফিরে এলেন। এক দিন দুর্বল শরীরে রাজা ঘুমচ্ছিলেন, সেই সময় তার পেয়ারের সেনাপতি আলিমর্দন খাঁড়ার আঘাতে ধড় থেকে মুণ্ডুটা নামিয়ে দিলেন। ব্যাস, তারপর থেকে বাংলার মসনদে রাজাদের আয়ারাম-গয়ারাম চলতে লাগল পরের তিনশো বাহাত্তর বছর। এই সময়ে মানে ১৫৭৬-এ দাউদ পর্যন্ত ৪৩ জন রাজা বাংলার মসনদে বসলেন—কেউ কয়েক বছর, কেউ কয়েক মাস। রাজা যদুর পুত্র নাসিরুদ্দিন তো মাত্র আট দিন মসনদে ছিলেন, নবম দিনে

BanglaBook.org

ষড়যন্ত্রকারীরা তাকে হত্যা করে। কেউ নিজের পুত্রের হাতে প্রাণ দিচ্ছে, কেউ প্রিয় সেনাপতির হাতে—চারদিকে মৃত্যুর করাল ছায়া। মাঝে মাঝেই রাষ্ট্রবিপ্লব বাংলার শহর-নগরের ওপর দিয়ে বয়ে যেত, নতুন রাজা তার সৈন্য নিয়ে চালাত অবাধ লুটতরাজ। খাণ্ডবদাহনের মতো তারা বাংলার মন্দিরগুলো জ্বালিয়ে তছনছ করতে লাগল। বাঙালির দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প ধারণ করে যত ভূর্জপত্র, তেরেট, তালিপত পুঁথি ছিল সব সেই দাবাগ্নিতে জ্বলে ছাই হয়ে গেল। ওদন্তপুর মহাবিহারে ন্যাড়া মাথা গেরুয়াধারী অজস্র বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের যবনরা সৈনিক বলে হত্যা করল, মহাবিহারটাকে কেল্লা বলে মাটিতে মিশিয়ে দিল। বিক্রমশীলা, জগদ্দল এসব মহাবিহার এমন ভাবে ধ্বংস করল যে এখন তাদের খুঁজেই পাওয়া যায় না। পঞ্চাননমঙ্গল এই অরাজকতারই শিকার হয়ে জ্বলে ছাই হয়ে যায়।'

'আমি তো খুব এক্সাইটেড ভটচাজমশাই, এই পঞ্চাননমঙ্গল যদি খুঁজে পাওয়া যায় আর তাতে যদি সত্যি সত্যি ১৪০০ সালের প্রাচীন সমস্ত অঙ্ক থাকে তবে আমিই সেই পুঁথি কোটি টাকা দিয়ে আমার লন্ডনের গ্যালারির জন্য কিনে সারা পৃথিবীতে হুলুস্থুলু ফেলে দেব,' ধাড়া উত্তেজনায় হাতের তালুতে তালু ঘষল।

কালাচাঁদের মুখ হাঁ হল এবং তা যেন কোন্ সম্মোহন শক্তিতে বন্ধ হতে ভুলে গেল।

সদানন্দ কালাচাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এত বড়ো হাঁ করেছিস মুখে উড়ন্ত পায়রা ঢুকে যাবে, মুখ বন্ধ কর।'

'এক কোটি টাকা দিয়ে কিনবেন?' কালাচাঁদ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল।

'আলবাৎ কিনব,' ধাড়া বলল। 'যদি এই পঞ্চাননমঙ্গলে এরকম কিছু আবিষ্কার হয় যে নিউটনের জন্মের অনেক আগে একটা আপেল এই পাঁচমুড়োর কোনো এক ঋষির মাথায় পড়েছিল এবং ঋষিমশাই তাতে গ্র্যাভিটেশন আবিষ্কার করেছিল তবে সেই পুঁথির দাম লন্ডনে সোথেবির অকশনে কত হবে তা ধারণা করতে পার?'

'পাঁচমুড়োতে তো আপেল গাছ নেই,' কালাচাঁদ ধাড়ার মাঝপথে চিন্তিত হয়ে বলল।'

'আরে, আমড়া হলেও চলবে,' সদানন্দ গা জ্বালানো হাসি হাসলেন। তারপর সদানন্দ ধাড়াকে বললেন, 'চিন্তা করবেন না, এই কালাচাঁদ কালকেই আপনাকে লিখিয়ে এনে দেবে পঞ্চাননমঙ্গল।'

রাগে ক্ষোভে কালাচাঁদের বিড়ি রঙের মুখে কালসিটের দাগ ছড়িয়ে পড়ল। সে গুঁইগাঁই করে বলল, 'অত সহজ হলে তো যে কেউ লিখে দিত এতদিনে। অঙ্কের সূত্র ছন্দে মিশিয়ে লেখা কী মুখের কথা?'

BanglaBook.org

'ঠিক কথা,' ধাড়া বলল। কালাচাঁদ লক্ষ করল যে একটাকিয়ার 'ভাতুড়িয়াদের পুঁথির কথা শোনার পর থেকে ধাড়ার ব্যবহার অনেক সদয়।

'যদি অনুমতি দ্যান তবে ওই পাথরের পদ্যটা পড়ে ওর মধ্যে যদি অঙ্ক থাকে তবে তা ভেঙে বের করে আনতে পারি।'

'আরে, এর জন্যে অনুমতির কী দরকার। এই তো এখানে লিখে রেখেছি।' সদানন্দ কালাচাঁদের হাতে একটা চিরকুট দিল।

সদানন্দ ও ধাড়ার উৎসুক দৃষ্টির সামনে কালাচাঁদ লেখাটা পড়ল—

বোল শঙ্কর সংকট মর্দন জয়।
শিব কৌলেতে পক্ষেতে নেত্রেতে ক্ষয়॥
শিব কৌলেতে ফল ঋতুচক্রেতে হয়।
শিরে নেত্র তথায় যবে পক্ষেতে ক্ষয়॥
শিরে সংখ্যারি যোগ তেঁ ক্ষয় কভো নয়।
শিরে পঞ্চাননের দুতী শঙ্কর জয়॥

কালাচাঁদ লেখাটা পড়ে ঠোঁট কামড়ে বিজ্ঞের মতো বলল, 'হুঁ।'

'ধরতে পেরে গেছ অঙ্কটা?' ধাড়া অধীর হয়ে বলল।

'মনে হচ্ছে ধরে ফেলেছি,' কালাচাঁদ রহস্য করে বলল। 'আজ চলি, একবার চিদানন্দ কর্তার কাছে যেতে হবে। কাল আসব, কাগজটা রাখছি।'

'চিদানন্দ?' সদানন্দের চোখে আতঙ্ক, যেন কোলাব্যাঙ সাপ দেখেছে। 'চিদানন্দের কাছে কেন?'

'যেতে তো মন চায় না, কিন্তু কী করব, মা'র অপারেশনের টাকা—দেখি যদি জোগাড় করতে পারি।'

কথাটা যে সদানন্দ ভটচাজকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলে দিল সেটা কালাচাঁদের তস্কর দৃষ্টি এড়াল না। সদানন্দ ভটচাজ বললেন, 'এখন দু'হাজার রাখ, পরে বরং—' সদানন্দ ধাড়ার দিকে তাকালেন।

ধাড়া বলল, 'আমি চাই না এই জলের নীচের শিলালিপির কথা পাঁচ কান হোক। ভটচাজ মশাই একে বিশ হাজার টাকা দিয়ে দিন, কাল—' ধাড়া চুপ করে গেল, কালাচাঁদ বুঝল সদানন্দ ভটচাজকে ধাড়া ভালোই মালকড়ি দিয়ে রাখে, না হলে বুড়োর এমন কী গরজ পড়বে যে ধাড়াকে লন্ডনে খবর পাঠাবে?'

কালাচাঁদ জামার নীচটা তুলে দু'চোখ ঢেকে কান্না মিশ্রিত গলায় বলল, 'আপনার টাকা আমি নিতে পারব না কর্তামশাই। চিদানন্দ কর্তা বলে আপনার নাকি তেজারতি কারবার, রক্ত বিক্রির করিয়ে পয়সা আদায় করেন।'

'শঠের কথায় একদম কান দিবি নে,' সদানন্দ ভটচাজ কষ্ট করে লাঠিতে ভর

BanglaBook.org

দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অন্দরমহলে গেলেন আর কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দুটো একশো টাকার বান্ডিল দিয়ে বললেন, 'চিদের পাল্লায় পরিস না, দেখেছিস তো আমার কী হাল করেছে।'

'আপনারা দয়ার সমুদ্দুর,' কালাচাঁদ টাকাটা মাথায় ঠেকিয়ে চোখ মুছল।

'আজ চলি,' ধাড়া উঠে দাঁড়াল। 'কাল এসে দেখব কবিতাটাতে কী অঙ্ক লুকিয়ে আছে।' ধাড়া নমস্কার করে বেরিয়ে গেল।

সদানন্দ বললেন, 'বাবা কালাচাঁদ—'

'বলুন কর্তামশাই।'

'আমার ঠাকুরদার ফটোটা কাছে গিয়ে একবার ভালো করে দ্যাখ।'

কালাচাঁদ উঠে ফটোটা দেখে বলল, 'এনার বাঁ হাতটা কাটা?'

'ঠিক বলেছিস, এদিকে আয়।'

কালাচাঁদ সদানন্দের কাছে এল, সদানন্দ কালাচাঁদের ঘাড়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'শিকারে গিয়ে বাঘের নখের ক্ষতে পচন শুরু হওয়ায় ওর হাতটা বাদ দিতে হয়। আমাদের বাড়িতে কালী পুজোয় মোষ বলি দেওয়া হত। আমার ঠাকুরদা এক হাতেই ঐ কাজটা সারতেন। গায়ে এত জোর। এক কোপে মোষের গর্দান মাটিতে। আর এই এক হাতেই ঠাকুরদা তোর বাপ 'মধু'র একটা কাজ করেছিলেন সেটা নিশ্চয়ই জানিস?' সদানন্দের হাতের তালু শক্ত সাঁড়াশি হয়ে কালাচাঁদের গলায় চেপে বসল।

'আজ্ঞে,' কালাচাঁদ গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল। 'এই পাঁচমুড়োর জমিদারবাড়ির বিগ্রহের সোনার মুকুট চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল বলে আমার বাবাকে জমিদারবাবু প্রচণ্ড রেগে গিয়ে হাড়িকাঠে মাথা আটকে বলি দিতে গেছিলেন। সবাই মিলে তাঁর রাগ শান্ত করালে উনি নিজের হাতে বাবার মাথা মুড়িয়ে মাথায় ঘোল ঢেলে গ্রাম থেকে বের করে দিয়েছিলেন।'

'আমার বাঁ দিকটা অথর্ব হলেও দরকার পড়লে আমি এক হাতে সেই কাজটা আবার করতে পারব। ভুলেও আমার সঙ্গে চালাকি করার চেষ্টা করসি না।'

কালাচাঁদ পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দাদুর যক্ষায় মুখ দিয়ে রক্ত পড়ত। চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার দরকার ছিল। বাবাকে যখন এ গ্রাম থেকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে ঢোল পিটিয়ে বের করে দেওয়া হচ্ছিল, বাবা তখন প্রতিজ্ঞা করেছিল যে এই মধুচোরের বংশধর তার নিজের টাকায় একদিন পাঁচমুড়োর কুলদেবতার মন্দির সংস্কার করে তার এই অপমানের শোধ তুলবে।'

BanglaBook.org

।। ছয় ।।

শিবের স্তোত্রের আড়ালে কেন অঙ্কের ফর্মুলা? থান ইটের মতো মোটা অঙ্কের বই হাতে নিয়ে বদন অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিল, হরু ঠাকুরের সঙ্গে কালাচাঁদকে দেখে বিরক্ত মুখে উঠে বসল। কালাচাঁদকে দেখলেই তার দৃষ্টি নাক-কান কাটা শূর্পনখার মতো প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে।

হরু ঠাকুর বলল, 'আজ আর একটা পদ্য এনেছে কালা, একবার শুনবি নাকি?'

বদন ছাগল দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, 'মামা প্লিজ, জানি না তোমরা কী করছ। আমাকে তোমাদের সঙ্গে জড়িও না। নিজের যন্ত্রণা ভুলে থাকার জন্য অঙ্ক বইটা পড়ছি, এর মধ্যে যত সব উড়ো আপদ—'

কালাচাঁদ ঘাড়ে হাত বোলাল। দুপুরে মোষ বলির কথা বলতে বলতে বুড়োটা এমন জোরে ঘাড়টা টিপে ধরেছিল যে ঘাড় এখনও টনটন করছে। হরু ঠাকুর কালাচাঁদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, তোকে আজ জ্বালাব না, কালাটাকে পদ্যের ছন্দটা ধরিয়ে দিয়ে বিদেয় করি আগে। নে কালা, পড়—'

কালাচাঁদ কাগজটা বের করে পড়তে লাগল—

বোল শঙ্কর সংকট মর্দন জয়।
শিব কৌলেতে পক্ষেতে নেত্রেতে ক্ষয়—'

'হচ্ছে না, হচ্ছে না,' হরু ঠাকুর কালাচাঁদকে থামিয়ে দিল। 'এটা তোটক ছন্দ। তোটক ওরকম ভাবে পড়ে না। তোটক

ধা ধা ধিন / ধা ধা ধিন / ধা ধা ধিন / ধা ধা ধিন

করে পড়তে হয়। আমায় দে আমি পড়ি।' হরু ঠাকুর কালাচাঁদের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে সুর করে পুরো পদ্যটা পড়তে লাগল—

ধা ধা ধিন / ধা ধা ধিন / ধা ধা ধিন / ধা ধা ধিন
বো লো শঙ / ক রো সং / ক টো মর / দ নো জয়
শি বো কউ / লেতে পখ / খে তে নেত / রে তে ক্ষয়
শি বো কউ / লে তে ফল / ঋ তু চক / রে তে হয়
শি রে নেত / রো ত থায় / য বেঁ পখ / খে তে ক্ষয়
শি রে সং / খ্যা রি যোগ / তে এঁ ক্ষয় / ক ভো নয়
শি রে পন / চা নো নের / দু তী শঙ / ক রো জয়।'

'অ্যালজেব্রা,' বদন বই থেকে মুখ না তুলে বলল।

হরু ঠাকুর বদনের কথা কানে তুলল না। কালাচাঁদকে বলল, 'কালকের শিববন্দনাটা ছিল অক্ষরবৃত্ত পয়ারে, আজ তোটক—বাঃ মনটা খুশিতে ভরে গেল।'

BanglaBook.org

বদন অঙ্কের বইটা ঝপ করে বন্ধ করে বলল, 'তোটক-ফোটক বুঝি না। এটা অ্যালজেব্রা।'

'সেটা আবার কী বস্তু রে বদন?'

'বীজগণিত,' বদন বলল। 'শিব ঠাকুর অজানা মানে আননোন কোয়ান্টিটি এক্স। এখন শিবের শিরে নেত্র মানে এক্স এর মাথায় তিন, মানে এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি। আর শিবের শিরে পক্ষ মানে এক্স টু দি পাওয়ার টু।'

কালাচাঁদ কিচ্ছুটি না বুঝতে পারলেও তার অজান্তে তার মনঃসংযোগ এখন ধনুর্ধর অর্জুনের মতো তীব্র গভীর, তার প্রখর স্মৃতিশক্তির টেপ রেকর্ডারে বদনের কথার প্রতিটি শব্দ রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে।

'শিবের কোলে পক্ষে নেত্রে ক্ষয় হলে ফল ঋতুচক্রে হয়, মানে দুই গুণ তিন হল ছয়, আর শিবের শিরে পক্ষে নেত্রে ক্ষয় মানে এক্স টু দি পাওয়ার টু মালটিপ্লায়েড বাই এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি। কবিতায় বলছে তখন শিরে সংখ্যা গুণ না হয়ে যোগ হয়ে যায়। তার মানে এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স না হয়ে ফাইভ হয়ে যায়, সেটাই হল শিরে পঞ্চানন। তাই বললাম এটা পিওর অ্যালজেব্রা।'

'কিন্তু গুণটা কোথাও লেখা দেখছি না তো। বারবার ক্ষয় লিখেছে,' হরু ঠাকুর বলল।

বদন গম্ভীর স্বরে বলল—

সদৃশ দ্বিবধো বর্গস্ত্র্যাদি বধস্তদগতোঽন্য জাতিবধঃ।

হনন, বধ, ক্ষয় এগুলোকে প্রাচীন ভারতে গণিতে গুণ বা মাল্টিপ্লিকেশন হিসাবে লেখা হত। তোমার পদ্যে পক্ষেতে নেত্রেতে ক্ষয় মানে দুই গুণ তিন মানে ছয়, যাকে ঋতুচক্র বলেছে, আর বাকিটা অ্যালজেব্রা।'

হরু ঠাকুর বলল, 'হ্যাঁরে বদন, পদ্যের মধ্যে অঙ্ক দেখে একটা ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে গেল। আমার ঠাকুরদা বলতেন পঞ্চাননমঙ্গলে নাকি ছন্দ আর অঙ্ক যেন পাখির দুই পাখার মতো কাব্যটাকে নিয়ে উড়ত, সকলে সেটা বুঝতে পারত না, যারা রসিক তারা ঠিক ছন্দ আর অঙ্কটা দেখতে পেত। দ্যাখ, অঙ্ক বুঝি না, কিন্তু ছন্দ ব্যাপারটা আমার গুলে খাওয়া। এই যে পদ্যটা আওড়ালি এটা তোটক। তুই যে সময়ের কথা বলছিস সে সময়ে সংস্কৃতে তূণক, তোটক, মন্দাক্রান্তা, অনুষ্টুপ এসব চলত কিন্তু বাংলা ছন্দ তখন হাঁটি হাঁটি পা পা করে চৌপাই থেকে সবে পয়ারে নেমেছে। এই সময়ে তোটকে অঙ্ক মিলিয়ে দেওয়া—আমার সন্দেহ এটাই পঞ্চাননমঙ্গল।'

কালাচাঁদের গা শিউরে উঠল। সে যেন দেখতে পাচ্ছে ছন্দ আর অঙ্ক পাখির দুই পাখায় ডানা ঝাপটে উড়ে চলেছে কাব্য পঞ্চানন বা পঞ্চাননমঙ্গল।

BanglaBook.org

হরু ঠাকুরের প্রশংসা-বাক্যে কালাচাঁদের ঘোর কাটল—'বদন, তোর কোনো তুলনা হয় না। অবাক হয়ে যাচ্ছি, এগুলো শিখলি কী ভাবে?'

বদন নির্লিপ্ত মুখে বলল—'বই পড়ে। বইটা এই ঘরে তাকে ছিল, চুরি গেছে। কে চুরি করেছে সেটা তোমার অজানা নয়।' বদন উঠে দুমদুম করে হেঁটে ভিতরের ঘরে চলে গেল।

হরু ঠাকুর কালাচাঁদের অপ্রস্তুত দৃষ্টি দেখে বলল, 'আজ বদনার মুড ঠিক নেই, ক'দিন ধরে মাথায় ভুত চেপেছে কম্পিউটার বানাবার কারখানা করবে। টাকার জোগাড় হচ্ছে না।'

'তুমি যে সব সময়ে বুক ফুলিয়ে বলো তোমার ভগ্নীপতি একটাকিয়ার ভাতুড়িয়া রাজবংশের বংশধর, তবে?'

'সেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্যি। ওর বাপের ছিল রাজপুত্রের মতো টকটকে গায়ের রঙ। কিন্তু ঈশ্বর ওর বাপকে বেশি দিন রাখল না। বদনের জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই ওর বাপ অকালে টুপ করে খসে গেল।'

'কত টাকা?' কালাচাঁদ পকেটে হাত দিয়ে সদানন্দের টাকাগুলো স্পর্শ করল।

'পঁচিশ লাখ মতো।'

'অ্যাতো টাকা!' কালাচাঁদ পকেট থেকে হাত সরিয়ে নিল।

'বদন জমিও দেখে এসেছে, ব্যাংক লোন দেবে বলেছে তবে বাড়ি বন্ধক রাখতে হবে। ওর মা কিছুতেই তার মৃত স্বামীর বাড়ি বন্ধক দেবে না। এই নিয়ে বাড়িতে তুলকালাম চলছে।' কালাচাঁদ উঠে দাঁড়াল, চোরদের পেশায় তথ্য মাথায় রাখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কে জানে কবে কাজে লেগে যায়।

BanglaBook.org

।। সাত ।।

'কর্তামশাই, চিদানন্দ কর্তা কি সত্যি সত্যি আপনার ভাই?' কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করল। কালাচাঁদ আজ ইচ্ছা করেই সকাল সকাল পাঁচমুড়ো এসেছে, ধাড়ার সামনে সব কথা বলা যায় না।

'এখানে চিদানন্দ আসছে কোথা থেকে?' সদানন্দ ভটচাজ জিজ্ঞাসা করলেন।

'চিদানন্দ কর্তা নানা কথা বলেন, উনি নাকি দ্বিতীয় পক্ষের—'

'দ্বিতীয় পক্ষের বললেই দ্বিতীয় পক্ষের হয়ে গেল?' সদানন্দ খেঁকিয়ে উঠলেন। 'চিদে ক্রেইম করে আমার বাপের দু'টো বিয়ে ছিল। আরে বাবা, কোর্টে অনেক তো ঘোরাঘুরি করলি, প্রমাণ করতে পারলি? আমার বাপ—মানে বুঝিস

তো—এই বড়ো বড়ো জমিদারদের যেমন হয়—একটু ইয়ে—কিন্তু বাপের মনটা রাতের আকাশের মতো বিশাল ছিল, না হলে কোনোদিন শুনেছিস জমিদার তার রক্ষিতার ছেলেকে লেখাপড়া করে দত্তক নিয়েছে? হুঁ, দ্বিতীয় পক্ষ! শুনলেই মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে যায়। তা হঠাৎ চিদানন্দের প্রসঙ্গ কেন?'

'চিদানন্দ কর্তাও পঞ্চাননমঙ্গলের কথা জানেন।'

'তুই চিদানন্দের কাছে গেছিলি? তোকে না বারণ করেছিলাম।'

'আজ্ঞে, মুখের ওপর বলে দিয়ে এলাম যে ওনার টাকার আমার দরকার নেই, বললাম কর্তামশাই আমার মা-র চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করবেন এবং বিশ হাজার টাকা দিয়েছেন। তাছাড়া—' কালাচাঁদ একটু থামল।

'তাছাড়া?'

'মুখের ওপর জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি যদি পাঁচমুড়োর জমিদারির অংশীদার বলেন, তবে পাঁচমুড়ো ছেড়ে চলে এলেন কেন?'

'কী বলল সে?'

'আজ্ঞে, বললেন চড়ুইভাতি। আমি তো বুঝতে পারি নে চড়ুইভাতি করতে কেন উনি বিরাটিতে গিয়ে পাকাপাকি আস্তানা গাড়বেন।'

'কথাটা চরৈবেতি, ইডিয়েট।'

উনি বললেন আপনার মতো কুয়োর ব্যাঙ হলে চলে?

'ব্যাঙ! হারামজাদাটা আমায় ব্যাঙ বললে? ব্যাটা চিটিংবাজ! বাবার অত রমরমা ব্যবসা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিলি, আমায় ঠকালি আবার আমায় বলে কুয়োর ব্যাঙ!'

'আপনার বাবা বিজনেসম্যান ছিলেন বুঝি?'

'বাবার ধর্মতলায় নামকরা অ্যান্টিক্-এর দোকান ছিল।'

'সেটা কী বস্তু কর্তমশাই?'

'পুরোনো পুঁথি বিক্রি করতাম আমরা। একচেটিয়া বিজনেস। ইংরেজ আমলে সেই ব্যবসার এত রমরমা যে ব্যবসা সামলাতে বাবা পাঁচমুড়ো ছেড়ে কলকাতায় পাকাপাকি ভাবে থাকতে শুরু করেন। বাবার প্রাচীন পুঁথি সম্পর্কে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল, পুঁথির অক্ষর আর তালপাতা দেখে বলে দিতেন পুঁথির বয়স কত। বাবা আমাকে আর চিদেকে হাতেকলমে তালিম দিয়েছিলেন যাতে বাপের ব্যবসা আরও বাড়াতে পারি। বাবা বুঝতে পারেননি চিদেটা একটা কালসাপ।'

কালাচাঁদ প্রশ্ন করতে গিয়েও সামলে নিল, সদানন্দ এখন আগ্নেয়গিরির মতো লাভা বের করছে—অনেক পুরোনো লাভা জমে আছে এত তাড়াতাড়ি উদ্‌গীরণ শেষ হবে না। সদানন্দ আবার শুরু করলেন, 'বাবা মরার আগে উইলে ব্যবসার

BanglaBook.org

আধা আধা আমাকে আর চিদেকে দিয়ে গেছিলেন। আমি গ্রামেগঞ্জে ঘুরে ঘুরে মূল্যবান পুরোনো পুঁথি খুঁজে খুঁজে আনতাম আর চিদানন্দের কাজ ছিল ধর্মতলার দোকান সামলানো, কাস্টমারদের কাছে সেই পুঁথি বেচা। কিন্তু ভাবতেই পারিনি, চিদেটা আমায় ধোঁকা দেবে। অ্যান্টিকের দোকানে যে আগুনটা ধরেছিল, চিদে আমার কাছে কুন্তীরাশ্রুর বন্যা বইয়ে দিলেও আমার ঘোর সন্দেহ যে, সেটা কোনো দুর্ঘটনা না। আগুন লাগার আগে চিদানন্দ সমস্ত দামি পুঁথি পাচার করে দিয়েছিল।'

'কী ভাবে বুঝলেন?'

'ছাইয়ের ভিতর থেকে পোড়া লালশালুতে রামাই পণ্ডিতের তালপাতার পুঁথির প্রায় দগ্ধ তালপাতার একটা ছোটো টুকরো দেখে বুঝতে পেরেছিলাম যে এ পুঁথিটা নকল।'

'পোড়া তালপাতা দেখে বলে দিলেন?' কালাচাঁদ আগুনে ইন্ধন দিল।

'আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সোজা না। রামাই পণ্ডিতের যুগে দু'ইঞ্চি তালপাতা মোটেই চালু হয় নি। অতগুলো পুঁথি নষ্ট হওয়ার দুঃখ, আর তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, দুটো ধাক্কা একসঙ্গে সামলাতে পারিনি রে, সে রাতেই আমার প্রথম স্ট্রোকটা হয়—আর আমার বাঁ দিকটা চিরকালের মতো কমজোরী করে দেয়।'

'আহা, তারপর?'

'যথারীতি অ্যান্টিকের ব্যবসায় তালা লাগলো—রাতারাতি চিদানন্দ সেই পুঁথিগুলো বেচে অনেক পয়সা বানিয়ে ফেলল আর আমি ভাঙা মন নিয়ে আবার এই পাঁচমুড়োতে ফিরে এলাম। মানুষের ওপর থেকে বিশ্বাস উড়ে গেল, আর কারুর সঙ্গে মিশতে ইচ্ছা করত না। তারপর ত্রিশ বছর আর পাঁচমুড়োর বাইরে পা দিইনি, ভগ্নপ্রায় এই বাড়িটার সামনের দিকটা কাজ চালাবার মতো মেরামত করে এখানেই থাকি। গত বছর আরেকটা স্ট্রোকে বাঁ হাতটা একদম অসাড় করে দেয়।'

বাইরে একটা গাড়ি থামার আওয়াজ হল, ধাড়া ভিতরে ঢুকল, জুতোর মসমস আওয়াজে অর্থের অহংকারের প্রতিধ্বনি। কালাচাঁদ দেখল ধাড়ার চিবুক আজ নিম্নমুখী, দুশ্চিন্তার বোঝা তার গর্দান ঝুঁকিয়ে দিয়েছে, চোখের দৃষ্টিতে ভয় মাখা। কালাচাঁদকে দেখেই ধাড়ার মুখে আনন্দের আভাস ছড়িয়ে পড়ল, 'এই যে প্রডিজি, অলরেডি এসে গেছ, গুড গুড।' মুহূর্তের মধ্যে সেই আনন্দের আভাস মিলিয়ে গেল। তারপর সদানন্দের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মারাত্মক বিপদে পড়েছি ভটচাজ মশাই।' চেয়ারে ধপ করে বসে কপাল চাপড়াল ধাড়া।

'কেন কী হল?' সদানন্দ বললেন।

'সৌদির এই পাগলা শেখ আমায় খুন করে ফেলবে। আমায় বাঁচান।'

BanglaBook.org

'খুন করে ফেলবে?' সদানন্দ বললেন। 'আরে খুন করা এত সোজা নাকি?'

'এ ব্যাটা অওরঙ্গজেব। নিজের বাপ আর দুই ভাইকে এক রাতে খুন করেছিল। আমাকে ওড়াতে ওর এক মিনিটও লাগবে না।' ধাড়া মাথা চাপড়াতে লাগল।

'আরে কী হয়েছে সেটা বলবেন তো? কোন পাগলা শেখ?'

'এর বাপ আমার বন্ধু ছিল। বাপ পণ্ডিত মানুষ, রিয়াদে একটা আর্কিওলজিক্যাল গ্যালারি আছে, আমার থেকেও অনেক অনেক বড়ো। আমরা পুঁথি এক্সচেঞ্জ করতাম। এই ছেলেটার প্রাচীন ভারতীয় অঙ্ক নিয়ে প্রগাঢ় উৎসাহ, কিন্তু বেশি পড়তে পড়তে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়া যাকে বলে তাই হয়েছে। আগে বার বার এদেশে এসে গাদা গাদা বৈদিক অঙ্কের পুঁথি কিনে নিয়ে গেছে, লাখ লাখ টাকা খরচ করে।'

'লাখ লাখ টাকা!' সদানন্দ বললেন।

'তেলের পয়সা—লাখ টাকা তো ওদের কাছে তো নস্যি। কিন্তু বড়ো রগচটা। মাথা গরম হয়ে গেলে মানুষ খুন করতে একটুও আটকায় না। লাখ লাখ টাকায় প্রাচীন ভারতীয় পুঁথি কিনে নাকি সৌদি আরবে নিয়ে গিয়ে সব জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এই নিয়ে বাপের আর ভাইদের সঙ্গে রাতে নাকি খুব ঝগড়া-টগড়া হল, পরের দিন সকাল থেকে বাপ আর ওর দুই ভাই নিখোঁজ। সৌদি পুলিশ লাস খুঁজেই পেল না।'

'বলেন কি?' সদানন্দ ভটচাজ ঢোঁক গিললেন।

'আমাদের সার্কিটে গুজব আছে যে চিতাবাঘ দিয়ে খাইয়েছে,' ধাড়া গলার স্বর নামিয়ে বলল।

'চিতাবাঘ!' কালাচাঁদ বলল।

'ওর একটা প্রাইভেট জু আছে। তাতে বেশ কয়েকটা চিতাবাঘ আছে। ওর পক্ষে অসম্ভব কিছু না। ওর সাঙ্গোপাঙ্গোগুলোকে দেখলে মনে হয় পেশাদার খুনি। প্রাচীন মূর্তি-টূর্তি কেনার একটা ডেঞ্জারাস ইন্টারন্যাশনাল মাফিয়াচক্র মিডল ইস্টে খুব সক্রিয়। শেখ শুনেছি এই দলের এক বড়ো চাঁই। খুনটুন করা এদের কাছে ছেলেখেলা। কেন যে কাল রাতে ফোনে আপনার এই পঞ্চাননমঙ্গলের কথা বললাম?'

'আপনি এরকম একটা লোককে পঞ্চাননমঙ্গলের কথা বললেন?' কালাচাঁদ হতবাক।

'খুব ভুল করে ফেলেছি। পঞ্চাননমঙ্গলের নাম শুনেই শেখ লাফিয়ে উঠল। যেই বলেছি যে একটা পুরোনো কপির সন্ধান পাওয়া গেছে আর আমি তার একটা পাতা নিজের চোখে দেখেছি ব্যাস কূর্ম অবতারের পিঠে মেদিনী যেন দুলে উঠল। শেখ উত্তেজিত হয়ে বলল পড়ে শোনাতে ওই পাতা। আমি তো মশাই আপনার

BanglaBook.org

এই পাথরে লেখা কবিতাটা দিলাম পড়ে আর তার মানেটা বুঝিয়ে দিলাম। "পাই" এর অঙ্ক শুনে শেখ বলল, সে নিশ্চিত এটাই নাকি সেই পঞ্চাননমঙ্গল। সে ওটা কিনতে চায়, যত টাকা লাগে তত টাকা দেবে। কিন্তু এ খবর যেন পাঁচকান না হয়। আমি তো মশাই বিপদে পড়লাম। আমাকে শেখ জিজ্ঞাসা করল যে, কোথায় পেলাম ওই পুঁথির খবর। এই জলের তলার পাথরের কথা গোপন করে বললাম কালাচাঁদ পণ্ডিত নামে একজন অ্যাস্ট্রোলজার জানে এটার খবর। ভাবলাম ঝামেলা বোধহয় মিটে গেল, তারপর আজ সাত সকালে ফোন, পাগলা শেখ ইন্ডিয়ার টিকিট কেটে ফেলেছে। কাল সকালে দমদমে ল্যান্ড করছে।'

কালাচাঁদ ঘাবড়ে গিয়ে রাগতঃ কণ্ঠে বলল, 'আপনি আমাকে এর মধ্যে কেন জড়ালেন?'

ধাড়া বলল, 'আরে মুখে তখন তোমার নাম এসেছে বলে দিয়েছি। এ নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু হয়নি। বাংলাদেশে হাজার হাজার কালাচাঁদ পণ্ডিত আছে। ভাবছি পঞ্চাননমঙ্গল না পেলে এই পাথরগুলোর অঙ্ক দেখিয়ে দেব ওই পাগলা শেখকে। একটা অঙ্কে তো ঠিক যুতসই জবাব হয় না, আরও অঙ্ক চাই। তুমি কি কালকের ম্যাথেমেটিক্সের ধাঁধার রহস্যটা ভাঙতে পারলে?'

কালাচাঁদ চিন্তিত মুখে বলল, 'তোটকে অ্যালজেব্রা!'

ধাড়া ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'সেটা আবার কী ধরনের অ্যালজেব্রা?'

কালাচাঁদ বলল, 'দুই-য়ে পক্ষ আর তিন-এ নেত্র গুণ করলে হয় ছয়-য়ে ঋতু।'

'হ্যাঁ তা হয়', ধাড়া বলল।

'কিন্তু অ্যালজেব্রাতে এক্স এর পাওয়ার দুই আর এক্স এর পাওয়ার তিন গুণ করলে ছয় হয় না, যোগ হয়ে পাঁচ হয়ে যায়। এটাই তোটক ছন্দে এখানে বলা আছে।'

'এক্সেলেন্ট,' ধাড়ার মুখে স্বস্তির হাসি যেন বাদলার মেঘের ফাঁকে এক চিলতে সূর্য চিকচিক করে উঠল। কালাচাঁদ দেখল সূর্য না, যেটা চিকচিক করল সেটা ধাড়ার নীচের দাঁতের পাটির ভিতরের চারটি দাঁত—সোনা দিয়ে বাঁধানো। কালাচাঁদ বুঝল সে অন্ধের মধ্যে কানা রাজা। সে ভারিক্কি চালে বলল, 'ছন্দে অঙ্ক এমনভাবে মিশে আছে যেমন সরবতে চিনি মিশে থাকে। দেখা যায় না, কিন্তু স্বাদে বোঝা যায়। আগের কবিতাটা ছিল পয়ারে-পাই। যিনি এই পদ্যগুলি লিখে গেছেন তিনি অঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দে পারদর্শী ছিলেন।'

'তিনি না হয় পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তুই কবে থেকে পারদর্শী হলি রে কালা?' সদানন্দ ভটচাজ বললেন।

কালাচাঁদ দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'আজ শুধু অঙ্কটাই বোঝালাম আরেকদিন এসে

BanglaBook.org

তোটক আর তূণকের মধ্যে ফারাক বুঝিয়ে যাব। আজ একটু তাড়াতাড়ি আছে। তবে আমার মন বলছে এগুলোই পঞ্চাননমঙ্গলের লাইন।'

'জিনিয়াস,' ধাড়া বলল। 'কিন্তু এই পঞ্চানন দেবতার হিস্ট্রিটা একটু ব্রিফলি বলতে পারবেন? মানে পাগলা শেখ যদি জিজ্ঞেসটিগ্যেস করে—'

সদানন্দ এতক্ষণ অঙ্কে দাঁত না ফোটাতে পেরে একটু ম্রিয়মাণ মতন ছিল, এবার উৎসাহ নিয়ে বলল—'পঞ্চানন দেবতা হল শিবলিঙ্গে পাঁচমুখী শিব। শিবের নানা রূপের মূর্তি বাংলার বিভিন্ন গ্রামে পাওয়া গেছে। কখনও শিব নটরাজ হয়ে তাণ্ডব নৃত্য করছে, কখনো শিব কপালে চাঁদ নিয়ে চন্দ্রশেখর, কখনও মহেশ্বর রূপে উমার সাথে একসঙ্গে। সাধারণত শিবের একটা মুখ, দুই নেত্র ছাড়াও কপালে আরও একটা নেত্র, কর্ণে কুণ্ডল, মাথায় জটা, এক হাতে ত্রিশূল, গলদেশে সর্প ও অক্ষমালা, বাহুতে কেয়ূর, গলায় যজ্ঞোপবীত। এছাড়া আমরা মন্দিরে মন্দিরে দেখি শিবলিঙ্গ। আমি বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে অনেক সদাশিব মূর্তি দেখেছি। সদাশিবের পাঁচটি মুখ ও দশ হাত। গরুড়পুরাণে সদাশিবের বর্ণনা আছে। দক্ষিণের পাঁচ হাতের দুই হাতে অভয় ও বরদ মুদ্রা, বাকি তিন হাতে শক্তি, ত্রিশূল ও খট্টাঙ্গ। বামে পাঁচ হাতে সর্প, অক্ষমালা, নীলোৎপল, ডমরু ও লেবু। বিদেশি কাস্টমাররা এই সদাশিবের পিতল মূর্তি খুব কিনে নিয়ে যেত আমাদের ধর্মতলার দোকান থেকে। পঞ্চমুখী শিবের মূর্তির প্রচুর প্রচলন আছে দক্ষিণ ভারতে। বাঙাল সেনদের পদবি সেন হলেও ওরা বাঙালি ছিলেন না, ওরা চন্দ্রবংশীয় কর্ণাট দেশবাসী ক্ষত্রিয় ছিলেন। আমার বিশ্বাস ওদের কেউ বাংলাদেশে সদাশিবের পাঁচমাথা মূর্তি নিয়ে আসেন। কেননা সেনরাজাদের তাম্রশাসনে সদাশিবের মূর্তির ছবি দেখা যায়। লক্ষণ সেন বৈষ্ণব হলেও তাঁর পূর্বপুরুষরা শৈব ছিলেন। বাংলাদেশে সেন রাজারা পাঁচমাথা শিব নিয়ে এলেও পাঁচমুড়োতে যিনি পঞ্চানন বাবাকে নিয়ে এলেন তিনি হলেন নন্দীধন—সাতসকালে তার পানসি এসে থামল বেগবতীর ঘাটে, সঙ্গে ঘুমিয়ে কাদা ফুলের মতো শিশুকন্যা আর একটা পাঁচ ফুট লম্বা শিব লিঙ্গ তাতে পাঁচমুখী বাবা পঞ্চানন।

'ইন্টারেস্টিং,' ধাড়া বলল।

সদানন্দ কিছু বলার আগেই দুলাল নায়েব 'সাবধান সাবধান' বলতে বলতে ঢুকল, পিছে পিছে চারজন দেহাতি লোক দুটো বিশাল সেলেট পাথর ধরাধরি করে বৈঠকখানায় এল। সদানন্দ হৈ হৈ করে বললেন, 'একদম ধীরে ধীরে নামা, যেন না ভাঙে—প্রাচীন শিলালিপি।'

বাগদিরা পাথর দু'টোকে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে এসেছে। লাঠিতে ভর দিয়ে সদানন্দ পাথরের সামনে মোড়ায় বসে বললেন, 'দুলাল, আমার কাগজকলম নিয়ে আয়।'

ধাড়া বলল, 'ভটচাজ মশাই, আমি কটা দিন কলকাতার বাইরে যাব।

BanglaBook.org

বাজিতপুরে একটা পুঁথির সন্ধান পেয়েছি দেখি ওটা অন্তত যদি শেখের জন্য আনতে পারি।'

'আবার বাজিতপুর? সাবধানে যাবেন।' সদানন্দ বললেন।

'সত্যি কথা বলতে কি শেখের সঙ্গে খালি হাতে দেখা করার মতো বুকের পাটা আমার নেই। আমি শেখকে বলেছি বিশেষ কাজে কলকাতার বাইরে থাকব। ফিরতে ফিরতে তিন চার দিন লাগবে। আমি চাই আপনারা ব্যাপারটা একদম গোপন রাখবেন। আমার মন সারাক্ষণ এখানে পড়ে থাকবে। আপনারা রিসার্চ চালিয়ে যান। মূল্যবান জিনিস, এ তো আর হাত ঘোরালে নাড়ু পাব না, খাটতে হবে। ভটচাজ মশাই দরকার পরলে আরও কয়েকজন বিশ্বাসী লোক লাগান।'

কালাচাঁদ বলল, 'কর্তামশাই, আমি বরং চয়নবিলের পাশ থেকে একটু ঘুরে আসি, ফেরার সময় আপনার কাছ থেকে পদ্যটা নিয়ে যাব।'

ধাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কালাচাঁদ বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, 'স্যার, আপনার শেখ কলকাতায় এসে যেখানে উঠবে তার ঠিকানাটা দেবেন?'

'কেন?' ধাড়ার দু'চোখে কুটিল সন্দেহ।

'আপনার ভালোই হবে তাতে, আপনার শেখকে নিজের পরিচয় দেব, বলব যে আমিই আপনাকে বলেছি পঞ্চাননমঙ্গল এনে দেব। তাতে আপনি যে ওকে সত্যি বলেছিলেন সেটাও প্রমাণ হবে। একটা পুঁথি আছে সেটাও বেচে আসব। তর্পণ গঙ্গাস্নান দুটোই এক সঙ্গে হয়ে যাবে।'

ধাড়া ঠোঁট কামড়ে বলল, 'এটা মন্দ বলোনি। আচ্ছা আমার অ্যাসিস্টেন্ট তোমাকে নিয়ে যাবে শেখের কাছে। ওকে এই নাম্বারে ফোন করো। তবে সাবধান, শেখ কিন্তু বদ্ধ উন্মাদ, পাগলা কুকুরের মতো ক্ষতিকর, ওকে অযথা বেশি ঘাঁটাতে যেও না।'

কালাচাঁদ ফোন নাম্বারটা পকেটে ঢুকিয়ে বলল, 'সে আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

'আর একটা কথা,' ধাড়া দু'দিক দেখে গলা নামিয়ে বলল। 'এই চয়নবিলের পাথর থেকে যদি পঞ্চাননমঙ্গল পাও, তবে সেটা ভটচাজমশাই যেন না জানে।'

'সে আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন,' কালাচাঁদ একটা গা জ্বালানো হাসি হাসল। 'কাকপক্ষীতেও টের পাবে না।'

ধাড়া হেসে গাড়িতে ঢুকল। কালাচাঁদ বুঝল তাকে আজও এই পদ্যগুলোতে লুকিয়ে থাকা অঙ্ক বের করাবার জন্য বদনের রক্তচক্ষু হজম করতে হবে। তার ভালো লাগে না অঙ্ক বোঝবার জন্য গালটা বাড়িয়ে স্বেচ্ছায় বদনের থাপ্পড় খেতে কিন্তু হরু ঠাকুরকে পাঠিয়ে এ কাজ হবে না। সত্যি বলতে কি পকেটে যে বিশ হাজার টাকা এসেছে তার জন্যে বদনের অবদান কম নয়। কিন্তু মনে

BanglaBook.org

কৌতূহল রয়ে গেল শেখ কেন এত পড়িমরি করে পঞ্চাননমঙ্গল দেখতে আসছে? কী এই পুঁথির রহস্য?

।। আট ।।

পুঁথি জাল করা কি যার তার কাজ? হরু ঠাকুর নিজের ভাগ্যকে গালাগাল করছিল আর তক্তপোশে বসে একটা পুরোনো তালপাতার পুঁথির মাঝের কয়েকটা পাতা এক এক করে খুলে খুলে রাখছিল। উলটো দিকে জানলার পাশে রাখা সাদা-কালো টিভিতে ঝিরি-ঝিরি অস্পষ্ট কোনো সান্ধ্য-সিরিয়াল হচ্ছে, কিন্তু হরু ঠাকুরের সেদিকে খেয়াল নেই ; তার অখণ্ড মনোযোগ তালপাতার পুঁথিতে।

কালাচাঁদ ঘরে ঢুকে বলল, 'হয়ে গেছে?'

হরু ঠাকুর কোনো উত্তর দিল না।

কালাচাঁদ বলল, 'ছাতে অ্যান্টেনাটায় আবার নিশ্চয়ই কাক বসে ঘুরে গেছে, টিভিটা ঝিরঝির করছে। কাল সকালে শেখ কলকাতায় নামছে, ধাড়ার এজেন্ট বলল বিকেলেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে। এই কাজটা হয়ে গেলে, একবার বদনের কাছে যেতে হবে, আজকের পদ্য দুটোর পাঠোদ্ধার করতে হবে।'

'এত প্রেসার দিবি নে কালা। তোর শেখ কাস্টমারের জন্য আজ টিভি সিরিয়ালগুলো পর্যন্ত দেখার সময় পেলাম না। গোবিন্দদাস কোবরেজের পুঁথিটা থেকে বাগুলিকেত্তনটা ছেঁটে বের করা কি ইয়ার্কি ব্যাপার?'

'ভাগ্যিস আমি বলেছিলাম, না হলে তো অনর্থ হয়ে যেত। কিন্তু ক'দিন ধরে গোবিন্দদাস কোবরেজ আর বাগুলিকেত্তন কপচাচ্ছ, ঝামেলাটা কোথায় সেটা কি বলবে?'

'চণ্ডীদাস প্রথম জীবনে শাক্ত ছিলেন, খুব মদ টদ খেতেন। ওকে লোকে আড়ালে ডাকত মদো চণ্ডে বলে। উনি মা বাগুলির পূজা করতেন। একদিন নদীতে চান করার সময় দেখলেন জলের স্রোতে একটা পদ্মের কোরক ভেসে আসছে। চণ্ডীদাস তো খুব খুশি, আজ এটা দিয়ে বাগুলি মা'র পুজো করবে। তারপর উনি ভাবলেন যে এটা অন্য কারুর পুজোয় সমর্পিত ফুল না তো? তা হয়ে থাকলে কোরকটা খোলা পদ্ম হত। তিনি নিয়ে তো এলেন সেই পদ্ম বাগুলি মায়ের মন্দিরে। পুজোয় বসে যেই না তিনি চোখ বুজেছেন, তখনই মা ভগবতী তাঁর ধ্যানের মধ্যে এসে বললেন—বেটা, ওই ফুল আমার পায়ে রাখিস না, ওটা আমার মাথায় রাখ। চণ্ডীদাস অবাক হয়ে বললেন—মা তোমাকে ফুল

দিয়ে পুজো করছি, ফুল তো তোমার পায়ে রাখা উচিত, মাথায় রাখতে বলছ কেন? মা ভগবতী বললেন—বেটা, এই ফুলে আমার গুরুর পুজো হয়ে গেছে, এ আমি কী ভাবে পায়ে রাখব? চণ্ডীদাস বললেন—মা তুমিই তো জগতের গুরু, তোমার আবার গুরু কে? মা বললেন—বৈকুণ্ঠ নারায়ণ আমার গুরু। তখন চণ্ডীদাস বললেন—মা তুমি যখন বিষ্ণুর ভক্ত, তখন আজ থেকে আমিও বৈষ্ণব, আমি এখন থেকে মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলাম। সেই থেকে চণ্ডীদাস বৈষ্ণব হয়ে গেলেন আর তাঁর বৈষ্ণব পদাবলী ধরাধামে অমর হয়ে রইল। কিন্তু কাস্টমার এই গল্প যখন গোবিন্দদাসের পদাবলীতে পড়বে তখন কী হবে? এই জন্যে আমি কক্ষনো দু'জন কাস্টমারের কাজ এক সঙ্গে নিই না।'

'একদম ফালতু কথা বলবে না,' কালাচাঁদের রাগের উনুনের আঁচ যেন হরু ঠাকুর উস্কে গনগনে করে দিল। 'ভাঙের গুলি খেয়ে পুঁথি লিখতে বসলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে তো পড়বেই, কাস্টমারের ইল্লান্ট শুনতে হয় আমাকে।'

হরু ঠাকুর বলল, 'ঠিক আছে মানলাম, কিন্তু এই কাস্টমারের কাছে এবার দু'জনে এক সঙ্গে যাচ্ছি। কাল দুপুরে এখানে এসে খাস, জাউখুদের খিচুড়ি বানাব। এখন আমাকে জ্বালাস নে।' হরু ঠাকুর লেখায় মনোনিবেশ করল। কালাচাঁদকে অগত্যা উঠতে হল।

পরদিন একটু বেলায় কালাচাঁদ হরু ঠাকুরের বাড়ি এল। খাওয়াদাওয়া শেষ হতে হরু ঠাকুর একটা ঢেকুর তুলে একটা রঙ চটা লাল শালুতে পুঁথি বগলদাবা করে বলল—'চল, কোথায় যেতে হবে?'

'ধাড়ার অ্যাসিস্টেন্ট ওয়েট করবে ধর্মতলায় মেট্রোর পাশে।'

দু'জনে বেরিয়ে এল।

বিবর্ণ সাফারিতে ধাড়ার অ্যাসিস্টেন্টের চেহারা দেখেই কালাচাঁদ বুঝে গেল অ্যাসিস্টেন্ট-ফ্যাসিস্টেন্ট সব ফালতু কথা, লোকটা পাতি সস্তা দালাল। ফুটপাতে পানের পিক ফেলে বলল, 'দামটাম আমিই বলব। তোমরা শুধু পুঁথি দেখাবে। ট্যাক্সি ভাড়া তোমরা দেবে।' একটা ট্যাক্সি ডেকে তিন জনে উঠল। দালালটা বলল, 'ঠাকুরপুকুর।'

জোকা ছাড়িয়ে আরও কিছুটা গিয়ে একটা বিশাল বাড়ি—চারপাশ জেলখানার মতো উঁচু কাঁটাতার দেওয়া দেওয়াল। দারোয়ান বিশাল লোহার দরজা খুলে দিল। ভিতরে পিচ ঢালা ড্রাইভওয়ে—ট্যাক্সি ভিতরে ঢোকার সময় হরু ঠাকুর লাল শালুতে জড়ানো পুঁথিটা বগলে রেখে হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে কোন্ এক দেবতাকে প্রণাম করল।

BanglaBook.org

ভিতরে এসে শেখকে দেখে কালাচাঁদের খুব অস্বস্তি হল। ঠিক পাগলা কুকুরের মতো লাল অন্যমনস্ক চোখ। শেখ সোফায় পা-মুড়িয়ে বসে তারস্বরে বকাঝকা করছে. সোফার দু'পাশে দু'জন দানবের মতো চেহারার আরবের বডিগার্ড মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পরণে সাদা লম্বা কুর্তা পায়জামা, এক জনের মুখে কাটা দাগ, দেখলে মনে হয় জেল ভাঙা খুনের আসামি। শেখ নিস্পৃহভাবে ওদের দিকে চাইল। একজন বডিগার্ড ইঙ্গিতে ওদের বসতে বলল। দীর্ঘদেহী লোকটার পাশ দিয়ে যাবার সময় কালাচাঁদ লোকটার গায়ে উগ্র আতরের গন্ধ পেল। কালাচাঁদের সঙ্গে ধাড়ার অ্যাসিস্টেন্ট উলটোদিকের সোফায় বসতে শেখটা আরবিতে কী যেন জিজ্ঞাসা করল, ধাড়ার অ্যাসিস্টেন্ট দালালটা বাংলায় তর্জমা করে বলল, 'শেখ বলছে মালটা দেখাতে।'

হরু ঠাকুর বলল, 'এই যে,' হরু ঠাকুর পুঁথিটা লাল শালু থেকে খুলে সামনের টেবিলে রাখল। শেখটা আরবিতে কী যেন জিজ্ঞাসা করল, দালাল বাংলায় তর্জমা করে বলল, 'মালটা অরিজিন্যাল?'

কালাচাঁদ গলার নলিতে দু'আঙুল ধরে বলল, 'মা কসম।'

শেখ জিজ্ঞাসা করল, 'মালটার মালিক কে?'

হরু ঠাকুর বলল, 'আমি।'

'তবে এ কেন বকবক করছে?'

কালাচাঁদ চুপ।

'দু'জনে কেন? এই লোকটা কে?' শেখ কালাচাঁদকে দেখিয়ে বলল। 'পুলিস?'

'পুলিস কেন হবে?' হরু ঠাকুর বলল।

পুলিস শুনে কালাচাঁদের হাসি পেল। পুলিসরা চোর হয় এটা সে অনেকবার শুনেছে, কিন্তু চোরেরা পুলিস হয় এটা সে কখনও শোনেনি। সে জীবনে এত বড়ো ইজ্জত কখনও পায় নি। শেখ আবার কী বলল, দালালটা বলল, 'শেখ বলছে প্রশ্নের উত্তর এখনও পায় নি। এ কেন এসেছে এখানে? এর নাম কি?'

এবার শেখের দিকে তাকিয়ে কালাচাঁদ উত্তর দিল—'কালাচাঁদ পণ্ডিত, আমি পুঁথি খাঁটি কিনা যাচাই করি।'

নাম শুনে শেখ ভুরু কুঁচকে কী যেন চিন্তা করল, তারপর আরবিতে কি সব বলল যেটা দালালটা অনুবাদ করে দিল—আবার নাম বলতে বলছে।'

'কালাচাঁদ পণ্ডিত।'

শেখ এবার তার এক জন দাঁড়িয়ে থাকা ভৃত্যকে কী বলল, সে মাথা নুইয়ে হুকুম তালিম করতে ভিতরে চলে গেল।

শেখটা আরবিতে কী জিজ্ঞাসা করল দালালকে। দালাল বলল—শেখ বলছে

BanglaBook.org

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে চোর আর নয়তো পুলিসের খোচর। শেখ জিজ্ঞাসা করছেন, যে এই লেখকের লেখা আর কী বই তুমি পড়েছ?'

কালাচাঁদের বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠল। কালাচাঁদ গোবিন্দদাস কবিরাজের নামটা দু'দিন আগে অবধি জানত না, হরু ঠাকুরের কাছে নামটা শুধু শুনেছে। কালাচাঁদ তোতলাতে লাগল। কিন্তু কোনো বইয়ের নাম কালাচাঁদের মাথায় আসছে না, শুধু একটা বইয়ের নাম ছাড়া। যা থাকে কপালে—কালাচাঁদ বলল অনেক পুরোনো লেখক। এর লেখা আরেকটা বই যেটা আমি পড়েছি—মানে ইয়ে, আজকাল বাজারে এক আধটা জায়গায় খুব খুঁজলে তবে মেলে—মানে—ইয়ে—'

'শেখ জিজ্ঞাসা করছেন তোতলাচ্ছ কেন?'

'পঞ্চাননমঙ্গল।'

সঙ্গে সঙ্গে শেখের চোখে বিস্ময় দেখতে পেল কালাচাঁদ। শেখ আতঙ্কে বলে উঠল—'مخطوطة الشيطان' কালাচাঁদ যেন ওদের একটা বিরাট গোপন রহস্য ফাঁস করে দিয়েছে। উত্তেজনায় শেখ আরবিতে হামাস-ধামাস করে অনেক কিছু বলল।

'কী বলছে এরা?' হরু ঠাকুর জিজ্ঞাসা করল।

'পঞ্চাননমঙ্গল শয়তানের পুঁথি,' দালালটা বলল, 'শেখ জিজ্ঞাসা করছেন—'এই পুঁথিটাও কি পঞ্চাননমঙ্গলের কবির লেখা?'

হরু ঠাকুর বলল—'হ্যাঁ।'

'কত দাম এটার?'

'বিশ হাজার টাকা,' ভয়ের চোটে কাঁপতে কাঁপতে হরু ঠাকুর জলের দামে পুঁথি ছেড়ে যেন পালাতে পারলে বাঁচে।

'আর আমার কমিশন পাঁচ হাজার,' কালাচাঁদ বলল। 'পুঁথিটার গ্যারান্টি আমার।'

লোকটা আরবিতে অনুবাদ করতেই শেখ পাশের একটা ব্যাগ থেকে কয়েকটা টাকার বান্ডিল দু'আঙুলে দুলিয়ে হাওয়ায় ছুড়ে দিল ওদের দিকে মাটিতে, ঠিক যেমন কুকুরকে লোকে লেড়ে বিস্কুট খাওয়ায়। কালাচাঁদ টাকার বান্ডিলগুলো মাটি থেকে তুলে অবাক হয়ে দেখল শেখ একটা লাইটার জ্বালল তারপর পুঁথিটার একটা কোনা আগুনে ধরল, শুকনো তালপাতার পুঁথি দাউদাউ করে জ্বলে উঠতেই মুখে কাটা দাগ খুনিখুনি দেখতে লোক এগিয়ে এসে জ্বলন্ত তালপাতা মশালের মতো করে ধরে এনে ঘরের কোনায় ওয়াশ-বেসিনে এনে ফেলল আর পুঁথিটা জ্বলে ছাই হয়ে গেল। শেখের চোখের দৃষ্টিতে যেন আদিম মানবের আগুনে শিকার ঝলসাবার উন্মত্ততা। কালাচাঁদ বুঝল এই আরবের শেখ ধাড়া যা বলেছে তার চেয়েও মারাত্মক।

BanglaBook.org

ভিতরের ঘর থেকে শেখের ভৃত্য একটা ব্রিফকেস এনে শেখের হাতে দিল। শেখ ভিতর থেকে একটা খাম বের করে দালালের হাতে দিয়ে আরবিতে কিছু বলল।

দালালটা বলল, 'এই লোকটা তোমার নাম শেখকে বলেছে।' দালাল খাম থেকে একটা ফটো বের করে দেখাল। কালাচাঁদ দেখল—অংশুমান ধাড়া।

কালাচাঁদ বলল, 'একে আমি চিনি এ হল ডক্টর ধাড়া।'

শেখ খুশি হয়ে মাথা নাড়িয়ে আবার হামুস-হুমুস করে অনেক কিছু বলল। দালাল অনুবাদ করে বলল, 'ধাড়া বলছেন তুমি জানো পঞ্চাননমঙ্গল কোথায় পাওয়া যাবে। শেখের পঞ্চাননমঙ্গল চাই।'

হরু ঠাকুর কাঁপা গলায় বলল, 'আমরা জানি না কোথায় পাওয়া যাবে পঞ্চাননমঙ্গল। কালাচাঁদ ভয়ের চোটে কি বলতে কি বলেছে।'

দালালটা বাংলায় বলল, 'এই কথাটা শেখকে বললে এখুনি তোমার গলার নলিটা হালাল করে দেবে।'

হরু ঠাকুর বিড়বিড় করে বলল, 'এ কোথায় ফাঁসলাম, সাবধান কালা, আগুনে কেরোসিন ছেটাস নে।'

কালাচাঁদ বলল, 'ঠিক আছে, আমি সাত দিনে পঞ্চাননমঙ্গল এনে দেব। আমি জানি কোথায় ওটা পাওয়া যবে। দু'কোটি টাকায় বেচবো, ক্যাশ। এখন দু'লাখ টাকা অ্যাডভান্স লাগবে। অনেককে হাত করতে হবে।'

অনুবাদক আরবিতে বলল। শেখ ব্রিফকেস থেকে টাকার কয়েকটা বান্ডিল বের করে একটা বড়ো ঠোঙ্গা কালচাঁদের হাতে দিল।

দালালটা ভর্ৎসনা করে বলল, 'তোমাদের বললাম টাকার কথা আমি বলব। দু'কোটি টাকা মানে জলের দামে বেচতে চাইছ। এই পুঁথি এনে আমার হাতে দেবে, আমি এই শেখকে বেচব না অন্য কোথাও বেচব সেটা ঠিক করব। তোমরা আড়াই খোকা পাবে। আবার বলছি ডিল আমার হাত দিয়ে হবে। এই আরবের নধর মোরগটা যেন জানতে না পারে যে ওর গলা কাটছি।'

শেখ যেন কত বুঝেছে সে ভাবে মাথা নাড়ল। তারপর কিছু একটা বলল। দালালটা বলল—শেখ বলছে বিশ্বাসঘাতকতা শেখ ঘেন্না করে। শেখ বলছেন বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি কী তা জানো?

হরু ঠাকুর বলল—কী?

শেখ বাঁ হাতটা উপরে তুলল, পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মুখে কাটা দাগওয়ালা আরবি লোকটা মুহূর্তের মধ্যে একটা ভোজালি বের করে দালালের বুকে গেঁথে দিল। রক্ত ফোয়ারার মতো বইতে লাগল। শেখ ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল—'শুয়ারের বাচ্চাটা নিজেকে বড়ো চালাক ভেবেছিল। শেখ আল-খোয়ারিজমির

BanglaBook.org

সঙ্গে বেইমানি। হারামি। পুঁথিটা পেলে ও অন্য কারুকে বেচে দিত। এ পুঁথি যদি আমি না পাই তবে সবকটাকে জ্বালিয়ে তবে দেশে ফিরব। পুঁথিটা আমার চাই-ই।' পাশে দাঁড়ানো আরেকটা ভৃত্য তাড়াতাড়ি সোফার একটা বালিশ এনে দালালটার বুকে চেপে ধরল, সাদা বালিশের রুধির স্নাত তুলো সিক্ত রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। শেখ কালাচাঁদের দিকে আঙুল তুলে শাসিয়ে বলল, 'ধাড়া তোমার নাম বলেছে। তোমার ভরসায় সব কাজকম্মো ফেলে এখানে এসেছি। আশা করি, মিথ্যা কথা বলে আমায় ডেকে আননি। সাত দিনের মধ্যে আমার পঞ্চাননমঙ্গল চাই। না হলে—'

কালাচাঁদ দেখল দালালটা ছটফট করতে করতে স্থির হয়ে গেল। হরু ঠাকুরের মুখ প্রচণ্ড ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

কালাচাঁদ সোফা ছেড়ে উঠে বলল—ঠিক আছে, পেয়ে যাবেন। এখন আসি তাহলে।'

—দাঁড়াও।

শেখ তর্জনী দেখিয়ে বলল, 'এ ঘরের বাইরে যদি এই কুত্তাটার কথা কেউ জানতে পারে তবে তোমাদের মাংস পিস পিস করে কেটে চিড়িয়াখানায় চিতাবাঘের খাঁচায় পাঠিয়ে দেব।'

কালাচাঁদ ঢোক গিলে মাথা নাড়ল।

'এটা অনেক টাকার সওদা,' শেখ বলল। 'পুঁথি জাল কিনা সেটা ধাড়া যাচাই করে দেখবে। ওকে তোমরা পুঁথিটা দেখাবে। মনে থাকে যেন সাত দিন। আমার ধৈর্য খুব কম। তোমার বাড়ির ঠিকানাটা লিখে দিয়ে যাও।'

প্রচণ্ড ভয়ের মধ্যে বাড়ির ঠিকানা লিখতে লিখতে কালাচাঁদ স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে লাগল—অংশুমান ধাড়ার অতি লোভ তাদের একটা পাগলা খুনির খপ্পরে এনে ফেলেছে। কিন্তু এরা একটা প্রাচীন পুঁথির জন্য মানুষ খুন করে ফেলল। কী রহস্য লুকিয়ে আছে ওই পুঁথিতে?

ড্রাইভওয়েতে ট্যাক্সির মিটার অন করে ট্যাক্সিওয়ালা বসেছিল, কালাচাঁদ আর হরু ঠাকুর বাইরে আসতে ট্যাক্সিওয়ালা বলল, 'অনেকক্ষণ সময় লাগালেন, আমার মিটারের দোষ দেবেন না।'

কালাচাঁদ বলল, 'চল, রাজাবাজার।'

'উনি এলেন না?'

'নাঃ,' কালাচাঁদ বলল। 'উনি এখানেই থেকে গেলেন।'

ট্যাক্সি আবার লোহার দরজা পেরিয়ে রাস্তায় নামল, কালাচাঁদ উত্তেজনায় লক্ষ করল না যে পিছনে একটা কালো বিদেশি গাড়ি ওদের ট্যাক্সির পিছু নিল।

BanglaBook.org

॥ নয় ॥

'নির্বিকার মুখে খুনটা করল রে বদন,' হরু ঠাকুর ম্যালেরিয়া রুগির মতো কাঁপতে কাঁপতে বলল। 'একদম কসাইয়ের পাকা হাত, এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়তে দিল না।'

বদনের লাল চোখ দু'টো রাগে পাঁঠার মেটের মতো কালচে লাল, উঠে দাঁড়িয়ে আলোর সুইচটা অন করল। 'ঠিকানাটা দাও তো মামা, পুলিস নিয়ে গিয়ে ব্যাটাকে এক্ষুনি জেলে না ঢোকাই তো আমার নাম চন্দ্রবদন না। ব্যাটা ভেবেছেটা কী? কলকাতাটা কী মাংসের দোকান নাকি?'

'বেশি বীরত্ব দেখাস নে বদন, বেঘোরে মারা পড়বি, বোস বোস।'

বদন বলল, 'নাম কী বলেছে?'

'কী জানি ছাই, ওই টেনশনের মধ্যে 'আল কাসমি' না কী বলল তা কি মনে আছে ছাই,' হরু ঠাকুর বলল।

'আল খোয়ারিজমি,' কালাচাঁদ বলল।

'আল খোয়ারিজমি?' বদন বিস্ময়ে বলল। 'সে তো একজন প্রাচীন আরবের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ।'

'ধাড়া বলেছে এই শেখ নাকি অঙ্ক অঙ্ক করে পাগলা হয়ে গেছে। আমার তো মনে হল লোকটা বদ্ধ উন্মাদ।'

বদন বলল, 'আমাদের এক্ষুনি পুলিশে খবর দেওয়া উচিত।'

কালাচাঁদ বলল, 'পুলিশ আমার মতো চোরের কথা বিশ্বাস করবে না। আর আমি চাই না, তোমরা এর মধ্যে জড়াও, আর কটা দিন দেখা যাক। সাতদিনের আগে অন্তত কেউ আমার কোনো ক্ষতি করবে না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল পঞ্চাননমঙ্গলে এমন কী লেখা আছে যে আরবের শেখ উঠে পড়ে লেগেছে এটা পাওয়ার জন্যে?'

হরু ঠাকুর বলল, 'পদ্য দু'টো দেখা দেখি।'

কালাচাঁদ পকেট থেকে কাগজ বের করে প্রথম পদ্যটা পড়ল—

পৃথুবি যে কালী মাএর খঙ্গ দেখী ত্রস্ত।
শিবের বুকে কালীর চরণ জীহা একহ হস্ত॥
কালীর সিঁদুর, শিবের চরণ, শিবের ভালের নেত্র।
এহি তীনত ঘিরে আছে আমার সগর্গ ক্ষেত্র॥
মুণ্ডমালা কালীমাতে রক্তে রাঙ্গা খঙ্গা।
কালী-শিবের গুনে ধরায় দুঅজ ভৈল সগর্গ॥

BanglaBook.org

'এটার ছন্দ ৪/৪/৪/২,' হরু ঠাকুর বলল। 'কবিতার মানেটা খুবই সাধারণ, ভক্তি রসে ভরা,' হরু ঠাকুর কপালে হাত জোড় করে নমস্কার করে বলল। 'মা কালী ধরায় সংহার করতে করতে বাবা শিবের বুকের ওপর পা পড়তে এক হাত জিভ বের করে দাঁড়িয়ে গেছেন। মা কালীর মাথার সিঁদুর এবং শিবের মাথা থেকে পা—এই নিয়েই ভক্তের স্বর্গ। কালী ও শিবের গুণপনায় ধরণীর এই স্বর্গ আসল স্বর্গের থেকে দুগুণ পবিত্র।'

এবার বদন কাগজটা হাতে নিল। শিবের বুকে কালী পড়তে পড়তে তার বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো ঝলমল করে উঠল—'আগেরটা অ্যালজেব্রা ছিল, আর এটা পিওর জিওমেট্রি। এরিয়া অব ট্রায়াঙ্গল মানে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা লিখে রেখে গেছে। লোকটা অসাধারণ ইনটেলিজেন্ট ছিল।'

'এখানেও অঙ্ক?' হরু ঠাকুর জিজ্ঞাসা করল।

'অফ কোর্স। মা কালীর সিঁথির সিঁদুর, শিবের চরণ, আর শিবের কপালের চোখ—এই তিনটে বিন্দুকে কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করলে একটা ত্রিভুজ পাওয়া যায়। সেই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলকে কবি তার স্বর্গক্ষেত্র বলছেন। আমরা জানি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হল হাফ ভূমি ইনটু উচ্চতা। শিব ভূমিতে শুয়ে আর মা কালী তার বুকে দাঁড়িয়ে। অর্ধেক শিবের লম্বাকে যদি মা কালীর উচ্চতা দিয়ে গুণ করি তবে পাওয়া যায় ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল। তার মানে শিবের লম্বাকে মা কালীর উচ্চতা দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল-এর দ্বিগুণ অর্থাৎ স্বর্গ ক্ষেত্রের দ্বিগুণ লাভ হয়। একে পিওর জিওমেট্রি ছাড়া আর কী বলবে? জন্মে পদ্যে এরকম অঙ্ক দেখিনি।'

হরু ঠাকুর বলল, 'হ্যাঁরে বদন, এগুলো শুভঙ্করের আর্যা নয়তো? সেই যে ছোটোবেলায় পাঠশালায় পণ্ডিতমশাই মুখস্থ করাতেন—

তঙ্কা প্রতি মোন যার হইবেক দর।
তঙ্কা প্রতি অষ্টগন্ডা সের প্রতি ধর।'

বদন বলল, 'মামা, আমি শুভঙ্করের আর্যার আগাপাস্তালা পড়েছি, শুভঙ্করের আর্যাগুলো লেখা হয়েছিল টুলো পণ্ডিতদের জন্য। পাঠশালায় পণ্ডিতমশাই সুর করে করে বলতেন আর ছাত্ররা সুর করে করে মুখস্থ করত। কিন্তু শুভঙ্করের আর্যায় আর্যভট মুখস্থ করানো হত না।'

'এটাও আর্যভট্ট?' হরু ঠাকুর বলল।

'হ্যাঁ, গণিতপাদে আর্যভট বলেছেন—

ত্রিভুজস্য ফলাশরীরম সমদলকোটি ভুজার্ধ্বসমবর্গহ।

শুভঙ্করের আর্যাগুলো পড়ে আমার মনে একটা খটকা ছিল যে প্রাচীন

বাংলায় কেন আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য এদের মতো বুদ্ধিদীপ্ত অঙ্কের পুঁথি দেখা যায় না। বাঙালির অঙ্ক চর্চা শুধু শুভঙ্করের আর্যায় সীমিত এটা মানতে মন চাইত না। পঞ্চাননমঙ্গলের এই পদ্যগুলো দেখার পর আমার প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে। যা হোক চলো পরেরটা পড়ি।'

পরের পদ্যটা পড়তে পড়তে বদনের চোখ প্রথমে সঙ্কুচিত হল, তারপর চোখদুটি বিস্ফারিত হতে শুরু করল—'ফ্যান্টাস্টিক,' বদন কাগজটার দিকে চেয়ে বলল। তারপর জোরে জোরে পদ্যটা পড়তে লাগল—

নাহি তবেঁহো আছহ আহ্মে সহ্মে জানি।
দেব তুহ্মি নিরাকার আন্তরে মানি॥
অব্যয় অক্ষয় দেব সদা শিব মুক্ত।
মায়া মোহ সংসারত হৈবেঁ নাহি যুক্ত॥
জড়ের হনন করী দিলেঁ নিজ থান।
থান পরিহরি বামে দশগুণ দান॥

—এ তো দর্শনের কথা,' বদন হরু ঠাকুরের দিকে চেয়ে বলল।

হরু ঠাকুর বলল, 'এটাতে অঙ্ক নেই তাই একটু সোজা সোজা লাগছে। দর্শনই বটে। ঈশ্বর নিরাকার আমাদের কাছে অধরা, শুধু তাঁর উপস্থিতি আমরা অনুভব করতে পারি। প্রভু শিব অব্যয়—তাঁর কোনো ব্যয় নেই, কোনো ক্ষয় নেই, তিনি মায়ার সংসারের বাইরে থাকেন, জড় মানে জীবন শেষ হলে নিজের চরণে স্থান দেন।'

'আর শেষ লাইনটার মানে?' বদন বলল।

মাথা চুলকাল হরু ঠাকুর—'থান পরিহরি বামে দশগুণ দান—এটার মানেটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'এই একটা কথাই তো পৃথিবীর অগ্রগতির স্পিড হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল,' বদন বলল।

কালাচাঁদ না বুঝে বোকার মতো তাকিয়ে রইল।

'এটাই আধুনিক ডেসিমাল বা দশমিক সিস্টেমের দর্শন। ৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে আর্যভট লিখেছিলেন "স্থানাৎ স্থানম্ দশগুনম্ স্যাৎ" অর্থাৎ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গেলে আগের থেকে দশগুণ হয়। এই শিববন্দনার আড়ালে শূন্যের কথা বলা হয়েছে। দশমিক পদ্ধতি আর্যভটের এক মোক্ষম আবিষ্কার, আর ব্রহ্মগুপ্ত প্রথম শূন্যের যোগ-বিয়োগের সূত্র লেখেন। এখানে মাত্র ছ'টা লাইন দু'জনের সূত্রের সারকথা ধরে রাখা আছে।

চমৎকার—

BanglaBook.org

নাহি তবেঁহো আছহ আন্মে সন্মে জানি।
দেব তুহ্মি নিরাকার আন্তরে মানি।।

শূন্য নিরাকার, তাকে আমরা দেখতে পাই না, আমাদের বুদ্ধিতে এর অস্তিত্ব।

অব্যয় অক্ষয় দেব সদা শিব মুক্ত।
মায়া মোহ সংসারত হৈবেঁ নাহি যুক্ত।।

কারোর সঙ্গে শূন্য যোগ করালে যোগফল বাড়ে না। শূন্যের ক্ষয় নেই।

জড়ের হনন করী দিলেঁ নিজ থান

হনন মানে গুণ করা। শূন্যের সঙ্গে কিছু গুণ করলে শূন্যই পাওয়া যায়। আর তারপর আর্যভটের সেই বিখ্যাত লাইন—স্থানাৎ স্থানম্ দশগুণম্ স্যাৎ—অর্থাৎ, থান পরিহরি বামে দশগুণ দান। একঘর বামে সরিয়ে খালি ঘরে শূন্য বসালে সংখ্যা দশগুণ হয়ে যায়। যেমন—,' বদন একটা কাগজে লিখে দেখাল—

শতক	দশক	একক		
		৫	=	পাঁচ
	৫	০	=	পাঁচ এর দশগুণ (পঞ্চাশ)
৫	০	০	=	পঞ্চাশ এর দশগুণ (পাঁচশ)

কালাচাঁদের মাথা বনবন করে ঘুরতে লাগল। মনে মনে ভগবানকে কাতর কণ্ঠে বলল—হে বাবা পঞ্চানন, একদিকে আরবের খুনি আর অন্যদিকে এই জটিল আর্যভট আর আর্যভট্ট, মাঝখানে এ কোথায় ফাঁসালে আমাকে বাবা? কালাচাঁদ বলল—'বাড়ি যাই, আজ বড়ো ধকল গেছে।' দরজার কাছে গিয়ে কালাচাঁদের কিছু মনে পড়ল। সে ফিরে দাঁড়িয়ে বড়ো কাগজের ঠোঙাটা বদনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এতে দু'লাখ আছে, তোমার কারখানার জমির অ্যাডভান্সটা হয়ে যাবে। এত ভালো জমিটা হাতছাড়া করা উচিত হবে না। বাকিটাও ঠিক জোগাড় করা যাবে।'

বদন হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'ধরো ধরো ঠোঙাটা, এটা তো অন্তত আমার চুরি করা টাকা না, এটা নিলে কোনো পাপ হবে না। বাঙালির ছেলে ব্যবসা করবে এটা কত গর্বের কথা। আরে নাও, নাও এটা।'

বদন বলল, 'আমি এটা নিতে পারব না।'

'আরে ধর এটা, মনে কর ধার নিচ্ছ, পরে সুবিধামতো শোধ করে দিও। আর সাতদিনে পঞ্চাননমঙ্গল যদি না জোগাড় করতে পারি তবে তো ওই ধার তোমায় আর শোধ করতে হবে না।' কালাচাঁদ বদনের হাতে জোর করে ঠোঙাটা গুঁজে বেরিয়ে গেল। বদন হতভম্বের মতো কালাচাঁদের প্রস্থানপথের দিকে চেয়ে রইল।

। দশ ।।

কালাচাঁদ চোরের কাছে পাঁচমুড়োর ধ্বসে পড়া জমিদারবাড়ি এক লুকোনো রত্নভাণ্ডার। আজকাল সারাটা দিন মনটা তার পাঁচমুড়োতেই ঘোরাফেরা করে চলেছে।

পরদিন বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ পাঁচমুড়োর জমিদারবাড়ির বৈঠকখানায় ঢুকে কালাচাঁদ দেওয়ালের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত টানানো ধুলো-মাকড়শার জালে ঢাকা সদানন্দের পূর্বপুরুষের বিশাল বিশাল অয়েল পেন্টিংগুলোর দিকে তাকিয়ে টপাটপ প্রণাম করতে আরম্ভ করল। সদানন্দ ভটচাজ অবাক চোখে দেখতে লাগলেন কালাচাঁদকে, তারপর কালাচাঁদের প্রণাম পর্ব শেষ হলে সদানন্দ বললেন, 'কী ব্যাপার বলতো? প্রণাম করার এত হিড়িক?'

'আপনার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কি অঙ্কে সুপণ্ডিত ছিলেন?'

সদানন্দ ভটচাজ ঘাড় ঘুরিয়ে দেওয়ালের ছবিগুলোকে একবার ভালো ভাবে দেখলেন, তারপর বললেন, 'এইসব মুখশ্রী দেখে এদের একটাকেও অঙ্কে সুপণ্ডিত বলে মনে হয়? অঙ্কে সুপণ্ডিত দেখতে হবে চুল উসকোখুসকো, চোখে চশমা, একটু অন্যমনস্ক পাগল পাগল ভাব—এ সব কটাকে দেখে তো আমার ক্যারেকটারলেস ডাকাত মনে হয়। ইনি আমার ঠাকুর্দার বাপ, এর ভয়ে গ্রামের মেয়েরা কলসি নিয়ে পুকুরে জল পর্যন্ত আনতে যেত না, আর ইনি তার সুযোগ্য পিতৃদেব, লেঠেল পাঠিয়ে নাকি—' বিরক্তিতে মাথা নাড়লেন সদানন্দ ভটচাজ। 'নাঃ, ফ্যামিলির কেচ্ছা বলা উচিত না। এনারা কীভাবে সুপণ্ডিত হবে বাবা? রাজা গণেশ আমার পূর্বপুরুষ প্রতাপচন্দ্রের কর্মে নাকি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বল্লাল গ্রামের জমিদারি উপহার দিয়েছিলেন। প্রতাপচন্দ্র শুনেছি খুব ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু তার বংশধররা প্রায় সকলেই, মানে আপটু আমার বাপ, ক্যারেকটারে এমন গাঁদাল পাতা মাখিয়ে রেখেছিলেন যে তার দুর্গন্ধ দূরদূরান্তের গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। কালা, ভালো করে দেখ, সব কটাকেই ডাকাতের মতো লাগে দেখতে। অঙ্কে আর আমি এমনি এমনি—' সদানন্দ থামলেন, তারপর বললেন, 'ব্যাপারটা কী বল তো? হঠাৎ তোর অঙ্কে সুপণ্ডিতের কথা মনে হল কেন?'

কালাচাঁদ বলল, 'কাল যে দুটো পদ্য নিয়ে গেলাম, বাড়িতে গিয়ে পড়ে তো আমি অবাক। ওরকম অঙ্কের পদ্য লিখতে বিশাল পারদর্শিতা লাগে।'

সদানন্দ বললেন, 'এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল। এই না হলে আর কলিকাল, কালা অঙ্কের মাস্টার হয়ে লেকচার ঝাড়ছে। আমি আশায় আছি যে পঞ্চাননমঙ্গলের কোনো সন্ধান থাকবে এই শিলালিপির কোনো একটাতে, তা না—'

কালাচাঁদ অবিচল কণ্ঠে বলল, 'একটা পদ্যে জ্যামিতি, আরেকটাতে শূন্যের

দর্শন। জড়ের হনন করে দাও নিজ স্থান, থান পরিহরিবামে দশগুণ দান। আর্যভট্ট একই কথা সংস্কৃতে বলেছেন—স্থানাৎ স্থানম'—

'চোপ, এই বাড়িতে আরেকবার আর্যভট্টের নাম করলে ওই কঙ্কালটার পাথরে তোকে বেঁধে চয়নবিলের জলে ছেড়ে দেব। জলের তলায় গিয়ে যত খুশি আর্যভট্ট আওড়াস।'

'ঠিক আছে আপনি রাগ করলে না হয় অঙ্কের নামই নেব না এ বাড়িতে, কিন্তু ছন্দ? আহা—কোথাও তোটক, তো কোথাও তূণক। কঙ্কালের পাথরে লেখা পদ্যটা যে তূণক সেটা কী ধরতে পেরেছেন কর্তামশাই? আমার কিন্তু নজর এড়াতে পারেনি?' একটু লাজুক মুখে কালাচাঁদ বলল। লঘু-গুরুর চালটা অনেকটা এরকম—

ধিন্ তা-ধিন্ তা / ধিন্ তা-ধিন্ তা / ধিন্ তা-ধিন্ তা / ধিন্ তা-ধিন্ তা

কালাচাঁদ হরু ঠাকুরের মতো সুর করে বলল। 'এটা এরকমভাবে পড়তে হবে—

ছান্ দে-অং কে / পোখ্ খি-পং খো / বান্ ধে-কাব্ বো / নন্ দী ধন্'

'এবার মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাব,' সদানন্দ ডান হাতে নিজের মাথার চুল টেনে ধরে আর্তনাদ করে উঠলেন। 'কাজের বেলা অষ্টরম্ভা, বাবু নাচের মাস্টারের মতো ধিন্ তা-ধিন্ তা করতে এসেছেন। পঞ্চাননমঙ্গলটা কোথায় পাব সেটা না বলতে পারলে আর এই জমিদার বাড়িতে আসবি না।'

'ঠিক আছে কর্তামশাই, যেমন আপনার হুকুম,' কালাচাঁদ বাধ্য ছেলের মতো বলল। 'সাত দিনের মধ্যে যদি আপনাকে পঞ্চাননমঙ্গল না এনে দিতে পারি তবে আপনাকে আমি আর মুখ দেখাব না।'

'সাত দিনের মধ্যে এনে দিবি! বলিস কি?' সদানন্দ বিস্মিত।

তাছাড়া উপায়ও তো নেই, কালাচাঁদ ভাবল। 'তবে এক শর্তে—'

'বল কী শর্ত?'

'একটা দু'টো করে পাথর জলের থেকে তুললে চলবে না,' কালাচাঁদ বলল। 'বাগদিদের লাগিয়ে জলের নীচে যত পাথর আছে, সব কাল তুলে, সাফ করিয়ে পলাশডাঙ্গার মাঠে সাজিয়ে রাখুন, কাল সকালে দু'জন বিশ্বস্ত লোক নিয়ে আসব। কাল সব কটা পাথর পড়ে দেখব কী লেখা আছে।'

সদানন্দ বললেন, 'রাজি।'

কালাচাঁদ বলল, 'ধাড়া সাহেব বাজিতপুরে গেলেন কেন?'

'পণ্ডিত মানুষ, আজ জাপান তো কাল কেরালা তো পরশু প্যারিস—পায়ের তলায় সরষে।'

'কিন্তু বাজিতপুর কেন? কী আছে ওখানে?' কালাচাঁদ বলল।

কালাচাঁদের কথা শুনে যেন আঁতকে উঠলেন সদানন্দ ভটচাজ। 'আমাকে

BanglaBook.org

বলেছিস বলেছিস, ভাগ্যিস ডক্টর ধাড়ার সামনে কথাটা বলিস নি। উনি খুব কষ্ট পেতেন। একদম গো-মুখ্যু না হলে এরকম কথা কেউ বলে? কবিতিলক বিদ্যাপতি আর কবি চণ্ডীদাস এদের নিয়েই তো প্রাচীন বাংলা আর ব্রজবুলির সব কাব্য। বিদ্যাপতি মিথিলায় শিব সিংহের দরবারে সভাকবি ছিলেন। কথিত আছে উনি যখন বুঝলেন যে ওনার শেষ সময় প্রায় আগত তখন উনি স্বগ্রাম থেকে রওনা দিলেন গঙ্গাতীরের দিকে, তাঁর ইচ্ছে গঙ্গাতীরেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়ুক। যখন গঙ্গাতীরে পৌঁছোবার আর মাত্র দুই ক্রোশ পথ বাকি তখন ওনার শরীর এত অবসন্ন হয়ে পড়ল যে তিনি আর এক পাও চলতে পারলেন না। তখন বিদ্যাপতি কাতরকণ্ঠে বললেন—মা তোকে দেখার জন্য এত কষ্ট করলাম, মৃত্যুর সময় কি তোর দেখা পাব না। কথিত আছে সেই রাতে মা গঙ্গা স্বয়ং সেই গ্রামে এগিয়ে এসে তাঁকে দেখা দেন।'

'স্বপ্নে?' কালাচাঁদ বুঝল না আর কী ভাবে গঙ্গানদী এগিয়ে এসে তাকে দেখা দেবেন।

'সে রাতে গঙ্গায় বান আসে এবং মা গঙ্গা তিন ধারায় ভাগ হয়ে যান। একধারা বিদ্যাপতির কাছে এসে পৌঁছয় এবং সেখানে বিদ্যাপতির মৃত্যু হয়। সেই গ্রামের নাম বাজিতপুর বিহারের দারভাঙ্গা জেলায়। তারপর যেখানে তাঁর চিতা জ্বালানো হয় সেখানে নাকি মাটি ফুঁড়ে এক শিবলিঙ্গ বেরিয়ে আসে। ...বিদ্যাপতির একটা পুঁথির খবর উনি পেয়েছেন সেটা উনি কিনবেন। সত্যি উনি আমাদের বাংলার গর্ব।'

'এখন আসি,' কালাচাঁদ বেরিয়ে এল। আজ শহরে অনেকগুলো দরকারি কাজ সারতে হবে। তার আগে কাঁচাপাকা চুলের নায়েবের সঙ্গে দেখা করতে হবে। কালাচাঁদ হনহন করে চয়নবিলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে কোমরে বিলাতি হুইস্কির পাঁইটটা স্পর্শ করল। যে পূজায় যে মন্ত্র, লোকটা সেদিন যখন খালে ময়ূরপঙ্খি চালাবার কাব্য করছিল তখন তার মুখের মদের গন্ধ কালাচাঁদের প্রখর ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে এড়িয়ে যেতে পারেনি। তাড়াতাড়ি পা চালাল কালাচাঁদ। সময়ের এখন খুব দাম।

।। এগারো ।।

রাতের বেলা হরু ঠাকুরের ঘরের জানলায় রাস্তা থেকে উঁকি মেরে কালাচাঁদ দেখল হরু ঠাকুর একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে তক্তপোশে বসে ভাঙ্গের নেশায় বুঁদ হয়ে ঝিমোচ্ছে।

'হরু ঠাকুর,' কালাচাঁদ ডাকল।

'উঁ,'

'খাওয়া হয়ে গেছে?'

'নারে, কিছু বলবি?'

'একটা প্রশ্ন ছিল,' কালাচাঁদ ইতস্তত করে বলল।

'ভিতরে আয়।'

কালাচাঁদ ভিতরে ঢুকল।

'এই যে পঞ্চাননমঙ্গল নিয়ে এত মাতামাতি, এই পঞ্চানন বাবা কে গো?'

'পাঁচ মাথা শিব।'

'এই পাঁচমাথা শিবের পঞ্চাননমঙ্গল কাব্য কে লিখেছিল গো?'

'ভারতচন্দ্র।'

'সব্বোনাশ! ভারতচন্দ্র তো লিখল অন্নদামঙ্গল। ভাঙের নেশায় আবার গোলাচ্ছ?' জিভের ডগা দিয়ে ভাঙা দাঁত স্পর্শ করল কালাচাঁদ।

'ওঃ হো, ঠিক বলেছিস।' ঢুলুঢুলু ঘোলাটে চোখে বলল হরু ঠাকুর। 'পঞ্চাননমঙ্গলটা কে যেন লিখল? ঠিক মনে পরছে না রে।'

'আচ্ছা শিবের পাঁচ মুখ দেখতে কেমন গো?'

'বাবার চারমুখ চারদিকে আর পঞ্চম মুখ আকাশের দিকে তাকিয়ে।'

'আকাশের দিকে তাকিয়ে কেন?'

'পবিত্রতা আর আত্মার উন্নতির জন্য।'

'অঃ,' কালাচাঁদ বুঝল না আত্মার উন্নতির জন্য আকাশের দিকে তাকাতে হবে কেন। 'পাঁচ মুখ কেন হল গো?'

'বাবাই জানে কেন,' হরু ঠাকুর বলল। 'দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে বাবার 'অঘোরা' রূপ অঞ্জনবর্ণ। ছোটোবেলায় পঞ্চাননতলার মন্দিরে মা-র সঙ্গে যেতাম, ওই মুখটা দেখলে ভয় লাগে—সে রূপ হল ধ্বংসের রূপ, বাবা শ্মশানের মালিক, শুধু সৃষ্টিকে গিলে খাচ্ছে যাতে অন্য সৃষ্টির জায়গা হয়,' হরু ঠাকুর যেন বলতে বলতে শিউরে উঠল।

'বাবা ধ্বংস করলে সৃষ্টি করবে কে?'

'কে আবার, বাবা নিজেই সৃষ্টি করবে,' হরু ঠাকুর বলল। 'আকাশের দিকে তাকিয়ে বাবার যে শুক্লবর্ণ রূপ তাঁর নাম ঈশান। সেইরূপে বাবা সর্বত্র বিরাজমান এবং তিনি সর্বজ্ঞানী চির শাশ্বত শিব। তিনিই সৃষ্টির কারণ।'

'বাকি তিন মুখ?'

'পূব দিকে তাকিয়ে বিদ্যুৎবর্ণ 'তৎপুরুষ'—ধ্যান ও জ্ঞানের প্রতীক, উত্তরে তাকিয়ে বাবা 'বামদেব'—কুঙ্কুমবর্ণ সদালাবণ্যময় রূপ, মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য আরোগ্য করেন, পশ্চিমে তাকিয়ে বাবার কর্পূর—ইন্দুবর্ণ 'রুদ্র' রূপ—ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি সংহার করেন আবার প্রসন্ন হয়ে রক্ষা করেন।'

BanglaBook.org

'তুমি এত জানলে কী ভাবে হরু ঠাকুর?'

'আমাদের ছোটোবেলায় কত ধর্মকথা পড়ানো হত—কত লোকাচার—কত দেবতা—মা শীতলার দয়া হলে বসন্তের গুটিতে গ্রামকে গ্রাম আক্রান্ত হত, তাই গাধায় উপবিষ্টা মাকে প্রসন্ন রাখো, বসন্তকালে তার পুজো। শ্রাবণে নাগপঞ্চমীতে মা মনসার ব্রতকথা যাতে সর্প দংশনে রক্ষা পাওয়া যায়, তারপর ওলাইচণ্ডীমাতার পুজো যাতে ওলাওঠা থেকে সকলে রক্ষা পায়, বাবা বড়কাছারীর পুজো, জষ্ঠি মাসের অমাবস্যায় শনিঠাকুরের পুজো, বাবা সত্যনারায়ণের পাঁচালি, হরির লুটের বাতাসা, লেবু পাতা মেখে কলাপাতায় শিন্নি। ছোটোবেলা বাবা পঞ্চাননের মন্দিরে মেলা লাগতো, চরকের ঝাঁপ হত, বাঁশের মাচা থেকে এক লাফে নীচে কাঁটার বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ত হটযোগী ভক্তরা, জিভে ছুঁচাল লোহা ঢুকিয়ে তাণ্ডব নাচতো। কত মাহাত্ম্য নিজের চোখে দেখেছি। এখন ঠিক মনে পড়ছে না।'

'হরু ঠাকুর...?'

'উঁ!'

'মঙ্গলকাব্য লেখা কি খুব কঠিন?'

'কেন বল তো?'

'না, এমনি বলছি।'

'না না কঠিন আর কি, ছন্দের ভিতর ঠাকুরের মহিমা ঢেলে দিলেই হয়। প্রথমে গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সূর্য, শিব এদের বন্দনা—তারপর একটা কাব্যের আধারে ঠাকুরের মহিমা বোঝাতে হবে—ধনপতি সওদাগর, বেহুলা লখিন্দর এইসব—কখনও লঘু ত্রিপদী, কখনও দীর্ঘ ত্রিপদী এগুলোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পয়ারের মধ্যে দাও ঢেলে।'

'তুমি তো ছন্দের মাস্টার।'

'বলছিস?'

'সবাই তো তাই বলে,' কালাচাঁদ বলল। 'ওই যে চণ্ডীদাস যা নামিয়েছ, চণ্ডীদাস যদি বেঁচে থাকতেন তবে আদর করে তোমার গাল টিপে দিতেন।'

'ফাজলামো হচ্ছে?'

'মা-র দিব্যি।'

হরু ঠাকুর চুপ। নেশা বেশ বেড়ে গেছে।

'আর, তোমার ওই পুরোনো ধাঁচের হাতের লেখা দেখে একদম মনে হয় আসল পুঁথি, এ সব কোথা থেকে শিখলে গো?'

হরু ঠাকুর চুপ।

'গোপন কথা হলে বলার দরকার নেই।'

BanglaBook.org

'না না, তেমন কিছু ঢাক ঢোল পিটিয়ে বলার মতো কিছু না। অল্প বয়সে এশিয়াটিক সোসাইটিতে নকলনবিশের কাজে ঢুকি। স্বাধীনতার ঠিক আগে, বাংলায় পুঁথি উদ্ধারের কাজ তখন জোর কদমে চলছে। এশিয়াটিক সোসাইটিতে কখনও কখনও এমন সব পুঁথি আসত যে হাতে ধরলে তালপাতা ঝুরঝুর করে ভেঙে যেত। সে যুগে তো আর এসব জেরক্স মেশিন ছিল না, টাইপরাইটার ছিল, কিন্তু ইংরেজি। সেই সব পুঁথির ভাঙাচোরা পাতার হাতের লেখা মিলিয়ে নকল করাই আমার চাকরি ছিল। তাই রাতের পর রাত জেগে ঝুরো ঝুরো পাতাগুলো নকল করে কত পুরোনো বাংলা কাব্য বাঁচিয়েছি। এসব লিখতে লিখতে হাতের লেখাটাও পুরোনো দিনের মতো হয়ে গেছে।' হরু ঠাকুর ঢুলতে লাগল।

কালাচাঁদ বুঝল কথাটা পাড়া দরকার, এরপর হরু ঠাকুর ঘুমিয়ে পড়বে।

'হরু ঠাকুর?'

'উঁ!'

'তুমি চেষ্টা করলে একটা পঞ্চাননমঙ্গল কাব্য লিখে দিতে পারবে না?'

হরু ঠাকুরের চোখ যেন ঘোলাটে গঙ্গায় সূর্যোদয়ের লাল সূর্য হয়ে লাফিয়ে উপরে উঠল।

'পঞ্চাননমঙ্গল।'

'হ্যাঁ, আরেকটা পঞ্চাননমঙ্গল, তুমি তো ছন্দে এক্সপার্ট।'

'তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে রে কালা, মঙ্গলকাব্যে একটা গল্প দরকার হয়। গল্প কে সাপ্লাই দেবে, তুই? আর পঞ্চাননমঙ্গল হল ছন্দ আর অঙ্কের আলুপোস্ত। আলু আর পোস্ত মাখামাখি হয়ে এক হয়ে গেছে কাব্যে। আমি তো অঙ্কের কিছুই বুঝি না। অঙ্কগুলো কে লিখবে?'

'বদন,' কালাচাঁদ বলল। 'বদন তো চীনাবাদামের খোসা ছাড়ানোর মতো অনায়াসে কঠিন কঠিন অঙ্কগুলোকে বাইরে বের করে আনল।'

কালাচাঁদের গলায় এমন এক আত্মপ্রত্যয়ের সুর ছিল যে হরু ঠাকুর দু'বার চোখ পিটপিট করে তাকালো তার দিকে, তারপর বলল, 'ছান্দে অঙ্কে পক্ষী পঙ্খ—ছন্দ আর অঙ্ক যেন পক্ষীর ডানা। আগে ছন্দে লিখে তারপর অঙ্ক ঢোকাতে গেলে কিংবা আগে অঙ্ক কষে তারপর তাতে ছন্দ বসিয়ে এ লেখা সম্ভব নয়। এক সঙ্গে দু'টো ডানার ঝাপটা চাই উড়তে গেলে। তার ওপর আবার শিববন্দনা, এ যার তার কাজ নয় রে কালা, না হলে কবে লোকে লিখে দিত।'

হরু ঠাকুর ঢুলতে লাগল।

'একটু দেখ না চেষ্টা করে,' কালাচাঁদ মিনমিন করে বলল। 'তোমরা দু'জনে

BanglaBook.org

মিলে কিছু একটা খাড়া করে পুরোনো তুলট-ফুলটে লিখে আমায় দাও, আমি বাকিটা ম্যানেজ করে নেব।'

'তুই!' হরু ঠাকুরের চোখ কপালে। 'মরে গেলেও তোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোনো কাজ আমি করব না। তুই পেটে কোনো কথা রাখতে পারিস না। অন্নদামঙ্গল বগলে নিয়ে ছুটে পালিয়ে আসতে গিয়ে সিঁড়িতে পিছলে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লি, তারপর জ্ঞান আসতেই "হরু ঠাকুর হরু ঠাকুর" বলে কাতরাতে শুরু করলি? আর দারোগা আমার বাড়িতে পুলিশ পাঠাল। মরে গেলেও তোর সঙ্গে কাজ করব না।'

'বালাই ষাট, তুমি মরবে কেন?' কালাচাঁদ রাগ চেপে রেখে বলল। 'মরব তো আমি। আর ছয়দিনের মধ্যে পঞ্চাননমঙ্গল না এনে দিতে পারলে ওই বদমাশ শেখ আমার বুকে ভোজালি বসাবে।'

কথাটা শুনেই যেন হরু ঠাকুরের নেশা কেটে গেল। তড়াক করে উঠে বসে খ্যাসখ্যাস করে মাথা চুলকাল, তারপর একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, 'একটা দিন কেটে গেল। আর মাত্র ছ'দিন আছে। কিছু ভেবেছিস?'

কালাচাঁদ বলল, 'মাথায় কিছু আসছে না, হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি সারাদিন।'

হরু ঠাকুর বলল, 'বদনের সঙ্গে আজ সারাটা দিন কেটে গেল ওর জমির অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে কোর্টে উকিলের কাছে গিয়ে স্ট্যাম্প পেপারে সই-সবুদ করতে। আমি সাক্ষীর সই করলাম। বদনের মাথাটা খুব খেলে, ও বলল মামা পঞ্চাননমঙ্গলে এমনকী আছে যার জন্যে আরবের এই খুনিগুলো ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমাদের সেটা খুঁজে বের করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি।'

'আমাদের?'

হরু ঠাকুর বলল, 'বদন ছেলেটা ভালো বুঝলি, শুধু একটু গোঁয়ার আর রগচটা। ও বলেছে আমাদের কোনো ক্ষতি ও হতে দেবে না। তোকে বলেছে তৈরি থাকতে, কাল সকালে পাঁচমুড়ো গিয়ে একবার চেষ্টা করা যাক, বাকিটা ভগবানের হাত।'

।। বারো ।।

বৈঠকখানায় দাঁড় করানো কাঁচ ভাঙা, পালিশ ওঠা বুড়ো ঘড়িটার ঘণ্টা বুকে শ্লেষ্মা জমা হাঁপানি রুগির মতো ফ্যাসফ্যাস করে দশ বার কাশলো। সদানন্দ ভটচাজ লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে রঙ চটে প্রায় মুছে যাওয়া এক বিশাল অয়েল পেন্টিং-এর দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করছিলেন ; এমন সময় হাতে একটা চটের বাজারের ব্যাগ নিয়ে কালাচাঁদ চোর দু'জন সাগরেদ নিয়ে বৈঠকখানার দরজায় উপস্থিত হল।

BanglaBook.org

'কী ভক্তি! নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না,' হরু ঠাকুর গদগদ ভাবে বলল। 'উনি নিশ্চয়ই একশো আটবার পিতৃপুরুষের নাম না জপে সকালে দাঁতে কিছু কাটেন না।'

সদানন্দ ভটচাজ পিছন ফিরে তিন মূর্তির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এরা কারা রে কালা? তোর পেশার লোকজন বুঝি?'

কালাচাঁদ দু'কানের লতি আঙুল দিয়ে ধরে বলল, 'এরা আমায় পাথর পড়তে সাহায্য করবে। জলের তলা থেকে পাথরগুলো তুলে এক জায়গায়—'

'কাল বড়ো মেহনত গেছে ওই পাথর তোলাতে, অত সাবধানের কাজ কী আর গাঁয়ের ছেলে ছোকরাদের দিয়ে হয়? দিয়েছে কিছু পাথর ভেঙে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পলাশডাঙার মাঠে সব সাজিয়ে রাখিয়েছি। এনারা পাথর পড়বে? ঠিক পারবে তো?'

'আপনি কোনো চিন্তা করবেন না কর্তামশাই,' কালাচাঁদ বলল। 'ইনি খুব এক্সপার্ট। ইনি হলেন ইয়ে—মানে হরুচন্দ্র ঠাকুরতা, আর এ হল হরু ঠাকুরের ভাগ্নে বদন।'

'ভাগ্নে বদন?' সদানন্দ বিস্ময়ে বলল। ''ভাগ্নে মদন'' পড়েছিলাম কুমোরপাড়ার গোরুর গাড়িতে, ''ভাগ্নে বদন'' এই প্রথম শুনলাম।'

'আজ্ঞে, এ চন্দ্রবদন,' হরু ঠাকুর বলল। 'ইশকুলে বন্ধুরা চাঁদবদন বলে খ্যাপাতো, তাই ও নিজেই নাম থেকে চাঁদটা ছেঁটে দিয়েছে।'

'তা বেশ করেছে, নচেৎ বামে কালাচাঁদ, মধ্যে হারুচন্দ্র, ভাগ্নে বদন যদি চাঁদ জোড়ে তাহলে তো এই ক্যাটক্যাটে সকালে আমার বাড়িতে চাঁদের হাট বসে যাবে। তা হারুবাবুর কী করা হয়?'

'ইনি কবি, হারু না হরু,' কালাচাঁদ বলল।

'কবি? বাঃ, কিন্তু আপনার লেখা ম্যাগাজিন-ট্যাগাজিনে পড়েছি বলে মনে পড়ছে না।'

'বাঃ, পরশুই তো চণ্ডীদাসের পুঁথিতে রাধিকার ত্রিপদীটা যে পড়লেন। ওটা তো—'

'ওটা তো?' সদানন্দ ভুরু কুঁচকালেন।

কালাচাঁদ মনে মনে জিভ কাটল, হরু ঠাকুর সাধে গালাগাল করে বলে কালার পেটে কোনো কথা থাকে না। 'ওটা তো হরু ঠাকুরের ঘরানায় লেখা পদ্য,' কালাচাঁদ হাঁফ ছাড়ল।

'ক্লাসিক্যাল গান-বাজনায় ঘরানা শুনেছি, পদ্যেও ঘরানা? এই প্রথম শুনলাম,' সদানন্দ বললেন। 'তা আপনার ঘরানাটি কেমন?'

'ঐতিহাসিক কাব্য লিখি আমি।'

'ঐতিহাসিক কাব্য?' সদানন্দ বললেন। 'তাহলে নিশ্চয়ই প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়।'

BanglaBook.org

'কই না তো।' হরু ঠাকুরের কথা শুনে কালাচাঁদের মাথায় হাত। হরু ঠাকুর বলল, 'লেখার আগে আমি ও-পাড়ায় এক চক্কর লাগিয়ে ভালো ভাবে দেখে-টেখে আসি, তারপর লিখতে বসি কাব্য।'

'ও পাড়ায়?' সদানন্দ বুঝতে পারছেন না, হরু ঠাকুর রসিকতা করছে না হেঁয়ালি করছে।'

'মানে ইতিহাসে—' হরু ঠাকুর বলল।

'বাঃ, আপনার রসবোধটা খুব সূক্ষ্ম তো। আমি তো ভাবলাম আপনার এপাড়াটা একটু ঢিলা আছে।' সদানন্দের তর্জনী নিজের মস্তকে।

হরু ঠাকুর প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'আপনার পিতৃপুরুষের নামজপের সময় উপদ্রব ঘটালাম।'

'নামজপ না হাতি,' সদানন্দ ভটচাজ বললেন। 'ইনি আমার পূর্বপুরুষ জমিদার জটামদন ভটচাজ। ইনিই যত নষ্টের গোড়া।'

'অ, আমি ভাবলাম আপনি বিড়বিড় করে—' হরু ঠাকুর বলল।

'বিড়বিড় করে গালি দিচ্ছিলাম। এনার জন্যেই আজ যত ভোগান্তি, ডুবুরি নামিয়ে পাঁক ঘেঁটে হাতের লক্ষ্মী খুঁজে বেড়াতে হচ্ছে। আরে কবিরাজ কি ভগবান? তখন কি অ্যাতো অ্যান্টিবায়োটিক-ফায়োটিক আবিষ্কার হয়েছে? ওষুধ বলতে তো তখন পাণ্ডুরোগ হলে গাঁদাল পাতা আর পেঁপে সিদ্ধ, ম্যালেরিয়া হলে সিঙ্কোনার বাকল চাঁচা ক্ষার, রক্তাল্পতা হলে থানকুনি পাতার রস আর বাড়াবাড়ি হলে লোহা শিলে ঘষে খাইয়ে দাও, হৃদরোগে রক্তকাঞ্চনের রস আর মধুমেহ হলে নিম করলার রস। হঠাৎ কোথা থেকে এল কালাজ্বর। কী ভাবে এল কে জানে? কেউ বলে কামরূপ থেকে রাজার সৈন্যরা নিয়ে এসেছিল, কেউ বলে এক ধরণের বেলে মাছির পেটে এ রোগের জীবাণু এসেছিল, মোট কথা কালাজ্বরের মহামারীতে গ্রামকে গ্রাম তখন উজাড় হয়ে যাচ্ছিল। পাঁচমুড়োতেও কালাজ্বর এল বটে কিন্তু আশ্চর্যের কথা তেমন সুবিধা করতে পারল না। গ্রামবাসীদের বাঁচিয়ে দিল পঞ্চানন মন্দিরের পুরোহিত নন্দীধন। সকলকে বলল যে, সবাই পঞ্চানন বাবার মাথায় জল ঢেলে দিনে দশবার ওই জল খেলে কালাজ্বর কাবু করতে পারবে না। গ্রামবাসীরা প্রাণের দায়ে জাত-ধর্ম নির্বিশেষে সক্কলে চোঁ চোঁ করে ঐ শিবের মাথায় জল ঢেলে খেতে লাগল। আর ভগবানের দয়ায় কালাজ্বরের কবল থেকে পাঁচমুড়ো দিব্যি বেঁচে গেল। পুরোহিত নন্দীধনকে লোকে ভগবান শিবের বাহন নন্দী বলে পুজো করতে লাগল। পঞ্চানন বাবার মাথার জল ঘটি ঘটি তখন অন্যান্য গাঁয়ে যেতে লাগল কালাজ্বরের ওষুধ হিসেবে।'

BanglaBook.org

'খুব জাগ্রত শিব ছিলেন।'

'আমি কী জানি, জাগ্রত না ঘুমন্ত—' সদানন্দ ভটচাজ গজগজ করতে লাগল।

'ওনার ডান হাতটা উপরে হাওয়ায় কেন?' বদন কথার মধ্যে কথা বলল।

'ওটা নাকি একজন প্রজাকে চাবুক মারছে তার ছবি।' সদানন্দ বললেন। 'হাতের মুঠোটাই দেখা যাচ্ছে, চাবুকের রঙ কালের সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে গেছে। এনার জন্যে পুরো জমিদারিটা লাটে উঠেছিল, পুরো পাঁচমুড়ো গাঁ উজাড় হয়ে গেছিল।'

'কেন উনি কী করেছিলেন?' বদন বলল।

'লম্পট জমিদার অচিরেই খুব খারাপ ধরণের উপদংশ বাঁধিয়ে বসলেন।' সদানন্দ বললেন।

'উপদংশ?'

'সিফিলিস,' সদানন্দ বললেন। 'খারাপ ধরনের যৌন রোগ।'

'জটামদন ধরলেন পঞ্চানন মন্দিরের পুরোহিতকে—শিবের মাথায় জল ঢেলে সেই জল খাইয়ে আমার রোগ ঠিক করে দাও। আরে শিবঠাকুর কি সব লোককে সারাবার ঠেকা নিয়ে রেখেছে? জল খেয়েও যখন কোনো কাজ হল না তখন পূজারি নন্দীধনকে খুব গালিগালাজ করলেন। পূজারি বললেন আপনার মাত্রাতিরিক্ত উশৃঙ্খল পাপের রোগ বাবা পঞ্চাননের জলে সারবে না। তখন রেগে গিয়ে উনি নন্দীধনকে বললেন তোর মেয়েকে বিয়ে না করে আমি আর কোনো নারী স্পর্শ করব না।'

'এ তো মহা কেলো!' বদন ফুট কাটল।

'এদিকে আর একটা ঘটনা ঘটল। রাজা গণেশের পুত্র যদু হলেন বাংলার রাজা—তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করার পর নাম নিলেন জালালুদ্দিন।'

'হঠাৎ হিন্দু রাজার পুত্র মুসলমান হতে যাবে?' কালাচাঁদ প্রশ্ন করল।

'এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন তিনি নাকি গণেশের এক মুসলমানী উপপত্নীর গর্ভসম্ভূত জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন, তাই তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। কেউ বলেন যে আশমানতারা নামে এক মুসলমান সুন্দরীর প্রেমে পড়েছিলেন যদু, কেউ বলেন বিখ্যাত মৌলবী নুর কুতুব উল আলমের আদেশে বিহারের অধিপতি ইব্রাহিম সাহের এক বিশাল সৈন্যবাহিনী রাজা গণেশের রাজ্য আক্রমণ করতে উদ্যত হলে রাজা গণেশ মৌলবী নুর কুতুব উল আলমকে অনুরোধ করেন এই আদেশ ফিরিয়ে নিতে। তখন মৌলবী বলেন তিনি আদেশ ফিরিয়ে নেবেন কিন্তু গণেশকে মুসলমান হতে হবে। রাজা গণেশ শত্রুর হাত থেকে বাঁচতে একটা রফা করেন যে তার পুত্র যদু মুসলমান ধর্মে দীক্ষা নেবেন। পিতার আদেশে যদু মুসলমান হলেন বটে কিন্তু হিন্দুদের

BanglaBook.org

ওপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করলেন। রাজা গণেশের সময় কিছু দিন শান্তিতে কেটেছিল হিন্দু বাঙালির জীবন, আবার অশান্তি শুরু হল। জালালুদ্দিনের সৈন্যরা হিন্দু মন্দির ভাঙতে শুরু করল, পুরোনো হিন্দু দেব-দেবতার পুঁথি খুঁজে খুঁজে পোড়াতে শুরু করল। জটামদন তখন বাংলার সুলতান জালালুদ্দিনের কানে কথাটা উঠিয়ে দিল যে এক মন্দিরের পূজারি নাকি মুসলমানদেরও শিব ঠাকুরের লিঙ্গ ধোওয়া জল খাওয়াচ্ছে। মন্দিরের পুরোহিতের নামে শমনজারি হয়ে গেল এবং আদেশ হল মন্দির ভেঙে ধুলায় মিশিয়ে দাও। কিন্তু তখন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। সুলতানের সৈন্যরা মন্দির ভাঙতে এসে মন্দিরের সামনে এসে দেখল গোটা মন্দিরটা নেই।'

'নেই মানে?' বদন প্রশ্ন করল।

'নেই মানে নেই, ভ্যানিশ,' সদানন্দ বলল। 'অত বড়ো মন্দিরটা, পাঁচ ফুট শিবের অত বড়ো মূর্তিসহ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।'

'আর পূজারি?' কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করল।

'পূজারি আর তার মেয়ে দু'জনেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। জটামদনকেও আর খুঁজে পাওয়া গেল না।'

হরু ঠাকুর 'জয় বাবা পঞ্চানন' বলে দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল।

'কিছুদিনের মধ্যে পাঁচমুড়োয় কালাজ্বর ফিরে এল, এক সপ্তাহের মধ্যে কালাজ্বর মহামারীরূপে দেখা দিল। সকলে গ্রাম ছেড়ে পালাতে লাগল। জটামদনের স্ত্রী বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে পালাল শ্রীহট্টে বাপের বাড়িতে। জটামদনের মৃতদেহ নিয়ে অনেক গপ্পো তৈরি হল। কেউ বলে ও মরেছে উপদংশ রোগে, কেউ বলে কালাজ্বরে, কেউ বলে নন্দীধন পাপের মহীরুহ উপড়ে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেছে। কোন্‌টা সঠিক তা জানিনে।'

'কর্তামশাই অনুমতি দিলে আমরা পলাশডাঙ্গার মাঠে গিয়ে পদ্যগুলো দেখে আসি?' কালাচাঁদ বলল।

'সেই ভাল।' সদানন্দ বললেন।

হরু ঠাকুর ও বদনকে নিয়ে কালাচাঁদ বেরিয়ে এল। হাতে সময় খুব কম। বাইরে এসে বদন কালাচাঁদকে বলল, 'তোমরা ঠিক শুনেছ নামটা আল খোয়ারিজমি বলেছিল?'

কালাচাঁদ বলল, 'আরবদের উচ্চারণ হালুম হুলুম করে কী বলে তা বোঝা যায় না। তবে তাই তো মনে হল, আর ধাড়া বলেছে এর নাকি পুরোনো অঙ্কের বইয়ের পুঁথি কেনার শখ।'

একটা নিষ্ঠুর খুনি অঙ্ক বই পড়ে? বদনকে চিন্তিত দেখাল।

BanglaBook.org

।। তেরো ।।

আলপথে হাঁটতে হাঁটতে চয়নবিল। এর নীচেই লুকিয়ে আছে যত রহস্য।

'এই চয়নবিল, এখান থেকেই পাথরগুলো পাওয়া গেছে,' কালাচাঁদ বলল।

'এই কচুরিপানায় ঢাকা, আধ-মজে যাওয়া, পাঁকের গন্ধে অতিষ্ট করা পুকুরটার নাম চয়নবিল।' বদন ছ্যা-ছ্যা করে উঠল। 'নামটা শুনে মনে হয় রূপকথার এক কাকচক্ষু সরোবর যার মণিকাঞ্চন ঘাটে বসে কুচবরন কন্যা জ্যোৎস্নায় জলপরীদের জলকেলি উপভোগ করে। কাব্যি করে বললে সারমেয়, এসে দেখি ঘেয়ো নেড়িকুত্তা।'

'এক সময়ে এই বিল কয়েক মাইল লম্বা ছিল—' হরু ঠাকুর বলল। 'পাহাড়ি উপনদীগুলো এই বিলের ভিতর দিয়ে বয়ে যেত। এপার ওপার দেখা যেত না। শালতিতে চড়ে গ্রামের মানুষ এপার-ওপার করত। কত যে মানুষ এই বিলের নীচে তাদের সোনা-গয়না লুকিয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই।'

'বিলের নীচে সোনা-গয়না কেন রাখতে যাবে?' বদন বলল।

'তখন তো আর এখনকার মতো ব্যাঙ্কের লকার ছিল না,' হরু ঠাকুর বলল। 'আরব, তুর্কী, মুঘল, আফগান, পাঠান—যে যখন পেরেছে আমাদের গ্রাম-শহরের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে লুঠতরাজ করেছে, ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, তখন ভয়ের চোটে লোকজন এই সব বিলের পাঁকের নীচে দামি দামি জিনিসপত্র লুকিয়ে রাখত।'

'গুল,' বদন বলল। 'তুমি কী করে জানলে?'

হরু ঠাকুর হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর বলল—

অমরসাগর আদি যত সরোবর।
খাল কাটিয়া শুকায় মোগল বর্বর॥

যুদ্ধে ত্রিপুরেশ্বর যশোহরমানিক্য মুঘলদের হাতে বন্দি হল। ঢাকার ফতেজঙ্গ নবাব যশোহরমানিক্যকে মোগল বাদশা জাহাঙ্গিরের হাতে তুলে দিল, কিন্তু তার রাজপ্রাসাদ খুঁজে কোনো ধনসম্পত্তি পাওয়া গেল না। মুঘলরা সন্দেহ করল যে ত্রিপুরেশ্বর তার সোনাদানা অমরসাগর নামক বিশাল দীঘির নীচে লুকিয়ে রেখেছেন, তাই মোগলরা খাল কেটে দীঘির জল নিঃশেষ করে ফেলল—একি। কালা তুই জামা-টামা খুলছিস কেন?'

কালাচাঁদ ততক্ষণে পটাপট জামার বোতাম খুলে খালি গা। 'এই ব্যাগটা সাবধানে রাখো তো।' কালাচাঁদ পুকুরপাড়ে পায়ের চপ্পলের ওপর জামাটা রেখে বলল। 'একবার নিজে গিয়ে জলের নীচটা দেখে আসি।'

BanglaBook.org

'সে কি রে, প্যান্ট ভিজে যাবে রে!' হরু ঠাকুর বলল।

'আবার গায়েই শুকিয়ে যাবে।' কালাচাঁদ ঝপাং করে জলে ঝাঁপ দিল।

চয়নবিলের এদিকটা অগভীর, কালাচাঁদ সাঁতার কেটে বিলের গভীর জলে পৌঁছে এক বুক শ্বাস টেনে জলে ডুব দিল। ডুব দিয়ে জলের নীচে একটু নামতেই পায়ে পাথরের টুকরোর স্পর্শ পেল কালাচাঁদ। বিলের নীচে শুধু পাথর আর পাথর। ছোটো-বড়ো-কুচি নানারকম সাইজের। কালাচাঁদ বসে হাতড়ে হাতড়ে দু'হাতে দু'টো পাথর নিয়ে দম নেবার জন্য জলের ওপর মাথা ভাসাল।

'সোনা-দানা কিছু পেলি?' হরু ঠাকুর চেঁচিয়ে বলল।

'শুধু পাথর,' কালাচাঁদ চেঁচিয়ে উত্তর দিল। তারপর পাথর দু'টোর দিকে তাকিয়ে দেখল, এগুলোও ঠিক একইরকম সেলেট পাথর যার গায়ে কবিতা লেখা ছিল। সাঁতরে বিলের পারে এল কালাচাঁদ, জল থেকে উঠে হরু ঠাকুর আর বদনের হাতে একটা করে পাথর দিয়ে বলল, 'জলের তলায় গিজগিজ করছে পাথর।'

'এগুলোতেও কিছু লেখা আছে—' হরু ঠাকুর ভাঙা পাথরের মসৃণ দিকটা দেখাল। 'এটাতে লেখা আছে "বলরাম"।'

'কত এরকম লেখা যে ভেঙেচুরে গুড়োগুড়ো হয়ে পড়ে আছে নীচে। ওগুলো চিরতরে হারিয়ে গেল,' কালাচাঁদ বলল।

'চয়নবিলকেও যদি অমরসাগরের মতো শুকিয়ে ফেলা যেত—' বদন বলল।

'আমি আরও একবার ওদিকটা দেখে আসি, যদি কিছু পাওয়া যায়।' কালাচাঁদ আবার সাঁতরে বিলের মাঝামাঝি গিয়ে ডুব লাগাল। নীচে শুধু পাথর আর পাথর। কালাচাঁদ বারবার জলের ওপর উঠে বুকের ভিতর হাওয়া টেনে আবার ডুবতে লাগল। বিলের নীচে এত পাথর এল কোথা থেকে? কালাচাঁদ ভাবতে লাগল। কিছুক্ষণ জলের ভিতর খোঁজাখুঁজি করে বিফল মনোরথ হয়ে কালাচাঁদ আবার সাঁতরে পাড়ে এল।

'বললাম কিছু নেই,' হরু ঠাকুর পাড় থেকে চেঁচিয়ে বলল। 'উঠে আয়।'

এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে কালাচাঁদ বলল, 'আরেকবার দেখে আসি।' কালাচাঁদ আবার সাঁতার কেটে দীঘির মাঝামাঝি পৌঁছে ডুব লাগাল। এ জায়গাটা গভীর। জলের নীচে মাটিতে পা মসৃণ স্পর্শ পেল, যেন পায়ের তলায় অজস্র কাঁচের গুলি। মুক্তো-টুক্তো নয়তো? কালাচাঁদের বুক ধ্বক্ করে উঠল। কালাচাঁদ হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে আঁজলা ভরে তুলল। মাটি-বালি মাখা মসৃণ জিনিসগুলি ছোটো ছোটো। পরে ফিরে এসে এ জায়গাটা পেতে মুস্কিল হতে পারে তাই কালাচাঁদ দু'পকেটে ঠেসে ঠেসে ভরল। ফুসফুসে বাতাস প্রায় শেষ, কালাচাঁদ জলের ওপর ভেসে উঠে বুক ভরে দম নিল। পাড়ে উঠেই কালাচাঁদ পকেটে

BanglaBook.org

হাত ঢোকাল। এক মুঠো ছোটো ছোটো গেঁড়ি শামুক পকেট থেকে বেরল। 'আমি পয়সা-কড়ি ভেবেছিলাম,' কালাচাঁদ মুক্তোকে কমিয়ে পয়সা-কড়ি বলল যাতে হরু ঠাকুর না খ্যাপায়। 'এ তো শুধুই গেঁড়ি শামুক।'

'এগুলো "কড়ি"। সে যুগে কড়ির চল ছিল,' হরু ঠাকুর বলল। 'তখন রাজাদের ছাপ মারা দেড় ইঞ্চি সাইজের এক ভরি ওজনের রূপোর "টঙ্কা" ছিল, আর খুচরো হিসেবে ব্যবহৃত হত সাদা সাদা সাগর পাড়ের আস্ত "কড়ি"। এই টঙ্কা কড়ি থেকেই "টাকাকড়ি" শব্দটা এসেছে। আজকাল কড়ির চল না থাকলেও "টাকাকড়ি" শব্দটা টিঁকে আছে। আগেকার দিনে এটা খুচরো পয়সার মতো ব্যবহার করা হত।'

বদন বলল, 'এক টাকায় চার সিকি / এক সিকিতে চার আনা / এক আনায় চার পাই / এই পাইতে পাঁচ গন্ডা / এক গন্ডায় চার কড়ি—তার মানে এক টাকায় বারোশো আশি কড়ি। অবশ্য এই কড়ির দাম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ছিল। সমুদ্রের কাছাকাছি কড়ির দাম কমে যেত।'

কালাচাঁদ হতাশ হয়ে বলল, 'ধুস, এর কোনো দামই নেই!'

'কড়িকে হেলাফেলা করিস না কালা,' হরু ঠাকুর বলল। 'কড়ি হল অর্থ। আজও মা লক্ষ্মীর পায়ে, ঘটে দেওয়া হয়।'

বদন বলল, 'সতেরো শতকে এক চাঁদির টাকায় পঁচিশশো থেকে চার হাজার কড়ি পাওয়া যেত। তখন কড়ির থেকে আরও অনেক ছোটো ছোটো অর্থ ছিল। শুভঙ্করের আর্যায় বলে—

কাক চতুর্থী বটেক জানি
তিন ক্রান্তি বট রাখানি
নব দন্তি করিয়া সার
সাতাশ যবে বট বিচার
আশি তিলে বটেক কর
লেখার গুরু শুভঙ্কর

তার মানে, ১ কড়ি = ৪ কাক = ৩ ক্রান্তি = ৯ দন্তি = ২৭ যব = ৮০ তিল।'

'ভগবানের টাঁকশালে তৈরি কী দারুণ টাকা, ভিজলেও নষ্ট হয় না। কিন্তু এত কড়ি কী ভাবে জলের তলায় এল?' হরু ঠাকুর বলল।

'জলের তলায় অনেক রহস্য ছিল, যা অল্প অল্প করে বাইরে আসছে। আবার খুঁজে দেখতে হবে।' ভেজা গায়ে জামা চড়িয়ে পায়ে চপ্পল গলিয়ে কালাচাঁদ বলল। 'চল পলাশডাঙার মাঠে দেখা যাক কী রাখা আছে ওখানে।'

কিছুক্ষণ হেঁটে পলাশডাঙার মাঠ দেখা গেল।

'ওই যে ওখানে কর্তামশাই পাথরগুলো সাজিয়ে রেখেছেন,' কালাচাঁদ বলল।

BanglaBook.org

পলাশডাঙ্গার মাঠের দিকে তাকিয়ে হরু ঠাকুর আঁতকে উঠল—'এ কোথায় আনলি রে-কালা, এ তো সাহেবদের কবরখানা।' হরু ঠাকুর গলার পৈতের সঙ্গে রুদ্রাক্ষের মালাটা হাতের মুঠোয় ধরল।

পলাশডাঙার মাঠে আবর্জনা, আগাছা, লতাগুল্ম পরিষ্কার করা হয়েছে, সদানন্দ ভটচাজ লোক লাগিয়ে পাথরগুলোকে একের পর এক সারি করে রেখেছে যাতে পড়তে কষ্ট না হয়।

কালাচাঁদ দেখল হরু ঠাকুর খারাপ কিছু বলেনি, সারি সারি পাথরের ফলকগুলোকে দেখতে অনেকটা কবরখানার ফলকের মতোই লাগছে।

'এগুলোতেই পদ্য আছে,' কালাচাঁদ বলল। 'ঘুরে ঘুরে লিখতে অনেক সময় লাগবে। সময় নষ্ট না করে লেগে পড়া যাক—'

'বদন, তুই বরং আগে একনজর লেখাগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নে, যদি সন্দেহজনক কিছু তোর চোখে পড়ে তবে আমাদের ডাকিস।' হরু ঠাকুর বলল।

বদন মাঠে নেমে পড়ল। প্রথম পাথরটার কাছে গিয়ে লেখাটা পড়তেই মিনিট দশেক সময় নিল, তারপর বাজখাঁই গলায় বলল, 'পিথাগোরাসের থিওরেম।' লিখতে বসে কালাচাঁদ দেখল ব্যাপারটা মোটেই সহজ কাজ নয়। বাংলা অক্ষরগুলো বড় বিদঘুটে ধরনের ছিল সে সময়। আবছা ঘষা অক্ষরে মাটি লেগে আছে, ঝেড়ে ঝেড়ে অক্ষর বুঝতেই অনেক সময় লেগে যাচ্ছে। দূর থেকে বদনের গলা ভেসে এল, 'আরিব্বাস ট্রিগনোমেট্রিও আছে দেখছি।'

গোঁড়া হিন্দু পরিবারের বাল বিধবার কাছে চিকেন রোস্ট আর মটন কাবাবের কোনো ফারাক নেই, সে-রকম কালাচাঁদের কাছে যাহা পিথাগোরাস তাহাই ট্রিগোনমেট্রি। বদনের কথার কোনো মানে সে বুঝতে পারছে না, শুধু একটা ব্যাপারে সে খুশি কোনো জটিল কিছু থাকলে তা ধরা পড়বে।

পিছন থেকে সোল্লাসে চিৎকার—তবে এবার ভাগ্নে বদন না, মামা হরু ঠাকুর উত্তেজিত হয়ে চেঁচাচ্ছে। কালাচাঁদ ভাবল বোধহয় পঞ্চাননমঙ্গলের হদিশ পেয়ে গেছে হরু ঠাকুর। তাড়াতাড়ি লেখা ফেলে সে হরু ঠাকুরের পাথরের সামনে এসে দাঁড়াল, পিছন পিছন বদনও এল। ফলকে পদ্যটা থেকে যত্ন করে ধুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করতে করতে হরু ঠাকুর বলল, 'ভুজঙ্গপ্রয়াত!'

বদন বলল, 'সেটা আবার কী?'

'ভুজঙ্গপ্রয়াত জানিস না?'

বদন বলল, 'অঙ্কে ভুজ মানে বাহু—যেমন ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ—'

'থামতো।' হরু ঠাকুর খেঁকিয়ে উঠল। 'খালি অঙ্ক আর অঙ্ক। ভুজঙ্গ মানে সাপ। এ ছন্দের চলন সাপের মতো। বাংলায় রেয়ার পিস—

ড্যাড্যাং ড্যাং / ড্যাড্যাং ড্যাং / ড্যাড্যাং ড্যাং / ড্যাড্যাং ড্যাং
—এ ভাবে পড়তে হবে—'

'দুগগা পুজোর ঢাক বাজাচ্ছ নাকি?' বদন জিজ্ঞাসা করল।

হরু ঠাকুর উত্তেজিত হয়ে বলল, দ্যাখ না কী লিখেছে এখানে, আমি পড়ছি—

রবির পুব / দিগন্তের / ও পচ্চিম / শশাঙ্কের
তথাঞ্রি মোর / শিবের থান / যবেঁহ আধ / দূরত্বের

হরু ঠাকুর আরও পড়তে যাচ্ছিল, বদন বাধা দিল—'এটা তো সোজা, স্ট্যাটিসটিক্স এর ফর্মুলা। মিন বা অ্যাভারেজ হল এ প্লাস বি ডিভাইডেড বাই টু। ধুস, শুধু শুধু ডাকলে।' বদন বিরক্তি মুখে বলল। 'ওদিকে একটা অ্যালজেব্রার জটিল অঙ্ক দেখছিলাম। ওটা ধরতে না পারলে আজ মনে খচখচানিটা রয়েই যাবে।' বদন হনহন করে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে হাঁটা দিল। ঘণ্টা দুই পরিশ্রম করে হাত টনটন করতে লাগল কালাচাঁদের। জিরিয়ে নেবার জন্য এসে বসল একটা পাথরে। হরু ঠাকুরও পাশে এসে বসল—'কটা লিখলি?'

'মোটে আটটা,' কালাচাঁদ বলল। 'যত সোজা ভেবেছিলাম ততটা সোজা না। একটা ব্রাশ পেলে ভাল হত। তোমার কটা হল?'

'বারোটা।'

'এই লোকগুলো পাথরে লিখতে গেল কেন বলতো? কাগজে লিখলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত?' কালাচাঁদ বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে ডান হাতের আঙুল টিপতে টিপতে বলল।

'হ্যাঁ, টাইপ করে লিখলে আরও সুবিধা হত পড়তে,' হরু ঠাকুর ভেঙিয়ে বলল। 'কাগজ তো এই সেদিন এল রে এদেশে। আগে তো লোকে লিখত তালপাতায়, ভূর্জপত্রের ছালে, কিংবা কাঠ বা পাথরে খোদাই করে। আগেকার কালে তো গুহায় পাথর খোদাই করে লেখার চল ছিল। অজন্তা ইলোরার নাম শুনেছিস তো? ভীমবেটকা, পাঁচমারি?'

'ওগুলো তো শুনেছি ছবি।'

'কেন অশোকের শিলালিপি? ইতিহাস বইতে ছবি দেখেছিস তো। সব পাথরে খোদাই করে লেখা হয়েছিল।'

'বাংলায়?'

'দুর গাধা, বাংলা ভাষার তখন জন্মই হয় নি। ওসব ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা, পালি ভাষা। কলেজ-টলেজে পড়তে হয় ওসব শেখার জন্যে। আমি তো মুখ্যু, কিছুদিন পাথরে লেখা শেখার চেষ্টা করে ছেড়ে দিয়েছি। বড়ো মেহনতের কাজ—প্রথমে পাথরটাকে ছুরি দিয়ে ঘষে ঘষে মসৃণ করো, তারপর সেটা ঝামা পাথর দিয়ে ঘষে

BanglaBook.org

ঘষে পালিশ করো। কতবার পালিশ করার সময়ই পাথর ফেটে যায়। পালিশ ঠিকমতো হলে এবার খড়ি দিয়ে সেই পাথরের ওপর লেখ। তারপর সেই পাথরকে ছেনি দিয়ে খোদাই করে সঙ্গে সঙ্গে গদের গাঢ় আঠা সেই লেখায় ভরে দাও, যাতে ছোট ছোট পাথর ভেঙে বেরিয়ে আসতে না পারে। অনেক খাটনি, কিন্তু লাভ একটাই যে লেখাগুলো সহজে নষ্ট হয় না। এই দ্যাখ না, কবেকার এই সব পদ্য, কম করে পাঁচ-ছশো বছর আগেকার লেখা তো হবেই, কিন্তু হাজার ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, জলের চাপ সব সহ্য করেও কেমন টিঁকে আছে। কাগজ কী এ ভাবে থাকত?'

বদন এসে বলল, 'ছেষট্টিখানা পাথর—তার মধ্যে বাইশটা অ্যারিথমেটিক, সতেরোটা অ্যালজেব্রা, আটটা জিওমেট্রি, ছটা ট্রিগোনমেট্রি, সাতটা স্ট্যাটিসটিক্স, পাঁচটা সলিড জিওমেট্রি—টোটাল হল পঁয়ষট্টি। আর একটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

হরু ঠাকুর বলল, 'ছেষট্টিখানা আনকোরা অজানা প্রাচীন ছন্দোবদ্ধ পদ্য, ভাবলেই গা শিরশির করে। মুর্শিদাবাদের এক লিপিকারের বাড়ি থেকে ষোলশো সালের তালপাতার পুঁথির কিছু খালি পাতা পেয়েছি। এই মশলা ওই তালপাতায় ফেললে আহা—ঠিক যেন সরষে বাটায় পদ্মার ইলিশ।'

'একটা কিছুতেই ধরতে পারলাম না। ওটা আজ বাড়িতে গিয়ে দেখতে হবে।' বদন কাগজে লেখা পদ্যটা হরু ঠাকুরের হাতে দিল। হরু ঠাকুর জোরে জোরে পড়ল—

আকাসে প্রভাত আদিত করে তোহ্মা তুতী।
পঞ্চানন পঞ্চমুখত আলোকিএ দুতী॥
ছুটিল আলোক রথ ভক্তি লঞা বুকে।
প্রতিটি নিমেষে আনে আলো পঞ্চমুখে॥
চৌখের নিমেষে রথ ধাআঁ পাঞ্চ বার।
পৃথুবির পূব পচ্চিম কৈল পারাপার॥

'আর একটু ভাবতে হবে,' বদন বলল।

'কিন্তু এর মধ্যে পঞ্চাননমঙ্গল কাব্য কোথায় হরু ঠাকুর? সবই দেখছি ঠাকুরের গুণগান আর অঙ্ক। মঙ্গলকাব্যের গল্পের তো 'গ'ও দেখা যাচ্ছে না—সেইসব লখিন্দর বেহুলা, ধনপতি সওদাগর? এখানে তো শুধু অঙ্কই অঙ্ক। এদিকে হাতে মোটে পাঁচ দিন। পারব তো?' কালাচাঁদ হরু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করল।

'ঘাবড়াস নে কালা,' চিন্তিত মুখে হরু ঠাকুর ভরসা দেবার চেষ্টা করল। 'কিছু একটা ঠিক হবেই। আজ ভাবছি একবার চিদানন্দ ভটচাজের ওখানে ঢুঁ মারলে কেমন হয়, যদি কিছু জানতে পারি পঞ্চাননমঙ্গল সম্বন্ধে।'

BanglaBook.org

'কর্তামশাই বলেছে চিদেটা কালসাপ। ওর গর্তে হাত ঢোকানোটা বিপজ্জনক হতে পারে। মনে হচ্ছে তোমাকেই কিছু একটা করতে হবে হরু ঠাকুর। চিদের পিছনে সময় নষ্ট না করে দেখ এদিক-ওদিক বই-টই ঘেঁটে যদি এর ন্যাজ ওর মুড়ো জুড়ে একটা মঙ্গলকাব্যের কাহিনি দাঁড় করাতে পার, ওর মধ্যে এসব পাথরের অঙ্ক ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলে প্রাণটা যদি বাঁচে।'

তিনজনে চিন্তিত মনে চুপচাপ স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগল। হঠাৎ কি মনে হতে কালাচাঁদ বলল, 'তোমরা স্টেশনে যাও আমি একবার চট করে কর্তামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।'

'আবার কেন?' হরু ঠাকুর বলল।

'কর্তামশাইকে বলব ভাঙা পাথরও যেন তোলাবার ব্যবস্থা করে।' কালাচাঁদ হনহন করে জমিদারবাড়ির দিকে রওনা দিল।

॥ চোদ্দো ॥

জানলার ওপাশে কা-কা করে কর্কশ কাকের ডাকের আওয়াজে কালাচাঁদের ঘুম ভেঙে গেল। আধো জাগরণে কালাচাঁদ ভালো করে শুনে বুঝল আওয়াজটা "কা-কা" নয়, "কালা-কালা" হরু ঠাকুর কর্কশ গলায় চ্যাঁচাচ্ছে। কালাচাঁদ ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলল।

'এতো বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছিস? কাল রাতে বুঝি কারও বাড়িতে সিঁধ কাটতে গেসলি?' ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে হরু ঠাকুর গজগজ করতে লাগল। 'আর মাত্র চারদিন হাতে, বাবু নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন, আর আমি রাত্রি জাগছি।'

'রাতে বড্ড গরম ছিল, ঘুমোতে দেরি হয়েছে,' তেল চিটচিটে মশারি তুলতে তুলতে হাই তুলে বলল কালাচাঁদ।

'এককাপ চা খাওয়া কালা,' হরু ঠাকুরের চোখ লাল।

'আনছি,' কালাচাঁদ মুখ ধুতে বাইরের কলতলায় গেল, সেখান থেকে গলির রাস্তার উলটোদিকের চায়ের দোকানে গিয়ে দুটো ছোটো কাঁচের গেলাসে চা নিয়ে ভিতরে ঢুকল।

চায়ের গেলাসে শব্দ করে একটা চুমুক লাগিয়ে হরু ঠাকুর বলল, 'তুই তো আমার মাথায় উনুনের আগুন উস্কে দিলি রে কালা, সে আগুন দু'দিন ধরে ধিকিধিকি করে জ্বলল। অনেক ভাবলাম রে, একটা মঙ্গলকাব্য তো লেখা ইয়ার্কি না, তার ওপর আবার পঞ্চাননমঙ্গল। এদিকে বেশি সময় নেই তারপর

BanglaBook.org

মাঝরাতে নিজের অজান্তেই আঙুলে কলম নাচতে শুরু করল। ভোর হ
বেরিয়ে পড়লাম। হরু ঠাকুর পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল।

'এটা কী?'

'পড়েই দ্যাখ,'

কালাচাঁদ পড়ল—

নমিয়া প্রভুর পদ গুরুর চরণ।
পঞ্চানন দেব লীলা করি বিবরণ॥
ব্রহ্মা মেদিনী গড়ে, নারায়ণ পালে।
স্বর্গ ত্রেতা দ্বাপরের শেষে কলিকালে॥
মহেশ্বর মহাদেব বাবা ভোলানাথ।
পঞ্চানন রূপে নাকি হবে প্রতিভাত।
একি মায়া এক কায়া তাঁর পাঁচ মুখ।
পঞ্চানন জপে হবে কলিকালে সুখ॥
বরণন করি কথা শোন শুদ্ধ মনে।
চিত্ত শুদ্ধি হবে তাঁর একথা যে শোনে॥
কলিকালে অনাচারে ধরা যে নরক।
কালাজ্বর রূপ ধরি আসিল বড়ক॥
শ্মশান হইল দেশ গ্রাম ঘরখারে।
কালাজ্বর সংসারে আসি সুখ কাড়ে॥
পুত্র কন্যা ত্যাজি নর ছুটিয়া পালায়।
পচা গলা শব ভাসে নদী ও নালায়॥
দেবগণ না পারে যে সহিতে এ দৃশ্য।
আসিল শিবের কাছে বাঁচাও গো বিশ্ব॥
কারো পিতা কারো পতি কারো যায় মাতা।
সংসার ছারখার দয়া করো ত্রাতা॥
এত শুনি মহাদেব কহিল নন্দীরে।
পাপমুক্তি পাবে নর আমার মন্দিরে॥
পঞ্চমুন্ড গ্রামে গিয়ে দেউল বানাও।
পঞ্চানন রূপী মোর মুরতি আনাও॥
পঞ্চানন পূজা করে পাপ যাবে ধুয়ে।
পাপ মুক্ত হবে নর মোর মূর্তি ছুঁয়ে।
নন্দী কহে প্রভু আমি জানিতে উন্মুখ।

BanglaBook.org

পঞ্চানন রূপ কিবা তব পাঁচ মুখ॥
মৃদু হাসি শিব কহে বলি শোন সুখে।
কর্ম মোর কায়া ধরে মোর পঞ্চমুখে।
অঘোরা রূপেতে আমি করি যে ধ্বংস।
শ্মশান রক্ষক রূপে আমি নৃশংস।
ধ্বংসের শেষে হয় নব নব সৃষ্টি।
দক্ষিণ পানে মোর অঘোরার দৃষ্টি॥
উত্তর পূব দিকে বদন ঈশান।
ঈশান রূপেতে মোর সৃষ্টির নিশান॥
এই রূপে আমি শিব আমি জন্মদাতা।
সর্বত্র বিরাজমান জগতের ত্রাতা॥
পূব মুখে ধ্যান করি আমি যে স্বয়ং।
তৎপুরুষের রূপ এ মোর অহং॥
মুনি ঋষি মহাযোগী সদা চক্ষু বুজে।
চাঁদ ভালে সাপ গলে এই রূপ পুঁজে॥
বামদেব রূপ মোর উত্তরে অক্ষয়।
চতুর্বেদে যজু যথা রোগ নিরাময়॥
বামদেব রূপ মোর সৌম্য স্নিগ্ধ শান্ত।
দর্শনেতে দেহ মন জুড়াইবে পান্থ॥
পঞ্চম বদন মোর চাহে যে পশ্চিমমুখে।
রুদ্র রূপে মহাকাশ মোর পদে ঝুঁকে॥
বিশাল গগন সম, অণু হতে ক্ষুদ্র।
"ওম" নাদ স্রষ্টা আমি পঞ্চানন রুদ্র॥

দুটো পাতা পড়ে কালাচাঁদের চোখ কপালে উঠল। কালাচাঁদ তুতলে বলল, 'প-ঞ্চা-ন-নমঙ্গল!' তারপর হরু ঠাকুরের দিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে বলল, 'কাল বললাম, আর এর মধ্যে লিখে ফেললে? এত দারুণ হয়েছে গো!'

হরু ঠাকুর বলল, 'বদনের কাছে গিয়ে এতে অঙ্ক মেশাতে হবে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে দেখি।'

কালাচাঁদ তাড়াতাড়ি চা শেষ করে, জামা-প্যান্ট পরে বলল—চল।

* * *

বদনদের দরজায় কলিং বেল বাজাতে নিতাই দরজা খুলল—'দাদাবাবু ঘুমোচ্ছে।'

BanglaBook.org

'এত বেলায়? আজ মর্নিং ওয়াকে যায় নি?'

'কাল সারারাত ঘরে আলো জ্বালিয়ে পায়চারি করেছে। এই তো একটু আগে ঘুমোতে গেল।'

'ওকে ডাকিস না, ঘুমোতে দে, আমরা একটু ঘুরে আসছি,' হরু ঠাকুর বলল।

দরজা জুড়ে বদন এসে দাঁড়াল। লাল চোখ আরও লাল, মনে হচ্ছে কাপালিক কাল রাতে তন্ত্র সাধনায় বসেছিল—'এস এস, বোসো, মুখটা ধুয়ে আসছি, খুব দরকারি কথা আছে।'

বদন মুখ-চোখ ধুয়ে ঘরে ঢুকল, হাতে এক তাড়া কাগজ। 'পাঁচমুড়োর কালকের ওই স্তবটা আমার কাল রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। কাল একটু সন্দেহ হয়েছিল কিন্তু নিরীহ ওই শ্লোকে আমাদের পূর্বপুরুষরা এত বড়ো ব্যাপার লুকিয়ে রেখেছিল সেটা ভাবতেই পারিনি। ভালো করে শোন ওরা কী লিখে গেছে—'

বদন শ্লোকটা পড়ল—

আকাসে প্রভাত আদিত করে তোহ্মা তুতী।
পঞ্চানন পঞ্চমুখত আলোকএ দুতী॥
ছুটিল আলোক রথ ভক্তি লএ্রা বুকে।
প্রতিটি নিমেষে আনে আলো পঞ্চমুখে॥
চৌখের নিমেষে রথ ধাআঁ পাঞ্চ বার।
পৃথুবির পুব পচ্চিম কৈল পারাপার॥

হরু ঠাকুর বলল, 'হে বাবা পঞ্চানন, তোমার পঞ্চমুখের প্রতিটি মুখ প্রতি নিমেষে আলোকিত করার জন্য সূর্যদেব তাঁর আলোর রথ প্রতি নিমেষে পাঁচবার পুব থেকে পশ্চিমে পাঠায়।'

'ঠিক,' বদন বলল। 'কিন্তু এর পিছনে একটা বিশাল অঙ্ক লুকিয়ে রেখেছে। "নিমেষ" কথাটা প্রাচীন ভারতের সময়ের একটা মাপ। পুরাণে লেখা আছে ১৫ নিমেষ = ১ কাষ্ঠা, ৩০ কাষ্ঠা = ১ কলা, ৩০ কলা = ১ মুহূর্ত, ৩০ মুহূর্ত = ১ দিন এবং রাত্রি। তাঁর মানে এক নিমেষ হল ১৬/৭৫ সেকেণ্ড। সূর্যের রথ পৃথিবীর পুব থেকে পশ্চিমে ছুটছে। পৃথিবীর পুব থেকে পশ্চিমের দূরত্ব অথবা পৃথিবীর ব্যাস হল ৭৯২৬.৩৪ মাইল। সূর্যের রথ পাঁচবার এই দূরত্ব যায় মানে ৩৯৬৩১.৭ মাইল যায় ১৬/৭৫ সেকেন্ডে। তার মানে সূর্যের রথ এক সেকেন্ডে যায় ১,৮৫, ৭৭৩.৬ মাইল। আজকের বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। ভাবতে পারো, মাত্র ০.১ শতাংশের ফারাক?'

'বলিস কি?' হরু ঠাকুরের চোখ কপালে।

'পশ্চিম দুনিয়া দাবি করে যে আলোর গতি নাকি মেপেছে ১৬৭৫ সালে

BanglaBook.org

ডেনমার্কের বৈজ্ঞানিক রোমার। কিন্তু আমাদের দেশে সায়ন নামে একজন বৈদিক পণ্ডিত ছিলেন। ওনার জন্ম ১৩১৫ সালে। উনি বিজয়নগরের সম্রাট বুক্কের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। উনি ঋকবেদে সূর্যের স্তোত্র ১.৫০ এর ৪র্থ স্তবকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—তথা চ শ্রূয়তে যোজনানাম সহস্রে দ্বি-দ্বি যোজনে একেনা নিমিষার্ধেনা ক্রমমানা। এটা জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার ১৮৯০ সালে যে ঋকবেদের প্রকাশনা করেন, তাতে তিনি সায়নের উক্তিটি ছাপেন।'

'এর মানে কী?' হরু ঠাকুর বলল।

'এটা স্মরণ করা হচ্ছে যে তুমি আধ নিমেষে ২০২২ যোজন অতিক্রম করো। এক যোজন হল প্রায় ৯ মাইল। অঙ্কের বোঝা তোমাদের ঘাড়ে না চাপিয়ে বলছি এই সব সংখ্যা দিয়ে অঙ্ক কষলে পেয়ে যাবে ১,৮৬,০০০ মাইলের কাছাকাছি একটা সংখ্যা।'

'তুই এত সব জানলি কি করে রে বদন?' হরু ঠাকুরের গলায় প্রশংসা ঝরে পড়ছে।

'আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে আমরা আমাদের কৃতিত্ব ভুলে বিদেশীর দলে গিয়ে ভিড়তে চাই মামা,' বদন ব্যাঙ্গ করে বলল। 'রোমার-এর কৃতিত্বকে একটুও খাটো না করে বলছি যে উনি মহান জ্যোতির্বিদ ছিলেন, কিন্তু আমাদের দেশের কৃতিত্বগুলো ধামাচাপা পড়ে রয়েছে। আমরা নিজেরাই নিজেদের কৃতিত্ব বিশ্বাস করতে চাই না।'

'গোটা ব্যাপারটা আমার কিন্তু দৈবের নির্দেশ লাগছে—' হরু ঠাকুর বলল।

'দৈবের নির্দেশ?' বদন ভ্রূ কুঁচকাল।

'তা নয় তো কি? যে এই শ্লোক লিখেছে সে তো পৃথিবীর পুব থেকে পশ্চিম কত দূরে হবে তা তৈরি করে নি, পঞ্চানন বাবার যে পাঁচ মুখ হবে তাতেও তাঁর কোনো হাত নেই, কতক্ষণে এক নিমেষ হয় সেটাও সে তৈরি করেনি, অথচ সব মিলে প্রাচীন সূর্যের রথের গতি আজকের বিজ্ঞানের আলোর গতির সঙ্গে কেমন মিলে গেল। এতবড়ো কাকতলীয় ব্যাপার কীভাবে ব্যাখ্যা করবে তোমাদের বিজ্ঞান?'

'এই পাথরগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে,' বদন বলল। 'আমাদের এই ঝামেলাটা না থাকলে আজ আরকিওলজি ডিপার্টমেন্টে খবর দিতাম। কিন্তু তোমরা এত সকালে কী মনে করে এখানে এসেছ?'

কালাচাঁদ বলল, 'হরু ঠাকুর কাল রাতে পঞ্চাননমঙ্গল লেখা শুরু করেছে।'

হরু ঠাকুর বলল, 'কয়েকটা লাইন পড়ছি শোন তো কেমন লাগে।' হরু ঠাকুর কাগজটা বের করে সুর করে করে তার লেখা পঞ্চাননমঙ্গলের লাইনগুলো পড়ল।

BanglaBook.org

বদন বলল, 'বাঃ, বেশ লাগছে শুনতে। কিন্তু এর মধ্যে অঙ্কের নামগন্ধ নেই।'

হরু ঠাকুর বলল, 'আসল কাজটা এখানে তোকে করতে হবে বদন, তুই এর মধ্যে অঙ্ক ঢুকিয়ে দে।'

বদন বলল, 'তোমরা কী ভাবো বল তো, অঙ্ক কি দই নাকি যে ভাতে ঢেলে দিলেই দই-ভাত হয়ে গেল।'

কালাচাঁদ সমাধান দিল, 'অঙ্ক নিয়ে তোমায় চিন্তা করতে হবে না হরু ঠাকুর। পাঁচমুড়োর পাথরগুলো যদি পঞ্চাননমঙ্গলের অংশ হয় তবে ওগুলোই আমরা এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেব। কারও কিছু বলার থাকবে না। প্রবলেমটা অন্য জায়গায়। ধাড়া এই পুঁথি শেখদের এজেন্ট হিসাবে কেনার আগে একবার কোনো এক্সপার্টকে দিয়ে যাচাই করাবেই করাবে। আর সেই এক্সপার্ট হল সদানন্দ ভটচাজ টাইপের লোক।'

'ওই বুড়োর চোখকে ফাঁকি দেওয়া খুব মুস্কিল—' হরু ঠাকুর বলল।

'এবার ধরা পড়লে আমায় শংকর মাছের চাবুক দিয়ে পেটাবে বলেছে,' কালাচাঁদ বলল।

'তবে উপায়?' হরু ঠাকুর বলল।

'উপায় হল চোরের ইশকুলে কোতোয়াল মাস্টার।' কালাচাঁদ বলল।

'মানে?' বদন বলল।

'মানে ঐ বুড়োর কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে কী কী ভাবে ও নকল পুঁথি ধরতে পারে। তারপর এমন আটঘাট বেঁধে এগোতে হবে যাতে ওর শিক্ষায় ওকেই হারাতে পারি। যেরকম শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের কাছ থেকে শিখে এসেছিলেন কী ভাবে যুদ্ধে ভীষ্মকে পরাজিত করা যায়।'

'কিন্তু তুই তো আর ওর পেয়ারের কৃষ্ণ ঠাকুর নোস। ও তোকে শংকর মাছের চাবুক দিয়ে পেটাবে বলেছিল। ঐ বুড়ো তোকে শেখাবে কেন রে কালা?'

'সেটাই তো ভেবে বের করতে হবে—' কালাচাঁদ ঠোঁট কামড়ে ভাবতে ভাবতে বলল। 'খুঁজে বার করতে হবে ওর দুর্বলতা কিসে।'

'ওই বুড়োর ক্যারেক্টারে কোনো দুর্বল জায়গা নেই, টাকার টোপ ও গিলবে না, ও প্রচণ্ড সৎ।'

'দুর্বল জায়গা প্রত্যেকের থাকে। কারো দেহে কারো মনে। এমনকি শ্রীকৃষ্ণ ভগবানেরও ছিল—পায়ের নীচটা, সেখানে ব্যাধ তির মারতেই তাঁর ইতি। লৌহদেহী জরাসন্ধ—তারও দুর্বল জায়গা ছিল নাভি—ভীম দু'পা টেনে চিরে তাকে হত্যা করে, দুর্যোধনের ছিল উরু—ওখানে গদার আঘাতে তবে সে মরল।'

'অ্যাচিলেস হিল,' বদন বলল।

'সেটা আবার কী?' হরু ঠাকুর বলল। 'অঙ্কের দুর্বল জায়গা বুঝি?'

BanglaBook.org

কালাচাঁদ দেওয়াল ঘড়িটা দেখল। সময় যেন ছুটে চলেছে। আর মোটে চারদিন আছে। এখনও কিছুই হল না। কালাচাঁদ উঠে দাঁড়াল—'আমি জানি ওই বুড়োর দুর্বল জায়গা কোথায়। ওই বুড়োর কাছ থেকে শিখব কী ভাবে পুঁথি জাল করলে ওই বুড়ো নিজেই ধরতে পারবে না।'

।। পনেরো ।।

হাতে একদম সময় নেই কালাচাঁদের। বদনের বাড়ি থেকে বাড়ি ফিরে গায়ে দু'মগ জল ঢেলে একটু জল-চিড়ে চিনি ছড়িয়ে খেয়ে কালাচাঁদ আবার দৌড়াল। গলির মুখে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল কালো গাড়িটা দেখে একটু অস্বস্তি হলেও হাতে একদম সময় নেই থেমে কিছু ভাবার। শিয়ালদা স্টেশনে হরু ঠাকুর আর বদন টিকিট কেটে দাঁড়িয়েছিল, দুপুরের ট্রেনটা ধরল কালাচাঁদ। কামরাটা প্রায় ফাঁকা। ট্রেনে উঠে বদন একটা বই খুব মনোযোগ সহকারে পড়তে লাগল। হরু ঠাকুর বদনকে দু'একটা প্রশ্ন করে উত্তর না পেয়ে চুপ হয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর ট্রেনের জানলার পাশে বসে হাওয়ায় এবং দুলুনিতে কালাচাঁদ ঘুমিয়ে পড়েছিল, উলটো দিক থেকে একটা বেরসিক দ্রুতগামী ট্রেন ধমক দিয়ে তাকে জাগিয়ে ছুটে চলে গেল। শিলে চমকানো আওয়াজে ঘুমের দফারফা, কালাচাঁদ ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসল। বদন এখনও বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে রয়েছে, হরু ঠাকুর সামনের খালি চেয়ারে দু'পা ছড়িয়ে বসে আনমনা হয়ে বাইরের ছুটন্ত প্রকৃতি দেখছে।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, রাতে ঘুম হয় নি তো—' কালাচাঁদ লাজুক হেসে বলল।

'মাথার ওপর ঝুলন্ত খাড়ার নীচে কেউ ঘুমোতে পারে তা জানতাম না।' হরু ঠাকুর মন্তব্যটা সিলিং ফ্যানের দিকে ছুড়ে দিল।

কালাচাঁদ হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না। ট্রেনের কামরায় উলটোদিকে জানলায় সানগ্লাসে চোখ ঢেকে যে লোকটা খবরের কাগজের পিছনে মুখ লুকোলো, তাকে যেন চেনা চেনা লাগল। কালাচাঁদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে কালাচাঁদের ঘুমের আলস্যি মুছে দিল। চোখ বন্ধ করে মটকা মেরে পড়ে সে ভাবতে লাগল, লোকটাকে কোথায় দেখেছে? ক্যামেরার ফ্লাশের মতো কালাচাঁদের মস্তিষ্কে স্মৃতি ঝলকে উঠল আর ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠল। ঠাকুরপুকুরের শেখের সাগরেদ দুই খুনির একটা। মুখের একগাল দাড়ি কামিয়ে ফেলায় প্রথমে চিনতে পারে নি সে। এই লোকটাই ধাড়ার এজেন্টের ভোজালি গাঁথা বুকে বালিশ চেপে ধরেছিল।

BanglaBook.org

খুনিটা কেন তাদের অনুসরণ করছে?

কালাচাঁদ দ্রুত ভেবে নিল কী ভাবে এই লোকটার চোখে ধুলো দেওয়া যায়। কালাচাঁদ পকেট থেকে শিবের বুকে কালীর পদ্যের কাগজটা বের করে তাতে লিখল—শেখের সাকরেদ খুনিটা উলটো দিকে বসে আমাদের ফলো করছে। তাকিও না। সামনের স্টেশনে নেমে পড়তে হবে। ট্রেন থামলে তৈরি থাকবে। ট্রেন চলতে শুরু করলেই ছুটে গিয়ে নামতে হবে। কালাচাঁদ আড়চোখে দেখল খুনিটা নজর রাখছে। কাগজটা হরু ঠাকুরের হাতে দিল কালাচাঁদ। কাগজটা পড়ে হরু ঠাকুর এমন ভাবে কেঁপে উঠল যেন পৌষের কনকনে শীতের ভোরে নাঙ্গা গায়ে গঙ্গায় স্নান করতে নামল। কাঁপা কাঁপা হাতে বদনের হাতে হরু ঠাকুর কাগজটা দিল। বদন ওটা পড়ে কাগজটা চুপচাপ অঙ্ক বইয়ের ভিতর ঢুকিয়ে বই বন্ধ করল। কালাচাঁদ লক্ষ করল যে উত্তেজনায় বদনের হাতের আঙুলগুলো বইটাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরল।

সামনের স্টেশনে ট্রেন থামতেই কালাচাঁদ রেসের ঘোড়ার মতো টানটান হয়ে তৈরি হয়ে রইল, যেন বন্দুকের আওয়াজ হলেই ছুটবে। ট্রেনের ভোঁ হল, ট্রেনটা দুলে উঠল, প্ল্যাটফর্ম চলতে শুরু করল। বদন আর কালাচাঁদ প্রায় একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। দরজার দিকে ছুটে যাওয়ার সময় কালাচাঁদ দেখল হরু ঠাকুর তখনও বসে—ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। কালাচাঁদ সিটে ফিরে এসে হরু ঠাকুরের শীর্ণ হাত ধরে এক টান লাগাতে হরু ঠাকুর উঠে দাঁড়াল। আরেক হ্যাঁচকা টানে হরু ঠাকুর প্ল্যাটফর্মে। ট্রেনটা ততক্ষণে গমগম করে দৌড় লাগিয়েছে। কালাচাঁদ দেখল খুনিটা উঠে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ততক্ষণে বেশ দেরি হয়ে গেছে।

অজ পাড়াগাঁয়ের স্টেশনের নাম শিমুলগ্রাম, পাঁচমুড়োর আগের স্টেশন। বাইরে এসে ভ্যান রিক্সায় চেপে বাস রাস্তা, বাস রাস্তায় এসে হরু ঠাকুর বাইফোকাল চশমার ডাঁটিটা সোজা করতে করতে বলল, 'বেয়াক্কেলের মতো হ্যাঁচকা টান মারলি, তোর আর কবে বুদ্ধি হবে কালা?'

কালাচাঁদ রেগে বলল, 'তুমি এত ভিতু কেন হরু ঠাকুর? ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে সেদিকে তোমার কোনো খেয়াল নেই। খুনিটার চোখের দিকে তাকিয়ে হাঁ করে বসেছিলে, যেমন জঙ্গলে ময়ূর চিতাবাঘ লাফ দেবে জেনেও তার দিকে হাবলার মতো তাকিয়ে থাকে!'

বাসস্ট্যান্ডে আধঘণ্টা অপেক্ষা করে কালাচাঁদরা একটা ভটভটি পেল। হাতল ধরে ভটভটিতে উঠতে গিয়ে ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল হরু ঠাকুর। কালাচাঁদ চুপ। তার মাথায় নানা জটিল প্রশ্ন সমাধান খুঁজে চলেছে। শেখের সাগরেদ খুনিটা

তাদের অনুসরণ করছে কেন? কী আছে এই পঞ্চাননমঙ্গলে যার জন্য শেখ একটা লোককে অনায়াসে খুন করে ফেলল? ভটভটিতে বসে বদন আবার অঙ্কের বই খুলল। ভটভটি হাইওয়েতে এগিয়ে চলল পাঁচমুড়োর দিকে।

বাসরাস্তা থেকে জমিদারবাড়ি যাওয়ার পথে পলাশডাঙার মাঠের আলের পাশে সদানন্দ ভটচাজের রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে দেখে কালাচাঁদ থেমে গেল। দূর থেকেই দেখতে পেল সদানন্দ ভটচাজ একটা পাথরের সামনে দু'পায়ের ওপর ভর দিয়ে বসে।

'ব্যাটা পাথরে হিসি করছে নাকি রে?' হরু ঠাকুর বলল।

কালাচাঁদদের দেখে সদানন্দ কষ্ট করে লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ব্যাজার মুখে বললেন, 'তোদের দ্বারা তো কিছু উত্তর বের হল না, তাই ভাবলাম নিজেই চেষ্টা করে দেখি, পাথরগুলো পড়ছিলাম।'

কালাচাঁদ বলল, 'কিছু পেলেন?'

'নাঃ, অনেক লেখা তো দেখচি ভেঙেচুরে গেছে। এইটা মনে হচ্ছে কিছু একটা হিন্ট দিচ্ছে,' সদানন্দ সামনের পাথরের ওপর লেখাটা দেখাল—

প্রভু দেব মহাদেব নম নম নম।
পৃথুবির চারি পাশ যোখমাপে সম॥
এক পাশ দুঈ ভাগেঁ প্রভু দিলেঁ দাগ।
ইশর আসুরে লৈলেঁ পৃথুবির ভাগ॥
নিজগুণ সাথে কৈলেঁ পরগুণ যোড়।
খেতি করিআঁ চাউল ভাগেঁ দেয়াসুর॥

'ওটা অ্যালজেব্রা,' পিছন থেকে বদনের গম্ভীর গলা।

'অ্যালজেব্রা! মানে?'

'অ্যালজেব্রা মানে বীজগণিত।'

'ব্যাপারটা কী রে কালা? তুই অঙ্কে এক্সপার্ট, 'ভাগ্নে-বদন' অঙ্কে এক্সপার্ট। যে যখন পারছে পাঁচমুড়োয় এসে আমার ওপর গণিতের জ্ঞান ঝেড়ে যাচ্চে। আমার কেমন যেন খটোমটো লাগছে। আমি তো এর মধ্যে অঙ্ক দেখছি না।'

বদন বলল, 'বুঝিয়ে দিচ্ছি, "পৃথুবির চারি পাশ যোখমাপে সম।" মানে একখণ্ড জমি যার চারিধারে সমান মাপ। মানে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সম—মানে বর্গাকার জমি।

এক পাশ দুঈ ভাগেঁ প্রভু দিলেঁ দাগ।
ইশর আসুরে লৈলেঁ পৃথুবির ভাগ॥

বর্গাকার জমির একধারে দাগ কেটে দু'জনকে ভাগ করে দেওয়া হল। মনে করুন দেবতার দিকটা 'এ' আর দানবের দিকটা 'বি'—যোগ করে এক দিক হয় 'এ প্লাস বি'। তার মানে বর্গাকার জমির এরিয়া 'এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার।'

BanglaBook.org

"নিজগুণ সাথে কৈলেঁ পরগুণ যোড়"—দেবতার নিজগুণ মানে নিজের সঙ্গে নিজেকে গুণ করে হয় 'এ গুণ এ মানে 'এ স্কোয়ার,' আর পরগুণ মানে এ গুণ বি মানে 'এবি'। নিজগুণ সাথে পরগুণ যোগ করলে হয় 'এ স্কোয়ার প্লাস এবি।' সেরকম দানবের নিজগুণ সাথে পরগুণ যোগ করলে হয় 'বি স্কোয়ার প্লাস এবি।' দুটো যোগ মোট বর্গাকার জমির এরিয়া হয় 'এ স্কোয়ার প্লাস টু-এবি বি স্কোয়ার।' অথচ আমরা আগে দেখেছি বর্গাকার জমির এরিয়া 'এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার।' অতএব 'এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার = এ স্কোয়ার প্লাস টু-এবি প্লাস বি স্কোয়ার। এটা হল জ্যামিতি দিয়ে অ্যালজেব্রার প্রমাণ করা।'

কালাচাঁদ বলল, 'ঠিক।' যদিও তার মাথায় কিচ্ছুটি ঢুকল না। 'তবে এর চেয়েও ইন্টারেস্টিং পদ্য এই মাঠে আরও আছে, দেখাব নাকি?'

বিস্মিত সদানন্দ কিছু বলার আগে হরু ঠাকুর বলল, 'আর যদি ছন্দের অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতে চান—এটা পয়ার—প্রভু দেব মহাদেব নম নম নম—আট ছ'য়ে চোদ্দ—পয়ারের মাপে মাপে মিলে যাচ্ছে। এটা তো শুভঙ্করের আর্যায় পাবেন না, মনে হচ্ছে যেন একজন ছান্দসিক কবি আর একজন গণিতজ্ঞ দু'জনে একসঙ্গে বসে যুক্তি করে একপাতায় লিখছে।'

কালাচাঁদ সদানন্দের চোখের অসহায় দৃষ্টি দেখে এটুকু বুঝল যে সদানন্দ ভটচাজ আর ভবিষ্যতে তাদের বেশি ঘাঁটাবে না। মাঠে আঁশফল গাছের নীচে একগাদা পাথর ডাঁই করে রাখা। বদন বলল, 'এ পাথরগুলো তো আগে দেখিনি।'

সদানন্দ বললেন, 'কাল কালা বলল, শুধু বড়ো বড়ো পাথরগুলোই তোলা হয়েছে, অনেক পাথর জলের তলায় ভেঙে গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। আজ সেগুলো তোলার ব্যবস্থা করলাম। ওগুলো আজ সকালে বাগদির ছেলেরা এনে রেখেছে। ওরাই পরিষ্কার-টরিস্কার করে এখানে সাজিয়ে রেখে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেল। সেগুলোই দেখতে এসেছি।'

বদন পুরো কথাটা শুনেছে বলে মনে হল না কালাচাঁদের, কর্তামশাইয়ের কথা শেষ হবার আগে বদন হনহন করে হেঁটে একটা পাথরের সামনে দাঁড়িয়ে লিপি পড়তে লেগে গেছে। কালাচাঁদ মাটিতে ছড়িয়ে থাকা আঁশফলের থেকে কয়েকটা তুলে একটার খোসা ছাড়িয়ে দাঁতের কামড় বসাল—বিচি মোটা, শাঁস ফিনফিনে পাতলা। হরু ঠাকুর বদনের পিছনে এসে দাঁড়াল। পাথরের নীচের দিকের অক্ষরগুলো কালাচাঁদের কেমন যেন লাগল—'এগুলো ঠিক বাংলা লাগছে না,' কালাচাঁদ বলল।

'উপরটা বাংলা, আর তার নীচের লেখাগুলো সংস্কৃত,' হরু ঠাকুর বলল।

BanglaBook.org

বদন বলল, 'মামা একটু পড়ে শোনাও তো।'

হরু ঠাকুর কষ্ট করে করে পড়ে বলল—

কুবেরবন্ধু পঞ্চাননে দিলেঁ সাত সাগরের ফুল।
তহি পাঁচ মাথাত দিলেঁ সম সম বউল।।
তবেঁ সে প্রতি সাগর হৈতে ফুল আনিলেঁ সম।
করযোড়ী চারি ফুলে চারি বেদ নম।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও—' বদন বলল। 'তার মানে সাত সাগর থেকে সমান সংখ্যক ফুল এনে পঞ্চানন বাবার পাঁচমাথায় ভাগ করে দেব আর তার থেকে চারটে ফুল বাঁচবে সেটা আমরা চার বেদ-এ উৎসর্গ করব।'

সদানন্দ লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে ওদের পিছনে এসে দাঁড়ালেন, বদনের কথাটা ওর কানে গেছে। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'আবার দেখছি ধাঁধা শুরু হল।'

বদন বলল, 'দু'টো আননোন সলভ করতে লাগে দুটো ইকুয়েশন। এখানে আমাদের দুটো আননোন—পঞ্চাননের পাঁচ মাথার প্রতি মাথায় কটা করে ফুল পেল আর সাত সাগরের প্রতি সাগর থেকে কটা করে ফুল এল আর আমাদের হাতে মাত্র একটা ইকুয়েশন, সেটা হল সেভেন এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইকুয়ালস ফোর। তারপর কী আছে মামা তুমি পড় তো—'

'তারপর একটা পঞ্চাননের ছবি, আর তার নীচে সংস্কৃতে লেখা—

অধিকাগ্রভাগহারং ছিন্দ্যাদূনাগ্রভাগহারেণ।
শেষপরস্পরভক্তং মতিগুণমগ্রান্তরে ক্ষিপ্তং।।
অধতপরিগুণিতমন্ত্যযুক্তনায়চ্ছেদ্ভাগিতে শেষং।
অধিকাগ্রচ্ছেদগুণং দ্বিচ্ছেদাগ্রমধিকাগ্রযুতং।।

'এটা চটপট লিখে নিই,' বদন পকেট থেকে পেন আর ছোটো একটা ডায়েরি বের করে লিখে নিল। 'চল, এবার পরের পাথরটা দেখি।'

পরের পাথরটা দেখে বদন হতাশ হয়ে বলল, 'ইস, এটা তো আধভাঙা।'

পাথরটা আড়াআড়িভাবে ভেঙে গেছে। উপরের দিকটা নেই, শুধু নীচের অংশটা আছে তাতে একটা সংস্কৃত শ্লোকের কিছুটা উঁকি মারছে, তাও ঠিকমতো পড়া যাচ্ছে না। বদন হরু ঠাকুরকে বলল যে অংশটুকু আছে তা একটা কাগজে লিখে ফেলতে। হরু ঠাকুর কষ্টেসৃষ্টে লিখল—

রূপ প্রক্ষেপপদে পৃথগিষ্টক্ষেপ্যশোধ্যমূলাভ্যাম
কৃত্বাহহত্যাদ্যপদে য়ে প্রক্ষেপোবনে।

পরের পাথরটা আরও ভাঙাচোরা, কয়েকটা লাইন উদ্ধারই করা গেল না। হরু ঠাকুর কিছুটা উদ্ধার করে লিখল—

বর্গে গুণকে ক্ষেপঃ কেনচিদুৎধৃতয়ুতোনিতো দলিতঃ
প্রথমোহনয়মূলমন্ত্যো গুণকারপদৎধৃতঃ প্রথমঃ ॥

'বাপ রে, এ যে সংস্কৃত ভাষার ইশকুল বসিয়ে দিয়েছে জলের নীচে,' বদন বলল। 'বাংলাটা বোধহয় উপরে লেখা ছিল, ভেঙে গুড়ো গুড়ো হয়ে গেছে।'

বাকি পাথরগুলোর অবস্থা আরও শোচনীয়, ঝুরঝুরে হয়ে ছোটো ছোটো ঢেলা হয়ে গেছে। হরু ঠাকুর একটা আধভাঙা পাথরের সামনে উবু হয়ে বসে অনেকক্ষণ ধরে কী দেখল।

কালাচাঁদ বলল, 'কী দেখছ?'

'গ্রন্থারম্ভ,' হরু ঠাকুর একটা ভাঙা পাথরের টুকরোয় লেখাটা দেখাল। 'ইস, ভেঙেচুরে গেছে রে—

জপয়ে কবিরাজ পঞ্চানন নাম।
বেগবতী নইকূলে পঞ্চমুন্ড গ্রাম—

বাকিটা পড়া যাচ্ছে না।'

বদন অন্য একটা পাথরের টুকরো তুলে বলল—'মায়া, এটা পড়—'

হরু ঠাকুর পড়ল—

পঞ্চানন দেউলত পূজএ নন্দীধন।
নিতি পূজা ভকতীএঁ আগর চন্দন ॥
এয়ি মাহাজন কণ্যা বড় পূর্নমতী।
পূনমীর চাঁদ জেন হাসএ ভানুমতী ॥

বদন বলল, 'এই টুকরোগুলোকে জিগ্‌স পাজলের মতো সাজিয়ে সাজিয়ে দেখতে হবে কতটা উদ্ধার করা যায়।'

কালাচাঁদ আরও একটা পাথর উদ্ধার করে আনল গুড়ো সেলেট পাথরের তলা থেকে। হরু ঠাকুর পাথরের ওপরটা ঝেড়েঝুড়ে পড়ল—

শবরের ঘর গেহ পোড়াআঁ ছারখার।
জমিদার জুড়ায়িলেঁ কোপ আনল তার ॥
তরাসিত মনে বনে শবর সমাজ।
দূরে চলি গেলা ছাড়ি পঞ্চমুন্ড রাজ—

'এটা মঙ্গলকাব্যের গল্প। এটাই পঞ্চাননমঙ্গল,' সদানন্দ বললেন। 'আমি ঠিক আন্দাজ করেছিলাম। মন্দিরের দেওয়ালে গোটা পঞ্চাননমঙ্গলটা লিখে রাখা ছিল।'

'মন্দিরের দেওয়ালে কেন লিখবে?' কালাচাঁদ বলল।

'সেটা তো আর আমাকে বলে যায় নি,' সদানন্দ বললেন। 'তাজমহলের

BanglaBook.org

দেওয়ালে গোটা কোরাণটা লেখা আছে দেখেছি। কেন লিখেছে তা আমি জানি না। এটা সেরকমই—'

'একটা জিনিস লক্ষ করেছেন কর্তামশাই, গোটা কাব্যটা কিন্তু এক মাপের, অক্ষরগুলোও এক ধরণের, আমার মনে হয় এটা একই লোকের লেখা—' হরু ঠাকুর বলল।

'আমার গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠছে—' সদানন্দ বললেন।

'ইস, সব ভেঙে গুড়ো হয়ে গেছে—' হরু ঠাকুর আরেকটা পাথর পড়তে লাগল—

ইহ গুণী অসুর জেন রোযিল অতি।
বিহা করিবেহেঁ মোরেঁ তোহ্মা ভানুমতী॥
পাঠায়িআঁ লাঠিআল কালি বিহাণে।
দেখিহ আনিব তোহ্মার কণ্যা এই থানে॥
সিন্দুর আঁকিব তোহ্মার কণ্যার শিশে।
পাছেত মারিবোঁ তোহ্মায় সাপের বীষে॥

মনে হচ্ছে, গল্পটার একটু একটু আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। নন্দীধন নামে এক পুরোহিত পঞ্চানন দেবতার মন্দিরে পুজো করত। গ্রামের জমিদার খুব লম্পট আর অত্যাচারী ছিল। জমিদার নন্দীধনের মেয়ে ভানুমতীকে জোর করে বিবাহ করতে চাইল—'

কালাচাঁদ বলল, 'ফার্স্ট ক্লাস।'

হরু ঠাকুর বলল, 'তার মানে?'

কালাচাঁদ বলল, 'তোমার মঙ্গলকাব্যের গল্পের প্লট।'

সদানন্দ বললেন, 'কী বলছিস, আমার মাথায় ঢুকছে না। কিসের প্লট? 'তোমার মঙ্গলকাব্য' কথাটার মানে কী?'

কালাচাঁদ কথা ঘুরিয়ে বলল, 'কর্তামশাই, আপনার একটু সাহায্য চাই।'

সদানন্দ ভটচাজ পঞ্চাননমঙ্গলের কবল থেকে বেরিয়ে তখনো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন নি—'কী সাহায্য?'

'একখানা অনেক পুরোনো পঞ্চানন দেবতার পাঁচালি হাতে এসেছে। তার থেকে ক'টা লাইন টুকে আনলাম। একটু দেখে বলতে পারবেন এটা আসল পঞ্চাননমঙ্গল থেকে নেওয়া হতে পারে কিনা।' কালাচাঁদ পকেট থেকে হরু ঠাকুরের লেখা সকালের পঞ্চাননমঙ্গলের কাগজটা দেখাল। সদানন্দ ভটচাজ বিড়বিড় করে চারটে লাইন পড়লেন—

BanglaBook.org

নমিয়া প্রভুর পদ গুরুর চরণ।
পঞ্চানন দেব লীলা করি বিবরণ।।
ব্রহ্মা মেদিনী গড়ে, নারায়ণ পালে।
স্বর্গ ত্রেতা দ্বাপরের শেষে কলিকালে।।

তারপর বাকিটা না পড়ে পুচ করে মুখ দিয়ে অসম্মতির আওয়াজ করে কাগজটা কালাচাঁদকে ফেরত দিয়ে বললেন—'লেখাটা কোনোমতেই পঞ্চাননমঙ্গল না। বৃষ্টি আসছে, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।'

'কী ভাবে বুঝলেন?' কালাচাঁদ বলল।

পিছন থেকে বদন গম্ভীর গলায় বলল, 'চোদ্দশো সালের বাংলা ভাষা তো নিজের চোখেই এই পাথরে দেখছ। তোমার এই পাঁচালীর ভাষা সম্পূর্ণ অন্যরকম। মনে হচ্ছে আজকের ভাষা।'

'ভায়া,' সদানন্দ হতবাক হয়ে বলল, 'তোমায় দেখে ডালে ডালের লোক মনে হলে কি হবে, তোমার তো বুদ্ধি পাতায় পাতায় চলে দেখছি।'

কালাচাঁদ গর্বের সঙ্গে বলল, 'চন্দ্রবদনের মাথাটা খুব শার্প। এমন কোনো ধাঁধা নেই যা চন্দ্রবদন ভাঙতে পারে না।'

বদন বলল, 'বাঙালি জাতের সবচেয়ে বড়ো রহস্যের ধাঁধাটাই তো এখনও ভেঙে মানে উদ্ধার করতে পারলাম না।'

'সেটা আবার কোন্ ধাঁধা?' সদানন্দ এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

'মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের রহস্যজনক অন্তর্ধান,' বদন বলল।

'সেখানে আবার ধাঁধা কোথায়?' কালাচাঁদ বলল।

বদন বলল, 'বিশাল ধাঁধা। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্যকে খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং ওনার কথা খুব মানতেন। মহাপ্রভু যখন পুরীতে থাকতেন তখন একবার বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য নবদ্বীপ থেকে মহাপ্রভুর জন্য একটা ছোটো তরজা লিখে জগদানন্দ পণ্ডিতের হাত দিয়ে পাঠান। সেই হেঁয়ালি পাঠ করে মহাপ্রভু মৃদু হাসলেন, তারপর বললেন—'তার যেই আজ্ঞা', তারপর মৌনাবলম্বন করেছিলেন। আর তারপর শিগগিরই মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ভ্যানিশ।'

কালাচাঁদ বলল, 'কী লেখা ছিল ওই হেঁয়ালিতে?'

বদন বলল—

'বাউলকে কহিয় লোকে হইল আউল
বাউলকে কহিয় হাটে না বিকায় চাউল
বাউলকে কহিয় কাজে নাহিক আউল
বাউলকে কহিয় ইহা কহিয়াছে বাউল।।

BanglaBook.org

বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্যের হেঁয়ালিটা ভাঙতে পারছি না, কেন এটা পড়ে মহাপ্রভু ভ্যানিশ হয়ে গেলেন?'

সদানন্দ বললেন, 'এই পদ্যটা আমি আগেও শুনেছি। কিন্তু আমার মতে—'

কালাচাঁদ বুঝল এবার বদন পণ্ডিত আর সদানন্দ পণ্ডিতের মধ্যে তর্কযুদ্ধ শুরু হলে থামানো মুস্কিল হবে। কালাচাঁদ একটা ঠোঙা সদানন্দের হাতে দিয়ে বলল, 'কর্তামশাই, এটা রাখুন, এটার আর আমার দরকার নেই।'

'কী আছে এই ঠোঙায়?' সদানন্দ ঠোঙায় হাত ঢুকিয়ে অবাক। 'সে কিরে, বিশ হাজার টাকা তোর মায়ের অপারেশনের জন্যে নিলি এখন ফেরত দিচ্ছিস!'

'আমার এক মামা আরব থেকে এসেছেন, তিনি টাকাটা দিলেন, তাই আপনাকে ফেরত দিয়ে দিচ্ছি। গরিবের সংসার, টাকা আলেয়ার মতো দপ করে শেষ হয়ে যায়। তাই—'

সদানন্দ নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। কালাচাঁদ চোর তার টাকা ফেরত দিয়ে দিচ্ছে। কলিকালের হলোটা কী?

'টাকাটা গুনে নিন,' কালাচাঁদ নম্রভাবে বলল।

'তার দরকার নেই,' সদানন্দ ভটচাজ টাকাটা পাঞ্জাবির পকেটে ঢোকালেন। তারপর কালাচাঁদের ঘাড়ে হাত দিয়ে বললেন, 'লেগেছিল না রে?'

কালাচাঁদ হেসে বলল, 'কালাচাঁদ চোরের গণ্ডারের মতো মোটা গর্দান খসাতে গেলে এক হাতে হবে না। কর্তামশাই দু'টো হাত লাগবেই। আর তার বন্দোবস্তও করে রেখেছি। এই তেলের শিশিটা রাখুন কর্তামশাই। এটা কাপালিকের মহামাঁষ তেল। এই তেলটা দু'বেলা আপনার বাঁ হাতে ম্যাসাজ করালে আপনার হাতে এক সপ্তাহের মধ্যে সাড় আসতে শুরু করবে। ম্যাসাজের একটা কায়দা আছে। সেটা আমি বলে দেব।' কালাচাঁদ ভটভটি থেকে নেমে দোকান থেকে কেনা আমের আচারের তেলের শিশিটা সদানন্দের হাতে দিল। সদানন্দ তেলের শিশিসহ ডান হাত কালাচাঁদের মাথায় আশীর্বাদের ভঙ্গিতে রেখে বললেন, 'ভগবান তোর মঙ্গল করুন।' কালাচাঁদ দেখল বুড়োর চোখে চয়নবিল কানায় কানায় পূর্ণ।

'আর কাল থেকে তিনদিন আমি আর আমার এই দুই সাগরেদ আপনার বাড়িতে থাকব। শুধু একটা ঘর সাফ করে নেব। পাথরগুলো থেকে পঞ্চাননমঙ্গল একটু একটু করে উদ্ধার করতে হবে। অনেক বড়ো কাজ, দিন-রাত এক করে খাটতে হবে।'

'তুই—আমার বাড়িতে—'

'কর্তামশাই, আমি চুরি অনেকদিন হল ছেড়ে দিয়েছি, এখন সৎ পথে থাকার চেষ্টা করছি, শুধু আপনার আশীর্বাদ চাই, আর আমি যখন থাকছি, আপনাকে আমি রোজ নিজে তেল মাখিয়ে মাখিয়ে আপনার বাঁ-হাতটা আমি চালু করে দেব।'

'আরে না না আমি সে ভাবে বলিনি। থাকবি সেটা তো খুব আনন্দের কথা। তুই এখানে থাক, তোর খুশি মতো। আমারও একটু কথা বলার লোক হবে। দুলালটা কাল রাতে ওর বাপের সম্বন্ধে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখে আজ নাছোড়বান্দা, কাল সকালবেলা দেশে যাবে। এক সপ্তাহ পরে ফিরবে। অনেক বছর বেচারা বাপকে দেখে না। একলা ম্যানেজ করে নেব ঠিকই, তবে তোরা থাকলে ভালোই হয়। তাছাড়া, হারু বাবুর সঙ্গে কাব্য আলোচনা—'

'হরু বাবু, হারু বাবু না,' হরু ঠাকুর বলল।

'আরেকটা কথা,' কালাচাঁদ বলল। 'আপনার ডক্টর ধাড়া যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পান আমরা এখানে কী করছি।'

'ধাড়া সাহেবকে নিয়ে চিন্তা নেই, উনি বিহার থেকে দিন দুয়েকের আগে ফিরবেন না। ওকে নিয়ে চিন্তা করিস না, গুণী মানুষ—'

কালাচাঁদ রিক্সার লোকটাকে বলল, 'বৃষ্টি আসার আগে, কর্তামশাইকে বাড়ি নিয়ে যা। আমরা স্টেশনের দিকে হাঁটা লাগাই। কাল দেখা হবে কর্তামশাই।'

রিক্সা চলতে লাগল।

বদন বললে, 'এখানে থাকার কী দরকার?'

কালাচাঁদ বলল, 'শেখের ওই কসাইটার চোখে বারবার ধুলো দেওয়া সম্ভব না। ক'দিন একটু গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। তুমি তো গল্পের একটা প্লট পেয়েই গেছ—এবার একটু গুছিয়ে নামিয়ে দাও দেখি।'

হরু ঠাকুর বলল, 'আজকের দিনটা প্রায় শেষ হয়ে গেল। রইল বাকি চারদিন। প্রায় অসম্ভব কাজ মনে হচ্ছে। কইমাছ খেজুর গাছের মগডালে চড়ে তো গেছে এখন পুকুরে ফিরবে কী ভাবে সেটাই সমস্যা।'

BanglaBook.org

।। ষোলো ।।

পাঁচমুড়ো থেকে ফিরে সোজা নিউমার্কেট, সেখান থেকে বদনের বাড়ি হয়ে কালাচাঁদের বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল। তার কানাগলির মুখে বিশাল কালো বিলিতি দামি গাড়িটা দেখে কালাচাঁদের দুলাল নায়েবের উপমা মনে পড়ে গেল—ময়ূরপঙ্খি কি আর খালে চলে? তারপর হঠাৎ কালাচাঁদের মনে হল সত্যি তো ময়ূরপঙ্খি খালে কেন? গাড়িটার কালো কাঁচের ভিতরে দেখা যাচ্ছে না কে আছে। অস্বস্তি ঝেড়ে কালাচাঁদ তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা চালাল, আজ খুব ধকল গেছে।

বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে তালা খুলতে গিয়ে কালাচাঁদ দেখল তালাটা খোলা। তার চোরের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় টানটান হয়ে উঠল। আলো জ্বালিয়ে ভিতরে ঢুকে কালাচাঁদ দেখল তার ঘরের ভিতর যেন যুদ্ধ হয়ে গেছে। সারা ঘর কারা তছনছ করে গেছে—বিছানার চাদর, তোষক, বালিশ লন্ডভন্ড, দেওয়ালের ফটো ছিঁড়ে ফর্দাফাই, খাটের তলার ট্রাঙ্ক, রান্নাঘরের বাসন-কোসন কিছুই নিস্তার পায় নি। কেউ যেন কিছু খুঁজতে এসেছিল। বিস্মিত কালাচাঁদ কান খাড়া করে শুনল বাইরে যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে একটা গাড়ি এসে তার বাড়ির সামনে থামল। কালাচাঁদ দ্রুত ঘরের আলো নিভিয়ে জানলা দিয়ে দেখল—ময়ূরপঙ্খি খালে ঢুকে এসে একেবারে তার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

কালাচাঁদ অন্ধকারে চিতাবাঘের মতো ক্ষিপ্র পদক্ষেপে দরজার কাছে এসে ছিটকিনিটা লাগিয়ে কলঘরে ছুটে গেল। তাকে ধরতে এসেছে এরা। ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে শেখের লোকের চোখে ধুলো দেওয়াতে সে শেখের বিশ্বাস হারিয়েছে। উন্মাদ শেখের বিশ্বাস হারালে কী পরিণতি হয় সেটা সে নিজের চোখে দেখেছে। কলঘরের দেওয়ালের খালি চৌবাচ্চায় নামতেই কালাচাঁদ শুনতে পেল তার সদর দরজায় জোরে কেউ মুহুর্মুহু ঠেলা মারছে। পাড়ার পুরোনো ছিটকিনির মরচে ধরা পেরেক ওই ধাক্কা সহ্য করতে পারল না। কালাচাঁদ আওয়াজ পেল তার সদর দরজা আত্মসমর্পণ করে খুলে গেল। ঘরের ভিতরে অন্ধকারে ভারী পদক্ষেপের আওয়াজ। ঘরের আলো জ্বলে উঠল। পদক্ষেপ এবার দ্রুত কলঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। কালাচাঁদ চৌবাচ্চার নীচের দেওয়ালে চারটে ইঁট সরাতেই পিছনের নালার দিকের দেওয়াল উন্মুক্ত হল। কালাচাঁদ শরীরকে যতদূর সম্ভব সংকুচিত করে পিছনের দেওয়ালের ফোকর পথে সরীসৃপের মতো বাইরে বেরিয়ে এল। এদিকটা পয়ঃপ্রণালী নির্গমনের পথ, সারি সারি ড্রেন পিছনে খালে গিয়ে মিশেছে। প্রাণ ভয়ে কালাচাঁদ স্তূপীকৃত পলিথিনের প্যাকেট, ভাঙা বালতি, গাড়ির পরিত্যক্ত টায়ার ও অন্যান্য আবর্জনার মধ্যে দিয়ে ছুটে খালের দিকে নেমে গেল ; খালের গা দিয়ে উবু হয়ে কালাচাঁদ দ্রুত চলতে লাগল। কিছুটা এসে সামনে খালপুল। কালাচাঁদ পুলের কাছাকাছি পৌঁছে লক্ষ করল জোরালো টর্চের আলো খালের গায়ে এদিক-ওদিক ছুটছে। কালাচাঁদ এক ছুটে উপরে খালপুলে উঠে এল, সামনে একটা বাস আসছে। কালাচাঁদকে দেখে বাস ড্রাইভার বাসের গতি ধীর করল, কালাচাঁদ লাফিয়ে বাসে উঠতেই বাস আবার গতি বাড়াল। কালাচাঁদ পিছন ফিরে দেখল টর্চের আলোর মালিকরা খালপাড়ে তার বাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে—তারা বুঝে গেছে শিকার তাদের চোখে ধুলো দিয়ে

BanglaBook.org

পালিয়েছে। কালাচাঁদ ভাবল শয়তানগুলো ভাগ্যিস প্রথমেই বুদ্ধি করে সামনে পিছনে ভাগাভাগি করে পিছনে খালপাড়ে তাকে ধরার জন্য আগেই দাঁড়ায়নি, তাহলে এতক্ষণে কালাচাঁদ ময়ূরপঙ্খিতে। সে পালাবার পর এতক্ষণে বেটাদের খেয়াল হয়েছে, কালাচাঁদ ভাবল এজন্যই বোধহয় বলে চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। কালাচাঁদ পকেটে হাত ঢুকিয়ে বাস ভাড়ার খুচরো পয়সা বের করল—হরু ঠাকুর আর বদনকে নিয়ে আজ রাতেই গা ঢাকা দিতে হবে।

।। সতেরো ।।

'খুনিগুলোর চোখে ধুলো দিতে এই অজ গাঁয়ে অজ্ঞাতবাস।' হরু ঠাকুর বিড়বিড় করে নিজের ভাগ্যকে দোষ দিল।

'কি বিড়বিড় করছ?' কালাচাঁদ বলল।

'কপালে আর কী ভোগান্তি লেখা আছে কে জানে?' হরু ঠাকুর বলল। 'এখন পা চালা।'

পিঠে একটা পুরোনো রুকস্যাক ঝুলিয়ে কালাচাঁদ পাঁচমুড়োর জমিদারবাড়িতে ঢুকল, পিছনে পিছনে হরু ঠাকুর। 'কর্তামশাই, আমরা চলে এলাম।'

সদানন্দ ভটচাজ কালাচাঁদের তেলের শিশিটা খুলে গন্ধ শুঁকছিলেন সে দিকে তাকিয়ে কালাচাঁদ হাঁউমাঁউ করে উঠল, 'প্রায় হাফ শিশি তেল শেষ করে দিলেন? একবেলায় এতটা তেল হাতে মেখে ফেলেছেন?'

'শিশিটা রান্নাঘরে তাকের ওপর রেখেছিলাম। কাল রাতে ভাত কম ছিল, দুলাল এই তেল দিয়ে মেখে পেঁয়াজ কামড়ে কামড়ে এক জামবাটি মুড়ি সাঁটিয়ে দিল।'

'অ্যাঁ, মহামাঁষ তেল মেখে মুড়ি খেল। জ্যান্ত মানুষকে ফুটন্ত গরম তেলে ফেলে আগেকার দিনে—'

'দুলাল বলল—এটা আমের আচারের তেল।'

'আপনার দুলালের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'আর একটা কথা বলবি তো, তোকে গরম তেলে চুবিয়ে মহামাঁষ তেল বানাবো—' সদানন্দ ঠাণ্ডা মাথায় বললেন। 'আমার ঘরে খাটের নীচে ঠাকুরদার বাপের আমলের এক শিশি কাপালিকের মহামাঁষ রাখা আছে। তেলের পচা গন্ধে ভূত পালায়। ওটা বের করে আজ থেকে রোজ আমার হাতে দলাই-মলাই করবি, তোর মিথ্যা কথা বলার শাস্তি।'

কালাচাঁদ আঁতকে উঠল।

'তোদের জন্য পশ্চিমের ঘরটা সাফ করিয়ে রেখেছি। কার্বলিক অ্যাসিড

আছে শিশিতে একটু ঘরের আনাচে-কানাচে ছিটিয়ে নিস, তাহলে জানলা খোলা রেখে শুতে পারবি। ভাগ্নে বদন এল না?'

'বদন বিকালের ট্রেনে আসবে, সব কটা কবিতা ও টাইপ করিয়ে আনবে আপনার আর ধাড়াবাবুর জন্য,' হরু ঠাকুর বলল।

কালাচাঁদ বলল, 'কর্তামশাই, আপনার জন্য একটু কালাকাঁদ এনেছিলাম।'

কালাকাঁদের নাম শুনেই সদানন্দের চোখ চনমন করে উঠল, যেন লোভী শিয়ালকে মাংসখণ্ড দেখানো হল। নায়েবের কথা তাহলে মিথ্যে না। কিন্তু কালাচাঁদের হাতের দিকে তাকিয়ে সদানন্দ ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেলেন—'কোত্থেকে এনেছিস বাক্সটা?'

'আজ্ঞে, আপনার স্টেশন রোডের মিষ্টির দোকানটা—'

'ওই হারামজাদাটা তাহলে মিষ্টি বানানো এখনও ছাড়ে নি?'

'ঠিক বুঝলাম না,' কালাচাঁদ বলল।

'আমার জিভটা বড়ো স্পর্শকাতর, ইংরেজিতে যাকে বলে সেনসিটিভ, বুঝলি? উল্টোপাল্টা মিষ্টি মুখে দিলেই—; তোর মতো এক হতভাগা আমাকে এক বাক্স লাল চমচম দিয়ে গেছিল, লোভে পড়ে এক কামড় বসাতেই জিভটা লাল চাকা চাকা হয়ে অ্যালার্জিতে ফুলে গেল। মনে হচ্ছিল জিভে কেউ এক বাক্স লাল পিঁপড়ে ছেড়ে দিয়েছে। আমি শংকর মাছের চাবুকটা নিয়ে গেসলাম স্টেশন রোডে ওর দোকানে। কান ধরে উঠবস করে বলেছিল আর কক্ষনো মিষ্টি বানাবে না—ওটা নর্দমায় ফেলে দে। তোর নামের সঙ্গে মিল দিয়ে মিষ্টি এনেছিস বুঝি? হুঃ, যত্তোসব। মিছিমিছি আশা জাগাল।'

কালাচাঁদ বিড়বিড় করে বলল, 'ব্যাটা যেন চাতক পাখি—খাব তো বৃষ্টির জলই খাব, জল পিপাসায় মরে যাবে তবু আলফাল ডোবা-পুকুরের জল ঠোঁটে ছোঁয়াব না।' মনে মনে দুলাল নায়েবের গুষ্টির তুষ্টি করে ছাড়ল কালাচাঁদ। ব্যাটা পুরোটা খুলে বলবি তো? 'কর্তামশাই, আজ একটা বিশেষ উপকার করতে হবে,' কালাচাঁদ আদুরে আদুরে গলায় তার দ্বিতীয় অস্ত্রটা ছাড়ল।

'কী উপকারটা করতে হবে সেটা আগে শুনি।'

'কিলো তিন মতো হরিণের মাংস আছে। একটু আপনার রেফ্রিজারেটারে দিন তিনেকের জন্য রেখে দিতে হবে। আমরা যখন ফিরে যাব, মাংসটা নিয়ে যাব।'

'হরিণের মাংস।' কালাচাঁদ দেখল লোভ ফুটন্ত দুধের মতো কর্তামশাইয়ের মন থেকে চোখে উথলে পড়ল এবং তিনি মুখ ভর্তি থুথুটা গিলে ফেললেন। কালাচাঁদ ভাবল নায়েবের পিছনে এক পাঁইট আংরেজি সরাব বৃথা যায়নি।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, পাশের শিমুলগ্রামে নেমে এসেছিল এক দঙ্গল হরিণ। একটাকে

BanglaBook.org

মেরেছে ওরা। খবর পেয়েই গেলুম ছুটে। তাই তো আসতে দেরি হল। ততক্ষণে সব ভাগ বাটোয়ারা হয়ে গেছে। মোটে কিলো তিনেক কিনে আনতে পারলাম। আসল কথা কি কর্তামশাই, হরিণের মাংস খুব তাড়াতাড়ি শক্ত হয়ে যায় তাই—'

'রাজবংশের কোনো লোককে হরিণ নিয়ে জ্ঞান দিতে আসিস নে কালা,' সদানন্দ গম্ভীর গলায় বললেন—'হরিণের মাংস ছাড়া আগেকার দিনে রাজাদের মুখে কখনও আহারে রুচি হত না। পুরা মহানসম্হি দেবানং প্রিয়স প্রিয়দসিনো রাঞো অনুদিবসং বহূনি প্রাণসতসহস্রাণি আরভিসু সূপাথায়। সে অজ যদা অযং ধংমলিপী লিখিতা তী এব প্রাণা আরভরে সূপাথায় দ্বো মোরা একো মগো। সো পি মগো না ধুবো। এতে পি ত্রী প্রাণা পছা ন আরভিসরে।'

কালাচাঁদ চোখ বন্ধ করে দু'হাত জড়ো করে বুকের কাছে নিয়ে সদানন্দের কথা শুনছিল, শেষ হলে বলল, 'কর্তামশাই, এটা কোন্ ঠাকুরের মন্ত্র পড়লেন? আহা শুনে ভক্তিতে দু'চোখ বন্ধ হয়ে গেল।'

সদানন্দ ভটচাজ অবজ্ঞার স্বরে বললেন, 'সম্রাট অশোকের শিলালিপি। গির্ণার পর্বতে টু ফিফটি সিক্স বিসি-তে লেখা হয়েছিল।'

'ওটা কি সমসকৃত?' হরু ঠাকুর ভালো মানুষের মতো মুখ করে বলল। 'মানে তো কিছুই বুঝলাম না।'

'পালি—' সদানন্দ ভটচাজ বললেন। 'এর অর্থ পূর্বে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার রন্ধনশালায়, তাঁহার ব্যঞ্জন প্রস্তুতের জন্য, প্রত্যহ সহস্র প্রাণী হত্যা হইত। তবে সম্প্রতি, এই ধর্মলিপি লিখনের সময়, তিনটি মাত্র প্রাণীকে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করার জন্য নিহত করা হয়—দুইটি ময়ূর ও একটি মৃগ। সে মৃগও নিত্য নিহত হয় না। পশ্চাৎ আর এ তিনটি প্রাণীও হত্যা করা হইবে না—বুঝলি কিছু?'

'আপনার কত জ্ঞান কর্তামশাই,' কালাচাঁদ বলল। 'আপনিই বুঝিয়ে দ্যান।'

'হরিণের মাংস সম্রাট অশোকের এত প্রিয় ছিল যে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে প্রাণী হত্যা বন্ধ করেও হরিণ খাওয়া ছাড়তে পারেনি রাজা।' সদানন্দ ভটচাজ দুলালকে ডেকে তাড়াতাড়ি মাংসটা ফ্রিজে রাখতে পাঠিয়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'কষ্ট করে বাসি হরিণ খেলেও হরিণ তাঁর চাই-ই। কত কষ্ট হয়েছে সম্রাট অশোকের হরিণ খাওয়া ছাড়তে এ আমিই বুঝি।'

'কর্তামশাই বুঝি হরিণের মাংস খেতে খুব ভালোবাসেন?' কালাচাঁদ বলল।

সদানন্দ আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কিছু বলার আগেই হরু ঠাকুর বলল, 'আমাদের কালাচাঁদ কিন্তু ফাটাফাটি হরিণের মাংস রান্না করে, একবার তো আমার হাত চাটতে চাটতে হাতে কামড় পড়ে গেছিল।'

কালাচাঁদ বিনয়ে কুঁকড়ে গিয়ে বলল, 'একদিন যে আপনাকে বাড়িতে ডেকে

BanglaBook.org

হরিণের মাংস খাওয়াব তাঁর সৌভাগ্য কি আমার হবে? কোথায় আপনারা রাজা মহারাজা আর কোথায় আমি ইয়ে মানে বামুন পণ্ডিত। একসঙ্গে খাওয়ার যোগ্যতা কি আমার আছে?'

'এভাবে বলিস নে কালা,' সদানন্দ ভটচাজ নরম কণ্ঠে বললেন। 'আমার পূর্বপুরুষ রাজা ছিল, আমার কাছে রাজার ধন না থাকলেও বিশাল মন আছে। আজ রাতে আমরা একসঙ্গে খাব তোর এই হরিণের মাংস আর ভাত, জাম্পিস করে রান্না কর তো দেখি।'

'হরিণের মাংস রান্না করার অনেক হ্যাপা আছে, এ তো আর পাঁঠার মাংস না—' কালাচাঁদ বলল। 'বাজার থেকে কত কিছু কিনতে হবে কমলালেবু, রেওয়াজি পাঁঠা—'

'আরে কথা হচ্ছে হরিণের মাংস রান্না করার আর কিনতে হবে রেওয়াজি পাঁঠা! তোমার হল টা-কি কালাচাঁদ পণ্ডিত?' হরু ঠাকুর বলল।

'তাহলে রান্নাটা তোমরাই কর,' কালাচাঁদ উষ্মা প্রকাশ করে বলল। 'মাংসটাকে প্রথমে নরম করতে হবে। কমলালেবুর রসে কিছুটা নুন গুলে তাঁর মধ্যে হরিণটাকে কম করেও তিন ঘণ্টা চুবিয়ে রাখতে হবে। তাতে মাংস নরম হবে আর বোটকা গন্ধটা কেটে গিয়ে একটা সুন্দর গন্ধ আসবে। অসুবিধা থাকলে আজ থাক, আমি বরং আরেকদিন হরিণের মাংস নিয়ে এসে রান্না করে খাওয়াব।

'অসুবিধা? অসুবিধা কিসের? জমিদার বাড়িতে হরিণ রান্না হবে তাঁর জন্যে সব রকম অসুবিধা সহ্য করতে আমি রাজি।' সদানন্দ ভটচাজ যে আজ এ বাড়ি থেকে হরিণটাকে বেরোতে দেবে না, সেটা কালাচাঁদ বুঝে গেছে।

'কিন্তু রেওয়াজি পাঁঠা?' হরু ঠাকুর জিজ্ঞাসা করল।

'হরিণের মাংসে ভাঁজে ভাঁজে চর্বি থাকে, সেই চর্বি থেকে একটা বোটকা গন্ধ বেরিয়ে মাংসটাকে অখাদ্য করে তোলে, তাই চর্বিটাকে চেঁচে চেঁচে একদম বের দিতে হবে। অথচ বাকি মাংসটা রান্না করার জন্যে ফ্যাট লাগে। অনেকে মাখন, তেল এ সব দেয়, কিন্তু আমি রেওয়াজি পাঁঠার চর্বি কেটে ওতে দিই।'

সদানন্দ মুগ্ধ দৃষ্টিতে কালাচাঁদের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোকে বিশ্বাস করব কি করব না সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না—একদিকে আর্যভট্ট আওড়াচ্ছিস আবার অন্যদিকে জাল চণ্ডীদাসের পুঁথি বেচার ধান্ধা করছিস, এক হাতে আমার বিশ হাজার টাকা ফেরত দিচ্ছিস আবার অন্য হাতে জাল আমের আচারের তেল গছাচ্ছিস। আবার এখন হরিণ রান্না শেখাচ্ছিস, তুই ব্যাটা গভীর জলের মাছ।'

কালাচাঁদ বলল, 'হরিণের মাংস রান্না করার সময় শুকিয়ে গিয়ে শক্ত হয়ে গেলে মাংস ছিবড়া হয়ে যায়। এজন্য অল্প আঁচে ঢিমে তালে অনেকক্ষণ ধরে

রান্না করতে হয়, আর মাঝে মাঝেই ফলের রস দিয়ে ভেজাতে হয়। তারপর খাওয়ার মিনিট দশেক আগে ওটাকে রাংতা দিয়ে মুড়িয়ে রাখলে জুসটা উবে না গিয়ে মাংসে ছড়িয়ে যায়।'

'তোর কী ট্যালেন্ট!' সদানন্দ ভটচাজ বললেন। 'বেচারা হরিণটাই শুধু জানতে পারল না।'

দুলাল নায়েব ব্যাগ হাতে বেরোবার মুখে কালাচাঁদ বলল, 'মনে করে অতি অবশ্যই পেশোয়ারী দেরাদুন চাল আনবে। মোটা মুড়ির চালের ভাতে হরিণের মাংসের ঝোল ঢালা আর বাঁজা মেয়ের কোলে বাচ্চার নকশীকাঁথা উপহার দেওয়া একই ব্যাপার।'

সদানন্দ ভটচাজ থতমত খেয়ে বললেন, 'ঠিক।'

।। আঠারো ।।

'কর্তামশাই, যদি অভয় দ্যান ছোটো মুখে দু'টো বড়ো কথা বলবো?' কালাচাঁদ পেঁয়াজ কাটা হাতে চোখ মুছতে মুছতে বলল।

'ঝেড়ে কাশ কালা, তোর এই সব ভ্যানতাভা শুনলে মনে হয় কোনো মতলব আছে!' সদানন্দের মেজাজটা আজ হঠাৎ যেন ফুরফুরে হয়ে উঠেছে, দুলালকে পাঠিয়েছে বাজারে রেওয়াজি, পাঁঠার চর্বি, কমলালেবু আর কালাচাঁদ যা যা ফিরিস্তি দিয়েছে তা কিনতে। বহুদিন পর জমিদার বাড়ি হরিণ রান্নার গন্ধে ম-ম করবে।

'প্রথম কথাটা হল আপনার বাইরেটা রুক্ষু হলে কী হবে, অন্তরটা লিচুর কোয়ার মতো নরম। শংকর মাছের চাবুক-টাবুক বলেন বটে, কিন্তু সত্যি সত্যি মারতে পারবেন না, এত কোমল যার মন—'

'তেল না মেরে এবার দ্বিতীয় কথাটা বল,' সদানন্দ বললেন।

'থাক ওটা না-ই বা বললাম।'

'আরে বল বল।'

কালাচাঁদ বুঝল সদানন্দের কান প্রশংসার জন্য লালায়িত। 'লোকে বলে ভগবানকে ঠকাতে পারবে কিন্তু কর্তামশাইকে জাল পুঁথি দেখিয়ে ঠকাতে পারবে না, ত্যানার জহুরির চোখ।'

'যাঃ সত্যি? তাই বলে বুঝি?'

'মা-র দিব্যি,' কালাচাঁদ গলার নলি দু'আঙুলে ধরে দিব্যি কাটল। 'খুব শুনতে

BanglaBook.org

ইচ্ছা হয় যে কী ভাবে পুঁথি ধরে বুঝতে পারেন পুঁথিটা আসল না নকল? এতো যেন বদ্যি রোগীর কবজি ধরে বলে দিচ্ছে শরীরে রোগ আছে কি নেই?'

'সে সব তোমার কম্মো নয় কালাচাঁদ ভাই—' হরু ঠাকুর বলল। 'মেধা চাই। ইনি সম্রাট অশোক হরিণ খাবে না মুর্গি খাবে সেটাও আওড়ে দিলেন। আহা কী স্মৃতিশক্তি।'

সদানন্দ এক মুহূর্তের জন্য ভুরু কুঁচকে তাকালেন—'মুর্গি না, ময়ূর।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, কর্তামশাই, আপনার তুলনা হয় না।'

'আরে না না, তেমন কিছু নয়,' সদানন্দ গদগদ হয়ে বিনয়ীর কণ্ঠে বললেন। 'শিখিয়ে দিলে যে কেউ বলতে পারবে। প্রথমে দেখতে হয় কবেকার পুঁথি আর সেটা কিসের ওপর লেখা।'

কালাচাঁদ আর হরু ঠাকুর চোখ গোলগোল করে শুনতে লাগল। কোতোয়াল মাস্টার চোরেদের ইশকুলে প্রথম পাঠ পড়ানো শুরু করেছে। কালাচাঁদ ভাবল বদন এ সময়ে থাকলে ভালো হত, কিন্তু ওর কাঁধে যে অনেক বড়ো দায়িত্ব চাপিয়ে এসেছে কালাচাঁদ।

'গত বছর ধাড়া সাহেব বিদ্যাপতির তরুণ বয়সের একটা পুঁথি নিয়ে দেখাতে এল লন্ডন ফিরে যাওয়ার আগে। বিদ্যাপতির অরিজিনাল পুঁথি, বাজিতপুরে পাওয়া, প্রায় সোনার দামে কিনেছে ধাড়াসাহেব, এক বিশ্বস্ত এজেন্টের মাধ্যমে। আমি হাতে না ধরে শুধু দেখেই বলে দিলাম পুঁথিটা জাল।'

'কী ভাবে বুঝলেন ওটা জাল পুঁথি?' কালাচাঁদ বলল।

'পুঁথিটা একটা তুলট কাগজে লেখা,' সদানন্দ বললেন। 'বিদ্যাপতির জন্ম ১৩৫২ সালে আর মৃত্যু ১৪৪৮ সালে, আর কাগজ পূর্ব ভারতে এসেছে ১৪৫০ সালের পর। বিদ্যাপতির সব লেখাই তালিপতে মানে এক ধরনের তালপাতায়। ধাড়ার এজেন্ট ঠকিয়ে দিয়েছে ওকে। ওটা মিলের কাগজ, একদম পাতলা, মাড় দেওয়া, তাছাড়া কালি একদম হালকা। প্রাচীন পুঁথির কালি হবে মোটা আর জ্বলজ্বলে।'

'আরিব্বাপস,' কালাচাঁদ বলল।

সদানন্দ অনেক দিন পর শ্রোতা পাওয়ায় যেন তার মুখে কথার ফুলঝুরি ছুটছে। 'বাংলা ভাষায় সবচেয়ে পুরোনো কাগজের পুঁথিটা লেখা হয়েছিল চোদ্দশো চার সালে। যদিও কাগজ এদেশে এসে গেছিল এগারো শতকে, কিন্তু সংস্কৃত পণ্ডিতরা কাগজকে ভালো চোখে দেখে নি কেননা কাগজ এনেছিল মুসলমানেরা। পণ্ডিতরা বলত ম্লেচ্ছদের বস্তুতে হিন্দু ঠাকুর দেবতার নাম লিখব না। তখন তালপাতাকে পবিত্র মানা হত, তালপাতা শুদ্ধভাবে দুধে কিংবা জলে ফুটিয়ে তাঁর ওপর শলাকা দিয়ে লেখা হত। আর তাছাড়া কাগজ শব্দটা বেদ-উপনিষদে

BanglaBook.org

ছিল না, তাই সংস্কৃত সাহিত্য কাগজে লিখতে একটু দেরি হয়েছে। ১৪০০-১৫০০ সালে বাংলায় মুসলমান শাসন চলছে, হিন্দুদের অনেক পুঁথি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখন মুসলমান প্রভাবেই মূলতঃ কাগজে লেখা শুরু হল।'

'এ তো গল্পের মতো শোনাচ্ছে,' কালাচাঁদ বলল।

'ব্যাপারটা ধরা কিন্তু খুব সহজ,' সদানন্দ বললেন। 'যেমন কেউ যদি অশোকের ময়ূর আর হরিণের অনুশাসনের একটা তালপাতার পুঁথি আমার কাছে নিয়ে আসে, আমি চোখ বন্ধ করে বলে দেব ওটা জাল কেননা সম্রাট অশোক ছিলেন খ্রিষ্ট পূর্ব তিনশো চার থেকে খ্রিষ্ট পূর্ব দুশো বত্রিশ পর্যন্ত, আর তালপাতার পুঁথি এদেশে আবিষ্কার হয়েছিল তাঁর অনেক অনেক পরে।'

দুলাল সাইকেলের সামনের বাস্কেটে মালপত্র চাপিয়ে বাজার থেকে চটপট ফিরে এলো। কমলালেবুগুলো শুকনো শুকনো তা বেশি পায়নি, তাই বুদ্ধি করে সঙ্গে একটা বাতাবিলেবু নিয়ে এসেছে। কালাচাঁদ দেখে বলল—'জাম্বুরা, ওতেই হবে।' কিন্তু রেওয়াজি খাসি পায় নি, একটা পাঁঠার পিছনের ঠ্যাং থেকে চর্বি নিয়ে এসেছে। তাই দেখে কালাচাঁদ গুঁইগাঁই করতে লাগল।

দুলাল বলল, 'রেওয়াজি খাসি ইদ্‌টিদের পরব থাকলে তবে কাটা হয়। আগে থেকে বলে রেখ, পরের বার তোমাকে রেওয়াজির চর্বি এনে দেব। অনেক কষ্টে দেরাদুন রাইস পেলাম। তবে পেঁশোয়ারী কিনা জানিনে। বড় হ্যাঙ্গাম তোমার বাপু'—দুলাল তাড়াতাড়ি রাজাদের ব্যাগ রান্নাঘরে রাখতে চলে গেল, ওর বাড়ি যাওয়ার তাড়া।

BanglaBook.org

'গোবিন্দদাস কোবরেজের পুঁথি এনে দেখালে আপনি বুঝতে পারবেন ওটা গোবিন্দদাসের কিনা?' হরু ঠাকুর তার সদ্যপ্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধে আগ্রহ দেখাল।

'গোবিন্দদাস কবিরাজের পুঁথি জাল কিনা বোঝা খুব সোজা,' সদানন্দ বললেন। 'গোবিন্দদাস কবিরাজ হলেন অলঙ্কারের রাজা। বাংলা সাহিত্যে ওনার মতো অলঙ্কার কেউ লেখেন নি। যদি উপমা কালিদাসস্য হয় তবে উৎপ্রেক্ষা হল গোবিন্দদাসস্য। অর্থশ্লেষ, রূপক, কাব্যলিঙ্গ, অতিশয়োক্তি, বিষম, সন্দেহ, সূক্ষ্ম , মীলিত, লুপ্তোৎপ্রেক্ষ এ সব অলঙ্কারের ভিড় যদি কাব্যে না থাকে আমি চোখ বুঁজে বলে দেব যে সেই কাব্যের কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ না। অলঙ্কারহীন গোবিন্দদাস মানে জলবিহীন নদী। পাকা কীর্তনীয়ার মৃদঙ্গে গোবিন্দদাসের গৌরচন্দ্রিকার গানের ছন্দ, পদবিন্যাস আর অলঙ্কার যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। আহা কতদিন শুনি না।' সদানন্দ গুনগুন করে গেয়ে উঠলেন—'যো তুহুঁ হৃদয়ে

প্রেমতরু রোপলি শ্যাম জলদরদ আশে।' তারপর হরু ঠাকুরের ছানাবড়া চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রূপক-মূলক কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার।'

হরু ঠাকুরের চোখের দিকে তাকিয়ে কালাচাঁদের মনে হল যে সে বড় বাঁচা বেঁচে গেছে। গোবিন্দদাসের জাল পুঁথিটা এনে কর্তামশাইকে দেখালে এ বাড়িতে নির্ঘাৎ খুনোখুনি হয়ে যেত।

* *

হরিণের মাংসটা বাতাবিলেবুর রসে মজিয়ে, হাত-টাত ধুয়ে কালাচাঁদ ঘরে এসে বলল, 'মাংসটা এখনও গরম। দারুণ টেস্ট হবে।' হরু ঠাকুরের মুখ দেখে কালাচাঁদের মনে হল লোকটা যেন বুঝে পাচ্ছে না কাল বিকালে নিউ মার্কেট কেনা হরিণের মাংস যেটা সারারাত বদনের বাড়িতে ফ্রিজে ছিল সেটা গরম কী ভাবে হয়ে গেল। মিথ্যে কথা বলার একটা সীমা থাকা উচিত। কালাচাঁদের একটা বড়ো গুণ যে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ বুঝতে পারবে না যে তাঁর হৃদপিণ্ডটা ভয়ের চোটে ডাঙায় কাতলা মাছের মুখের মতো খাবি খাচ্ছে। কালাচাঁদ জানে সদানন্দ যদি ঘুণাক্ষরেও টের পায় তারা কী উদ্দেশ্য নিয়ে এ সব করছে তবে হরিণের বদলে তাঁর মুণ্ডুটা চিবিয়ে খাবে।

'বাব্বা, কর্তামশাইয়ের সাল-তারিখ একেবারে মগজে ছেপে রয়েছে, রেডিওতে খবর পড়ার মতো গড়গড় করে বলে গেলেন—' কালাচাঁদ বলল।

'তালপাতার পুঁথি হাতে নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিলাম, দাঁড়া তোদের একটা জিনিস দ্যাখাই—' সদানন্দ ভটচাজ লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে ধীরে ধীরে ভিতরের ঘরে গেলেন।

কালাচাঁদ বলল, 'হরু ঠাকুর, কী বুঝছ?'

হরু ঠাকুর বলল, 'বিদ্যাপতি, তালপাতা, হরিণের মাংস, গোবিন্দদাস সব মাথায় গোল পাকিয়ে গেল। আমার ভরসায় থাকিস নে কালা, তুইও মন দিয়ে শোন।'

সদানন্দ দু'টো তালপাতার পুঁথি ডান বগলে চেপে লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে ঢুকলেন—এই দু'টো পুঁথিকেই লোক তালপাতার পুঁথি বলে। কিন্তু এটা হল তেডেল আর এটা তালিপত।'

'দু'টোই তো একইরকম লাগছে।' কালাচাঁদ বলল।

'তেডেল ফল হয় না, একটু ছোটো ঝাড় মতো পাম গাছ। আর তালগাছ তো জানিস, তাল হয়, তাড়ি হয়,' সদানন্দ ভালো ভাবে তেডেলের পুঁথিটা উলটে পালটে দেখল। তেডেলের পাতা হল পাতলা আর প্রায় আড়াই তিন ইঞ্চি চওড়া, আর তালিপতের চওড়া খুব কম—দেড় ইঞ্চির থেকে একটু বেশি

হয়। তেডেল পাতাটা লক্ষ করে দ্যাখ অনেক শিরা-উপশিরা দেখতে পাবি, আর তালপাতাটা দ্যাখ—একটু গর্ত গর্ত মতো হয়। আমাদের পুরোনো পুঁথিগুলো সব তেডেলের, তালগাছ এদেশে অনেক পরে এসেছে। প্রায় ষোলশো সালের দু'এক বছর আগে প্রথম তালপাতার পুঁথি দেখা যায়, তার আগে সব তেডেল।'

কালাচাঁদ বলল, 'তার মানে পঞ্চাননমঙ্গল যদি চোদ্দশো সালে হারিয়ে গিয়ে থাকে, তবে ওটা তেডেলে লেখা হবে। কাগজে বা তালপাতায় লেখা পঞ্চাননমঙ্গল চোদ্দশো সালে কিছুতেই হতে পারে না। ওটা নকল পুঁথি।'

সদানন্দ বললেন, 'ঠিক।'

কালাচাঁদ চিন্তিত মুখে রান্নাঘরে ঢুকল—হরু ঠাকুরের স্টকে কি তেডেল আছে?

'কর্তামশাই, এই যে পাথরের লেখাগুলো চয়নবিল থেকে বেরল, এগুলো কি সম্রাট অশোকেরও আগেকার?' কালাচাঁদ একদম ভালো মানুষের মতো মুখ করে বলল। একটু আগে কালাচাঁদ হরিণের মাংস অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে চড়িয়ে, ঢাকা দিয়ে আঁচ ঢিমে করে সদানন্দের পায়ের কাছে এসে বসেছে।

'দূর বোকা, সম্রাট অশোকের সময় বাংলা ভাষার জন্মই হয়নি। বাংলা এল তো আরও এক হাজার বছর পর। কিন্তু তখনকার বাংলা এখনকার বাংলা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।'

'আলাদা? বলেন কি?' কালাচাঁদ বলল।

'অষ্টম শতাব্দীতে লেখা চর্যাপদ থেকে কয়েকটা লাইন শোনাই তাহলে নিজেরাই বুঝতে পারবি, এটা পটমঞ্জরী রাগে লেখা—

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।।
দীট করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান।।

'এটা বাংলা?' কালাচাঁদ বলল। 'মানেই তো বোঝা গেল না।'

'তখনকার বাংলা এরকম ছিল। এই কবির পদকর্তা লুই হল সিদ্ধাচার্য লুইপাদ, তিনি রাঢ় দেশের লোক ছিলেন। কাআ মানে কায় বা দেহ। চীএ মানে চিত্তে—'

'একটা জিনিস লক্ষ করলেন কর্তামশাই—' হরু ঠাকুর উত্তেজিত হয়ে কথার মধ্যে কথা বলল। 'কবেকার এই লেখা, তখনও বাংলা ভালো ভাবে জন্ম নেয় নি, কিন্তু বাঙালির রক্তে অন্ত্যমিল চলে এসেছে। ডাল/কাল, পরিমাণ/জান, সংস্কৃতে তো অন্ত্যমিল ছিল না, বাঙালি মিলটা কোথা থেকে পেল?'

BanglaBook.org

'এটা ভালো লক্ষ করেছ হরুবাবু—' সদানন্দ বললেন। 'এটা বাঙালির নিজস্বতা। যা বলছিলাম, পুঁথির ভাষাটা যুগের সঙ্গে মিলতে হবে—' সদানন্দ বললেন।

'তার মানে?' কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করল।

'বাংলা ভাষার শব্দগুলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পালটেছে। যেমন আজ আমরা মেঘ বলি, এক হাজার বছর আগে সেটাকে মেহা বলত। আজ আমরা 'গগন' বলি, ওরা 'গঅন' বলত।'

'আচ্ছা? খুব মিষ্টি শুনতে তো,' কালাচাঁদ মজা পেল।

'হ্যাঁ, তখন ভাষাটা অবহঠট ছিল—

দেসিল বসনা সবজন মিঠটা।
তেঁ তইসন জল্পও অবহঠটা।।

—সত্যি খুব মিষ্টি ভাষা। সুললিত সংস্কৃত ও মৈথিল মিশিয়ে তাঁর থেকে যতদূর সম্ভব যুক্তাক্ষর ছেঁটে মাগধী-প্রাকৃত কবিতার ভাষা হল মিঠা অবহঠটা। অবহঠট অবশ্য কথ্য ভাষা, তখন বই-টই লেখা হত সংস্কৃতে।'

'কর্তামশাই, লোকে বলে আপনি নাকি পুঁথি পড়ে বলে দিতে পারেন ওটা কবেকার পুঁথি?' কালাচাঁদ বলল।

সদানন্দ ভটচাজ বললেন, 'অতটা এক্সপার্ট হই নি এখনও, তবে কবিরা সাধারণত তাদের পৃষ্ঠপোষক রাজাদের নাম-ধাম লিখে রাখত পুঁথিতে রাজাদের খুশি রাখার জন্যে। যেমন বিদ্যাপতি পড়লে দেখতে পাবি—

বেকতেও চোরি গুপুতকর কতিযন বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
মহলন যুগপতি চিরে জীব জীবধু গ্যাসদেব সুলতান।।

গ্যাসদেব মানে গিয়াসুদ্দিন সুলতান। ইনি মিথিলার সুলতান ছিলেন ১৩৬৭ সাল থেকে ১৩৭৩ সাল পর্যন্ত। এসব দেখে আন্দাজ করা যায় বিদ্যাপতির অরিজিনাল পুঁথি কোন্ সময়কার হবে। এ তো একটা উদাহরণ দিলাম, যদিও আমরা সকলেই জানি বিদ্যাপতির কবে মৃত্যু হয়েছে। দুঃখের কথা বাঙালি আদি কবি চণ্ডীদাসের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ ঠিকমতো পাওয়া যায় না। তবে একটা গল্প আছে যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস দু'জনে দু'জনকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। একবার বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সঙ্গে দেখা করতে গেছিলেন। চণ্ডীদাস যখন শুনলেন বিদ্যাপতি আসছেন তখন তিনি পথে নেমে এগিয়ে আসতে থাকেন। দু'জনে দামোদর তীরে দেখা হয়। বোঝা যায় যে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক ছিলেন এবং দু'জনেই শ্রীচৈতন্য পূর্ববর্তী ছিলেন। তুই যে জাল চণ্ডীদাসের পুঁথিটা নিয়ে এসেছিলি সেটার লেখককে হাতের কাছে পেলে শংকর মাছের চাবুক পেটা করতাম। আরে ইতিহাস বিকৃত করে দিয়েছে একেবারে। চিদানন্দের লোকজন আর কত ভালো হবে।'

BanglaBook.org

দেওয়ালে ঝোলানো শংকর মাছের চাবুকটার দিকে চেয়ে হরু ঠাকুর ঢোক গিলে বলল, 'আপনার মতে কে ভালো লিখতেন দু'জনের মধ্যে?'

সদানন্দ ভটচাজ বললেন, 'দু'জনে দু'রকম স্টাইলে লিখতেন। যদিও দু'জনেরই লেখার নায়ক শ্রীকৃষ্ণ আর নায়িকা শ্রীরাধা। বিদ্যাপতির ভাষার অলঙ্কার আহা—আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। কিন্তু চণ্ডীদাসের ভাষা একদম সাদাসিধা বাঙালির মনের ভাষা—

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ
বঁধু কি আর বলিব আমি

মরণে জীবনে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি। আহা কী অপূর্ব গন্ধ।'

'কর্তামশাই, কানের ভিতর দিয়ে তো শব্দ যায়, গন্ধ আসছে এখানে কোত্থেকে?' কালাচাঁদ বলল।

'ইডিয়েট, হরিণের মাংসের গন্ধটার কথা বলছি। খাসা বাস আসছে রে। কালা, মাঝে মাঝে আসবি তো আমার এখানে। কলানৈপুণ্যে, পদবিন্যাসের ব্যাপারে বিদ্যাপতি খুব খুঁতখুঁতে ছিলেন যেমন তুই হরিণ রান্নার ব্যাপারে খুঁতখুঁতে—রেওয়াজি পাঠার চর্বিতে হরিণের মাংস রাঁধবি, বিদ্যাপতি তেমন অলঙ্কারের মাস্টার—

সারঙ্গ নয়ন বচন পুন সারঙ্গ তনু মধুপানে।
সারঙ্গ উপর উগল দশ সারঙ্গ কেলি করথি মধুপানে॥'

যে ভাবে কথাবার্তা বিদ্যাপতি-হরিণ-চণ্ডীদাসে যাওয়া আসা করছে তাতে কোনটা যে কে গুলিয়ে যাচ্ছে কালাচাঁদের। সে বলল, 'মানেটা কী দাঁড়াল কর্তামশাই।'

'সারঙ্গ মানে হরিণ, আবার সারঙ্গ মানে পদ্মফুল, সারঙ্গ মানে ভ্রমর, কোকিল আবার মদন। নিজে সাজিয়ে নে কোনটা কোথায় বসবে, অত খুচরো করতে পারব না।'

॥ উনিশ ॥

সন্ধ্যার ট্রেনে বদন এল, মুখ চোখে ক্লান্তির ছাপ, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ভিতরে ভিতরে খুব উত্তেজিত।

'কিছু পেলি?' হরু ঠাকুর ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল।

বদন বলল, 'ধাড়া একটা স্মাগলার। প্রাচীন গোল্ড কয়েন আরবে পাচার করতে গিয়ে তিন বছর আগে একবার ধরা পড়ে ওর জেল হয়।'

BanglaBook.org

'তুই এত সব কী ভাবে জানলি?' হরু ঠাকুর জিজ্ঞাসা করল। বদন উত্তর দেওয়ার আগেই ঘরে ঢুকল সদানন্দ ভটচাজ—'এই যে স্যার চন্দ্রবদন, এসে গেছ, গুড। তুমি না থাকলে কেমন যেন অমাবস্যা অমাবস্যা লাগে।'

বদন অন্যমনস্ক হয়ে বলল—'কিছু কাজ ছিল আর ট্রেন লেট ছিল।'

কিছুক্ষণের মধ্যে অতিকায় কাঁসার থালায় থালায় ভাত বাড়া হল, কাঁসার বাটিতে তেল জবজবে হরিণের মাংস। সদানন্দ আতিথেয়তার পরাকাষ্ঠা হয়ে অতিথিদের সঙ্গে মাটিতে বসতে যাচ্ছিলেন কিন্তু শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্যে তাকে টেবিলেই বসতে হল।

হরিণের মাংসটা রঙে-গন্ধে জিভে যেন জোয়ার নিয়ে আসে। তবু কালাচাঁদ খুঁতখুঁতানি দেখাতে আঙ্গুলের ডগায় হাতা থেকে এক ফোঁটা ঝোল জিভে টকাস করে লাগিয়ে বলল, 'রেওয়াজি পাঁঠার চর্বি দিলে ঝোলে আরও স্বাদ আসত।'

মাংসের একটা বড়োসড়ো পিস মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দাঁত দিয়ে চাপ দিয়েই সদানন্দের চোখের পাতা আবেশে বুজে এল। চোখের পাতা যখন খুলল তখন সদানন্দের চোখ ভরা জল—'বাবার কথা মনে পড়ে গেল, বাবা নিউ মার্কেট থেকে হরিণ আনাত, ঠিক এরকম টেস্ট। লোকটা হরিণ খেতে খুব ভালোবাসত।'

নিউ মার্কেট শুনে কালাচাঁদের গলায় যেন মাংসের দলা আটকে গেল।

'আপনার বাবাকে খুব ভালোবাসতেন, তাই না?' হরু ঠাকুর বলল।

দেওয়ালে একটা বিশাল অয়েল পেন্টিং দেখিয়ে সদানন্দ প্রণাম করে বললেন, 'আমার ভগবান। এনার ক্যারেক্টারে একটু খাদ ছিল তা মানি। কিন্তু পুঁথি দেখা যা কিছু শিখেছি এনার থেকেই। নিজে হাতে ধরে আমাকে আর চিদেকে শেখাতেন দেবপাড়া বিজয় সেনের লিপির 'খ' এর বাম ভাগ যেখানে দক্ষিণে যুক্ত হয়েছে, সেই স্থানে বাম ভাগের নীচের অংশটা গোলাকৃতি, কমৌলির তাম্রশাসনে প্রাচীন 'ঘ' এর বামদিকের নীচটা একটু উপরে উঠে তবে ডানদিকের দাঁড়ার নীচের সঙ্গে যোগ হয়েছে। লোকটা যদি আজ এই হরিণ খেতে পেত, কী খুশি না হত।'

কালাচাঁদ এতক্ষণে বুঝল কর্তামশাই চোখে লেন্স দিয়ে পুঁথি কেন পড়ে। খ, ঘ এদের টিকি-ন্যাজ এসব যতটা ট্যারা-বাঁকা হওয়া উচিত ততটা হয়েছে কিনা সে সব চেক করে। হরু ঠাকুরকে খুব চিন্তামগ্ন লাগল।

সদানন্দ ভটচাজ বললেন, 'আমি নকল পুঁথি হাতে নিলেই যেন বাবা ফিসফিস করে আমার কানে বলে—সদা, কালিটা কেমন পাতলা পাতলা লাগছে না? কিম্বা, সতেরোশো সালের বাংলায় চলিত ভাষা লিখেছে রে সদা। চিদের ওই গৌরচন্দ্রিকা ওটা তো বাবাই ধরিয়ে দিলেন।'

কালাচাঁদ বিড়বিড় করে বলল—মারিয়েছে। হরু ঠাকুরের অসহায় চোখের

ভাষা পড়তে পারল কালাচাঁদ, হরু ঠাকুর যেন বলছে—'এ বুড়োর কাছে নকল পুঁথি দেখানো মানে সূর্যের দিকে তাকিয়ে চোখ রাঙানো—চোখ পুড়িয়ে দেবে। অসম্ভব।'

কালাচাঁদ বুঝে গেল এই রাজা হরিশ্চন্দ্রকে ধাড়ার থেকে আলাদা না করতে পারলে সে নিশ্চিত জানে মারা পড়বে। কালাচাঁদ বুঝল আর সময় নষ্ট করা ঠিক নয়, বিশাল ঝুঁকি নিয়ে বোমাটা ফাটাল—'কর্তামশাই, আপনার ধাড়া লোকটা আমার মতোই একটা চোর। আমার সঙ্গে ওর ফারাক এই যে আমি গরিবগুরবো আর ও বড়োলোক। ধাড়া বিলেতে আমাদের দেশের পুঁথিগুলো বেচে দেয়। ও আসলে একটা জেল খাটা স্মাগলার।'

সদানন্দের চর্বণ তৎক্ষণাৎ থেমে গেল, কালাচাঁদ দেখল সদানন্দের চোখের মণি দু'টোতে দপ করে মশাল জ্বলে উঠল। কালাচাঁদের যে এত বড়ো স্পর্ধা হতে পারে, এটা বিশ্বাস করতে তার একটু সময় লাগল। ঘরে এক মুহূর্তে প্রাক ঝড়ের থমথমে নীরবতা জাঁকিয়ে বসল। সদানন্দ রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঝোলভাতের থালাটা চাকতির মতো দেওয়ালে ছুড়ে মারলেন। ভাত, ঝোল, মাংস সব চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেল। তারপর এক হাতে ভারী টেবিলটার একটা কোনা ধরে রাগে তুলে ধরলেন আর সমস্ত বাসন-কোসন সমেত হরিণের মাংস ঝোল সব মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। ঘৃণায় থু থু করে মুখের লালায় জারিত অর্ধভুক্ত মাংসখণ্ড মাটিতে উগরে করে হাঁপাতে লাগলেন, কপালের রগগুলো ফুলে যেন বটগাছের শিকড়।

বদন বলল, 'আপনার ডাক্তার বাড়ি তিন বছর আগে সুলতানা রাজিয়ার নামাঙ্কিত এক বাক্স সোনার মোহর আরবে পাচার করার সময় দিল্লি এয়ারপোর্টে ধরা পড়ে, তাতে তাঁর এক বছরের জেল হয়।' বদন সদানন্দ ভটচাজের সামনে একটা *হিন্দুস্থান টাইমস*-এর ফটোকপি খুলে দিল।

সদানন্দ কাগজটা না দেখে মুড়িয়ে মাটিতে ফেলে তাতে পদাঘাত করলেন—'বেরিয়ে যা, এক্ষুনি তোরা তিন ঠগ বেরিয়ে যা, নতুবা গুলি করব। একশো বছর আগেও এই জমিদার বাড়ির বৈঠকখানায় কেউ এই স্পর্ধা দেখালে তার জিভ কেটে গুমঘরে তার লাশ গুম করে ফেলা হত। এখন বুঝতে পারছি কালাচাঁদ চোর কেন টাকা ফেরত দিয়ে দিল। আরও বড়ো কিছু বাগাবার ধান্ধা।'

বদন মাটি থেকে দুমড়ানো কাগজটা তুলে আবার খুলতে খুলতে রাগত কণ্ঠে বলল, 'দু'দিন ব্যবসাপত্তর ফেলে রেখে খাটতে হয়েছে এটা জোগাড় করতে। আমাদের দেশের অ্যান্টিকুইটিস অ্যান্ড আর্ট ট্রেজার্স অ্যাক্ট, ১৯৭২ অনুযায়ী তারাই শুধু পুরাতত্ত্বের মূর্তি, কয়েন ইত্যাদি বিদেশে বিক্রি করতে পারে যারা আর্কিওলজি-

ক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ায় রেজিস্টার্ড। আপনার ড. অংশুমান ধাড়ার নাম আর্কিও-লজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ায় রেজিস্টার্ড কোম্পানির মালিকের লিস্টে নেই।'

'গেট আউট!' সদানন্দের বাঁ হাত-পা বাদে সর্বাঙ্গ কাঁপছে। 'একটা গুণী মানুষের গায়ে কাদা ছেটাচ্ছিস, তাও আবার আমার ঘরে বসে? আমাকে শেখাচ্ছিস কে চোর আর কে সাধু?'

বদন নির্বিকার স্বরে বলল, 'আমাদের দেশে একটা বিরাট চক্র কোটি কোটি টাকার মূল্যবান পুরাতত্ত্ব সামগ্রী বিদেশে পাচার করে—অংশুমান ধাড়া এই চক্রের একটা বড়ো চাঁই। যদি আপনার পাথরগুলো সত্যি অত পুরোনো হয়, তবে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ায় আপনার খবর দেওয়া উচিত ছিল, আপনি তা না করে নিজে কিছু টাকা কামাবার জন্যে ধাড়াকে এগুলো বিক্রি করছিলেন আর ধাড়া এগুলো বিদেশে পাচার করে দিত। তিরিশ বছর তো পাঁচমুড়ো ছেড়ে বাইরের দুনিয়ায় পা দেন নি, না পড়েন খবরের কাগজ, না দেখেন টিভি—তাই আপনাকে ঠকাতে খুব বেশি কষ্ট করতে হয় না। ধাড়া লন্ডনে থাকে না টালা পার্কের কাছে থাকে তা আপনি জানবেন কী ভাবে?'

'আচ্ছা, তাই নাকি? তাহলে এই কার্ড? ধাড়ার মিউজিয়াম?' সদানন্দ এঁটো হাতে টেবিলের ড্রয়ার খুলে ধাড়ার কার্ডটা বের করলেন—

ডক্টর অংশুমান ধাড়া,
ধাড়া গ্যালারী অব ওরিয়েন্টাল আরকিওলজি,
গ্রেট রাসেল স্ট্রিট, লন্ডন, ডব্লুসিওয়ানবি থ্রীডিজি,
ইউনাইটেড কিংডম

'এবার নিশ্চয়ই বলবে যে এই ঠিকানাটাও মিথ্যা!' সদানন্দ বললেন। 'বলবে ওখানে কোনো মিউজিয়াম নেই—'

বদন বলল, 'ঠিকানাটা মিথ্যে নয়, এই ঠিকানায় মিউজিয়াম আছে এটাও সত্যি। পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা মিউজিয়াম সেটা—ব্রিটিশ মিউজিয়াম। এই নিন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ওয়েবসাইটের একটা প্রিন্ট আউট। ওর কার্ডে ঠিকানাটা দেখে ইন্টারনেটে মেলাতে গিয়েই বুঝতে পারলাম গণ্ডগোলটা।' বদন স্বগতোক্তি করল— 'যতই টাকা হোক, ছিঁচকে চোর ছিঁচকেই থেকে যায়।'

সদানন্দ ভটচাজ এবার ওয়েবসাইটের প্রিন্ট আউটটা নিয়ে ভালো করে দেখে ধাড়ার কার্ডের ঠিকানার সঙ্গে মেলাল। তাঁর চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি।

'এবার এইগুলো দেখুন, আমার বন্ধু শম্ভু ফটোগ্রাফারকে ধাড়ার পিছনে লাগিয়েছিলাম—' বদন একগাদা রঙিন ফটো সদানন্দের সামনে রাখল। কালাচাঁদ দেখল ধাড়া আর চিদানন্দ একটা বাড়ির সামনে হাসি হাসি মুখে করমর্দন

BanglaBook.org

করছে। বদন বলল, 'আপনার ধাড়ার সঙ্গে চিদানন্দবাবুর এক সঙ্গে বেশ ওঠবস আছে। দু'জনে একদলের লোক।'

'চিদানন্দ? তবে ধাড়া যে বলল'—সদানন্দ হতভম্ব।

'আপনাদের ব্যক্তিগত সমস্যায় নাক গলাবার আমাদের কোনো ইচ্ছা নেই। সমস্যাটা হল আমরা মাঝখান থেকে ফেঁসে গেছি, দুই দিনের মধ্যে ধাড়ার হাতে পঞ্চাননমঙ্গল তুলে না দিতে পারলে ওরা এর গলা কেটে ফেলবে। এদের সামনে একটা খুন করেছে।'

'গলা কেটে ফেলবে? কে? কেন?' সদানন্দের ওপর একের পর এক বিস্ময় যেন পাহাড় হয়ে চেপে বসছে।

'কালা, কর্তামশাইকে সব খুলে বল—' হরু ঠাকুর বলল।

পরের পনেরো মিনিট কালাচাঁদ আরবের খুনিদের সব কথা বলল। তারপর ওদের দেওয়া ধাড়ার ফটোটা বের করে দেখাল—'কেন যে ওরা সবাই পঞ্চাননমঙ্গলের পিছনে পড়ে রয়েছে, শুধু তা বুঝতে পারছি না। পঞ্চাননমঙ্গল ওদের কাছে একটা হুমকি বলে মনে হচ্ছে।'

'এখন কোথা থেকে আমরা দু'দিনের মধ্যে পঞ্চাননমঙ্গল জোগাড় করব?' বদন বলল। 'তাই ঠিক করেছি আমরা একটা নকল পঞ্চাননমঙ্গল লিখব। আমরা জানি যে ধাড়া আপনাকে না দেখিয়ে পুঁথি কেনে না। তাই আমরা মরিয়া হয়ে এসেছি আপনার কাছে ছলচাতুরি করে শিখতে—কী ভাবে লিখলে আপনি নিজেই ধরতে পারবেন না যে পুঁথিটা জাল। যেমন ভাবে মহাভারতে কৃষ্ণ ভীষ্ম পিতামহের কাছ থেকে তাঁকে কী ভাবে বধ করা যায় তা শিখে শিখণ্ডীকে সামনে রেখে ভীষ্মকে বধ করেছিলেন।'

কালাচাঁদ সপ্রশংস দৃষ্টিতে বদনের দিকে তাকাল। সদানন্দ হাতের তালু দিয়ে কপাল টিপে চোখ ঢেকে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর যখন মাথা তুলল কালাচাঁদ দেখল এ এক অন্য সদানন্দ। চোখে ঘৃণা যেন ফেটে যাওয়া ক্ষতের পুঁজের মতো উথলে উঠছে। সদানন্দ লাঠিতে ভর করে ধীরে ধীরে পাশের ঘরে গেলেন, কালাচাঁদ তাড়াতাড়ি ভাতের হাঁড়ি ধড়া ন্যাকড়া দিয়ে, সারা ঘর থেকে ছড়ানো ভাত, মাংসগুলো কাঁচিয়ে তুলতে তুলতে দেখল সদানন্দ ঘরে এসে ঢুকলেন, হাতে একটা দোনলা বন্দুক। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—হারামজাদা ধাড়াকে গুলি করে মেরে পুঁতে ফেলব।'

বদন বলল, 'কেন ফালতু ফালতু তড়পে নিজের শরীরটাকে খারাপ করছেন, গুলি করতে গেলে দু'টো হাত লাগে—এক হাতে বন্দুকই ঠিক মতো তুলতে পারছেন না আর গুলি করবেন।'

BanglaBook.org

সদানন্দ বন্দুকটা ঘষটাতে ঘষটাতে চেয়ার পর্যন্ত এসে ধপ করে বসে পড়লেন—চোখে যেন কর্তিত মহীরুহের পরাজিত দৃষ্টি।

সদানন্দের অসহায় চোখের দিকে তাকিয়ে কালাচাঁদের বুকের ভিতর একটা পুরোনো জলছবি ভেসে উঠল—ট্যাক্সির পিছনের সিটে বাবাকে শুইয়ে রেখে নার্সিংহোমে কাকুতিমিনতি করেও কোনো লাভ না হওয়ায় কালাচাঁদ দৌড়ে ফিরে এসে বাবার কাত হয়ে যাওয়া মাথাটা সোজা করার সময় বাবা বলল—'পয়সা নেই বলে ভর্তি নিল না, তাই না?' বাবা বেঁচে থাকলে এই বুড়ো সদানন্দের বয়সীই হত। বুড়ো আধা-অথর্ব লোক তাকে ঠকাবার জন্য এত প্ল্যান, এত মিথ্যা কথা—হাতের ম্যাসাজের তেল—হরিণের মাংস—অন্তত লোকটার খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত ছিল।

কালাচাঁদ জলের গ্লাসটা টেবিল থেকে নিয়ে এসে সদানন্দের সামনে ধরল। সদানন্দ ঢকঢক করে জলটা শেষ করে গ্লাসটা কালাচাঁদের হাতে দিয়ে বললেন, 'তোর হরিণের মাংসের দামটা দিতে ভুলে গেছিরে কালা।'

মাত্র দু'ফোঁটা জলকে চোখের ভিতর আটকে রাখতে এত শক্তি লাগে তা কালাচাঁদের জানা ছিল না। চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'ছি ছি কর্তামশাই, মাংসের দাম আমি নিতে পারব না। আমার পাপ আর বাড়াবেন না।'

।। কুড়ি ।।

হরু ঠাকুর এবার সদানন্দের পাশে এসে শান্ত গলায় বলল—'কর্তামশাই, আমাদের বাংলায় একটা কথা আছে অসির চেয়ে মসী বড়ো। আমরা বন্দুক দিয়ে ধাড়াকে হারাতে না পারলে কী হবে, কলম দিয়ে ধাড়াকে সর্বস্বান্ত করে ছাড়ব। আপনার একটা হাত অকেজো হলে কী হবে আমরা তিনজনে ছ'টা হাতে আপনার জন্যে লড়ব। আপনি শুধু আমাদের একটু সাহায্য করুন আমরা শাস্ত্র দিয়ে শস্ত্রকে ধ্বংস করব।'

সদানন্দ কপাল ডান হাতের চেটোতে রেখে বলল, 'জানি না সবাই আমাকে কেন ঠকায়?'

হরু ঠাকুর নরম গলায় বলল, 'তবু তো আপনাকে ঠকে জেলে যেতে হয় নি, কর্তামশাই, আমাকে হয়েছে।'

সদানন্দ বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল হরু ঠাকুরের দিকে।

হরু ঠাকুর বলল, 'স্বাধীনতার ঠিক আগে সাহেবরা যখন সব বিলেতে ফিরে

BanglaBook.org

যেতে লাগল, আমার বস হেনরি সাহেবও ফিরে যাওয়ার জন্যে বাক্স-প্যাঁটরা বাঁধাছাঁদা করতে লাগলেন। আমি একদিন আবিষ্কার করলাম হেনরির ট্র্যাঙ্কে এশিয়াটিক সোসাইটির কয়েকটা পুঁথি। হেনরিকে জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেলাম—এগুলো ইংল্যান্ডের মিউজিয়ামে ভালো ভাবে রক্ষিত হবে, ইন্ডিয়ানরা এসবের মর্ম বুঝতে পারবে না। তাছাড়া এদেশে এখনো পুঁথি রক্ষা করার পদ্ধতিই রপ্ত হয়নি। ইংরেজ দেশ ছেড়ে চলে গেলে এই সব পুঁথি নষ্ট হয়ে যাবে। আমার গায়ে তখন যৌবনের তেজ। আমি বললাম আমাদের দেশের সম্পত্তি এ ভাবে বিদেশে পাচার হতে দেব না। হেনরির ঊর্ধ্বস্তন সাহেবের কাছে গিয়ে রিপোর্ট করলাম। সেই সাহেব আমাকে পুঁথি চুরির দায়ে পুলিসের হাতে তুলে দিল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম হেনরি দেশে ফিরে গেছে, পুঁথিগুলোও বেপাত্তা। সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—যতদিন বাঁচব এই লোভী সাহেবগুলোকে নকল পুঁথি লিখে লিখে আসল বলে বেচব। আজকাল সাহেবগুলো নিজেরা আসে না, ধাড়ার মতো এই দো-আঁশলাগুলোকে পাঠায়। আমি বলি—ঠিক আছে, গঙ্গা তো যাচ্ছে সাগরে, নকল পুঁথি কালাপানি পার হলেই হল।'

'আমাকে কী করতে হবে?' সদানন্দ বললেন।

হরু ঠাকুর বলল, 'এই কালাচাঁদের প্রাণ আপনার হাতে। একে আপনাকে বাঁচাতে হবে। আমাদের কাছে মাঝে মাত্র দু'টো দিন হাতে আছে।'

সদানন্দ বললেন, 'আমার কাছে তো পঞ্চাননমঙ্গল নেই। আমার কাছে তোমরা এসেছ কেন?'

'হরু ঠাকুর পঞ্চাননমঙ্গলের পুঁথি লিখবে, সেই পুঁথি আমরা ধাড়াকে বেচব, ধাড়া পুঁথি কেনার আগে আপনাকে দিয়ে যাচাই করিয়ে নেবে,' কালাচাঁদ বলল।

'আমি মিথ্যা কথা বলতে পারব না। নকল পুঁথিকে আমি কিছুতেই আসল পুঁথি বলতে পারব না। বলতে গেলে আমার জিভ কুষ্ঠরোগীর গায়ের মাংসের মতো খসে পড়বে।'

'আপনাকে মিথ্যা বলতে হবে না,' কালাচাঁদ বলল। 'আপনি শুধু ওর হয়ে পুঁথি যাচাই করবেন না।'

'সেটা বলবার কোনো দরকার নেই, আমি ওই হারামজাদাটার মুখদর্শন করব না।' সদানন্দ বললেন। 'কিন্তু ধাড়া আমাকে না পেলে চিদানন্দকে দিয়ে পুঁথি যাচাই করবে। চিদানন্দ তোমাদের নকল পুঁথি ধরে ফেলবে।'

'সেটা আমার কপাল,' কালাচাঁদ বলল। 'ধরা পড়ে গেলে আরবের শেখের ভাড়াটে গুণ্ডারা আমার গলাটা আড়াই প্যাঁচ করে কাটবে। আর যদি না ধরতে পারল তবে প্রাণটাও বাঁচবে আর ধাড়ার কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা উদ্ধার করা যাবে।'

BanglaBook.org

'তোদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে?' সদানন্দ বললেন। 'এটা কী ছেলেখেলা পেয়েছিস? ওই সেলেটপাথরটা আর ওই খড়িটা ওই তাক থেকে নিয়ে এসো তো হরুবাবু।'

হরু ঠাকুর চুপচাপ উঠে এঁটো হাত ধুয়ে সেলেট আর চক নিয়ে সদানন্দকে দিতে গেল। 'না না, তুমিই রাখো। এবার ওখানে লেখ তো "পঞ্চাননমঙ্গল" যে ভাবে তুমি তোমার পুঁথিতে লিখবে সে ভাবে লিখে দেখাও দেখি।'

হরু ঠাকুরের দৃষ্টিতে বিস্ময়। চুপচাপ সেলেটে লিখল পঞ্চাননমঙ্গল—বেশ পুরোনো দিনের স্টাইলে। এবার সদানন্দ বললেন—'খড়িটা আর সেলেটটা আমায় দাও—'

হরু ঠাকুরের কাছ থেকে খড়িটা আর সেলেটটা নিয়ে সদানন্দ লেখাটাকে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে কেটে দিল। 'তোমার পুঁথি খুলে প্রথম পাতাটা দেখে যে কেউ বলে দেবে এটা জাল পুঁথি।'

হরু ঠাকুর বলল—'জানি চোদ্দশো সালের মতো করে লিখতে হবে, কিন্তু এটা জানি না সে সময় কী রকম অক্ষর ব্যবহার করা হত।'

'সেটাই তোমার সমস্যা', সদানন্দ বললেন। 'তোমার কাছে মাছ এনে দিলে রেঁধে মাছের ঝোল বানিয়ে দেবে। কিন্তু মাছ এনে না দিলে নিজে মাছ ধরতে পারো না, কেননা তোমাকে মাছ ধরাটা কেউ শেখায় নি। তোমাকে পুরোনো পুঁথি এনে দিলে তুমি নকল করে দেবে, কিন্তু পুঁথি না থাকলে তুমি লিখতে পারবে না, কারণ তোমাকে কেউ শেখায় নি কোন্ সালে পুঁথিতে কিরকম অক্ষর লেখা হত।'

কালাচাঁদ বলল, 'কর্তামশাই, আপনি মাছ ধরাটা হরু ঠাকুরকে শিখিয়ে দ্যান না।'

সদানন্দ ভটচাজ বললেন, 'খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ভারতে দু'ধরণের লিপি চলত—ব্রাহ্মী আর খরোষ্ঠী। খরোষ্ঠী লিপি আরও ছশো বছরের মতো ভারতে চলেছিল এবং আরও কয়েকশো বছর মধ্যএশিয়াতে চলেছিল। ব্রাহ্মী লিপি বাঁ দিক থেকে ডানদিকে লেখা হত। এই ব্রাহ্মী লিপি থেকেই পরবর্তীকালে বর্তমান ভারতের অনেক ভাষার লিপির জন্ম হয়। বাংলা লিপি জন্ম নিয়েছে ব্রাহ্মী লিপির পূর্ব ভারতীয় রূপ কুটিলা লিপি থেকে। সপ্তম শতকে বাংলা একটা নিজস্ব আকার নেয়। তারপর লিপিটা নানারকম রূপ পরিবর্তন করে এখনকার সুন্দর চেহারা নেয়। এ কি যার তার কাজ? এটা শিখতেই লোকের বছরের পর বছর লেগে যায়।'

বদন বলল, 'সে জন্যেই তো আমরা আপনার কাছে এসেছি।'

সদানন্দ ভটচাজ সেলেটটা ডান হাতের পাঞ্জাবির হাতা দিয়ে মুছে লিখলেন—

BanglaBook.org

পঞ্চাননমঙ্গল

'চ-টা ওরা উলটো করে লিখত'—সদানন্দ বললেন। 'সময় নষ্ট না করে হাতেখড়িটা আজই হয়ে যাক।'

হরু ঠাকুর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলল, 'আমাকে শেখান কর্তামশাই, কিছুটা প্র্যাকটিস তো আমারও আছে। আমি পারব।'

সদানন্দ কিছুক্ষণ চুপচাপ চিদানন্দ আর ধাড়ার হাসি হাসি মুখের ফটোটার দিকে চেয়ে বললেন, 'বেশ লেখ "অ"।'

হরু ঠাকুর বলল, 'আপনিই লিখে দেখান।'

সদানন্দ লিখতে লিখতে বললেন, 'এ-ই হল অ। অ, আ, ই, ঈ, এ, ঐ, ও, ঔ' এই আটটি স্বরে এখনকার আকৃতি দেখতে পাওয়া যায়।'

হরু ঠাকুর ভালো ভাবে দেখল, এরকম "অ" সে কতবার যে লিখেছে হেনরি সাহেবের কাছে পুঁথি নকল করার সময় তা গুনে বলা যাবে না। হরু ঠাকুর সদানন্দের "অ" এর পাশে নিখুঁত একটা "অ" লিখল।

'গুড,' সদানন্দকে খুশি দেখাল। এবার থেকে যখনই "অ" লিখবে এভাবে লিখবে, তাহলে অভ্যাসটা থাকবে।'

'আপনি শুধু একবার দেখিয়ে দিন কর্তামশাই, হরু ঠাকুর নিখুঁত কপি করে দেবে—' কালাচাঁদ বলল।

'সারা জীবন পুঁথি নকল করে এলাম, এই বয়সে এসব অ-আ নকল করা আমার কাছে অন্ধের চোখে রুমাল বেঁধে কানামাছি খেলা শেখানো। আমি একদিনে তুলে নেব, শুধু আমায় একবার দেখিয়ে দ্যান।'

'শুধু অ আর আ-তেই খেয়াল রাখতে হবে। আর মনে রাখতে হবে তখন উ আর ঊ এর মাথার ওপরে আঁকড়া ছিল না। আমার বাবা বলতেন সাহেবরা আমাদের দেশ থেকে তিনটে অনেক পুরোনো বই কেমব্রিজে নিয়ে গেছিল 'গুহ্যাবলীবিবৃতি, পঞ্চাকার ও যোগরত্নমালা—এগুলো ১১৯৮ থেকে ১২০০ সালে লেখা—এই বইগুলোতে তখনকার পুরোনো বাংলা দেখতে পাবে—ওখানে "উ" আর "ঊ" তে মাথায় আঁকড়া দেখবে না।'

হরু ঠাকুর গজগজ করতে করতে বলল, 'হেনরি মুখপোড়াটা একাই এক ট্রাঙ্ক বাংলা পুঁথি নিয়ে ভেগেছে, আর জেল হল আমার।'

'ওখানে "ঋ"ও দেখা যায়। ঋ এর বাঁদিকে মাঝে যে ত্রিভুজের মতো

BanglaBook.org

হয়ে গেছে ওই জায়গাটা কোণের বদলে গোলাকৃতি হবে। আর ৯টা লিখতে যেও না।'

হরু ঠাকুর বাধ্য ছেলের মতো মাথা নাড়াল।

সদানন্দ বললেন, 'আসল ঝামেলাটা ব্যঞ্জনবর্ণে। "ক" এর বাঁদিকে মাঝে জায়গাটা কোণের বদলে গোলাকৃতি হবে।'

হরু ঠাকুর লিখে দেখাল। সদানন্দ বললেন, 'অনেকবার প্র্যাকটিস করতে হবে, যাতে একটুও ভুল না হয়। চিদেটার শকুনের চোখ, আমার মতো ওর লেন্সের দরকার হয় না।' সদানন্দ এত যত্ন করে লিখে দেখাল যেন পিতা তার চার বছরের বালককে অক্ষর পরিচয় করাচ্ছে। "গ"টা দ্বাদশ শতাব্দী থেকে আর পাল্টায় নি। "ঙ"টা এ ভাবে লিখো কেমন, "চ"টা কেমন উলটে গেছে। "ছ"টা অন্যরকম আর "ঝ" মোটামুটি এখনকার অক্ষরের মতো লিখলে চলবে। "জ"টা একটু ঝামেলার আছে বুঝলে—কী ভাবে লিখছি মন দিয়ে দেখ—এ-ই-রকম করে মাঝের দাঁড়াটা বেঁকিয়ে, তারপর নিম্ন রেখাটা এরকম করে বেঁকিয়ে দেবে।'

কালাচাঁদ দেখল হরু ঠাকুর মনোযোগ দিয়ে শিখে যাচ্ছে। হরু ঠাকুরের মুখ দেখে মনে হচ্ছে ও বেশ আনন্দ পাচ্ছে এটা শিখতে। বদন এতক্ষণ ধরে একটা কথাও না বলে সব শুনছিল। সদানন্দের পাঠ শেষ হলে বলল, 'ব্যাপারটা মনে রাখার জন্যে আমি বলছি চোদ্দোটা মানে ফরটি ফোর পার্সেন্ট অক্ষর নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। বাকি ফিফটি সিক্স পার্সেন্টের—'

'আর জ্বালাস নে বদন,' হরু ঠাকুর কাকুতি মিনতি করে বলল। 'দয়া করে আর এর মধ্যে অঙ্ক টানিস না।'

সদানন্দ বললেন, 'অক্ষর তো হল, এবার বর্ণ-বিন্যাসের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। ণ-কার আর স-কার এর ব্যবহার বেশি দেখা যায়, শৌরসেনী ভাষার প্রভাব তখন বাংলায় বিস্তর। আর চন্দ্রবিন্দুর অজস্র প্রয়োগ। পঞ্চাননমঙ্গলের ভাষা—'

কালাচাঁদ বলল, 'কর্তামশাই, এবার শুয়ে পড়ুন, রাত অনেক হল, শরীর খারাপ করবে।'

সদানন্দ বললেন, 'আজকের রাতটা চলে গেলে হাতে থাকে মাত্র একটা দিন, পরশুর মধ্যে কাব্য লিখে চিদে হারামজাদাটাকে ঠকানো কম্পাস ছাড়া মরুভূমি পার হওয়ার মতো কঠিন। আমি হরুবাবুর হাতে সেই কম্পাসটা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আর তাছাড়া ধাড়াকে আমি এত সহজে জিততে দেব না। আমার শরীরে জমিদারি রক্ত প্রতিহিংসায় গোখরো সাপের বিষ হয়ে গেছে। ওকে একটা ছোবল আমি মারবই, অঙ্গে এত বিষের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি

BanglaBook.org

না। ঘুম আমার আজ সারারাত আসবে না। আগেকার মতো ক্ষমতা থাকলে লেঠেল পাঠিয়ে আজ রাতেই আমি ধাড়ার কোমর ভেঙ্গে দিতাম।'

হরু ঠাকুর একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলল, 'পঞ্চাননমঙ্গলের কিছুটা লিখেছি। কর্তামশাই, আমি পড়ে শোনাই?'

সদানন্দ বললেন, 'নিশ্চয়ই, পড়ো পড়ো।'

।। একুশ ।।

'পঞ্চাননমঙ্গল,' হরু ঠাকুর শান্তিনিকেতনি ব্যাগটা থেকে খাতাটা বের করে গলা খাঁকারি দিয়ে পড়া শুরু করল আর সদানন্দ কাঁঠাল কাঠের বিশাল চেয়ারে শরীর এলিয়ে চোখ বুজে শুনতে লাগলেন—

'সুরধনী নদী তীরে আঁকাবাঁকা পথ।
দুধারে বনানী ঘন বিশাল বৃহৎ॥
নবনীত দধি আদি হাড়ি লয়ে মাথে।
বনপথে গ্রামবালা চলে এক সাথে॥
দ্রুতপায়ে চলে তারা আঁধারের ঘাটে।
দুধ দধি বেচে রোজ নগরের হাটে॥'

এই পর্যন্ত বলে হরু ঠাকুর থামল—'ঠিক হচ্ছে?'

'ঘোড়ার ডিম হচ্ছে,' সদানন্দ চোখ না খুলে বলল। 'এটা যদি চোদ্দশো সালের বাংলা হয় তবে আমি ফকির সদানন্দ নই, আমি বাংলার রাজা গণেশ।' তারপর চোখ খুলে বলল, 'কাল তো দ্যাখালাম চোদ্দশো সালের ভাষা। বাঙালি তখন মোটেই আজকের বাংলায় কথা বলত না। তখনকার ভাষার উদাহরণ ধর্মদাসের একটা ভাষা মিশ্র ছড়ায় আছে—হাভীকুণ্ডী আনেসি না বড়া কীস অহ্মার অথথং।'

'এটা বাংলা?' কালাচাঁদ বলল। 'কিছুই তো মানে বুঝলাম না।'

সদানন্দ বললেন, 'এটা যবনরা এ-দেশে আসার আগেকার বাংলা। যবনরা আসার পর বাংলায় ফারসি ইত্যাদি মিশে ভাষাটার আমূল পরিবর্তন হয়েছিল। কথাটার মানে হল—ওরে বেটা, কেন আমার জন্যে হাঁড়িকুড়ি আনিস নি? তখনকার দিনে আমারকে অহ্মার বলতো, তোমারকে তোহ্মার। চণ্ডীদাস ভালো ভাবে পড়লে এটা জানতে—'

BanglaBook.org

'ভালো ভাবে পড়লে মানে?' হরু ঠাকুরের সম্মানে বাঁধল।

কালাচাঁদ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আরে, চণ্ডীদাসের পদাবলি টুকে টুকেই তো—'

'টুকে টুকে?' সদানন্দের ভ্রূতে কুঞ্চন। 'তুমি চণ্ডীদাসের পদাবলি থেকে টোকো?' সদানন্দ যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না মানুষ এত বদ হতে পারে।

হরু ঠাকুর মাথা চুলকে বলল, 'আজ্ঞে, এই লেভেলের কাজে "টোকা" কথাটা ঠিক মানায় না। আমি বলি আহরণ করা। শুধু চণ্ডীদাস কেন আমি জয়দেব, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস কবিরাজ সকলের থেকেই আহরণ করি।'

'এটাকে চুরি করা বলে, ছিঃ,' সদানন্দ ঘৃণার সঙ্গে বললেন।

হরু ঠাকুর বলল, 'আমি বলি আহরণ। সেদিন জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে দুটো লাইন আহরণ করলাম—

স্তনবিনিহিতমপি হার মুদারম।
সা মনুতে কৃশতনুরিবভারম।

তারপর দেখলাম বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর কৃষ্ণকীর্তনে সেটা অলরেডি আহরণ করে রেখে গেছেন—

তনের ওপর হারে, আল মানএ যেহ্ন ভারে।

চণ্ডীদাসের ওপর অ্যায়সা রাগ হল যে কী বলব, পুরোনো খালি তালপাতা আজকাল পাওয়া খুব মুস্কিল, শুধু শুধু একটা তালপাতা নষ্ট হল।'

'বাজে বোকো না,' সদানন্দ ধমক দিল। 'কথায় বলে বিগ মেন থিঙ্ক অ্যালাইক।'

হরু ঠাকুর দু'কানে হাত দিয়ে বলল, 'অত বড়ো বড়ো মানুষদের সম্বন্ধে কিছু বলা কি আমার মতো ছোটো মানুষের সাজে? তবে জয়দেবের ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গাণি বাণাঃ আর চণ্ডীদাসের ভ্রূ হি কামধনু নয়ন বাণে শুনলে মনে হয় মহৎ উদ্দেশ্যে মহৎ লোকের মহৎ কাজ আহরণ করলে দোষের—'

'আর বক বক কোরো না,' সদানন্দ বললেন। 'চণ্ডীদাসের পদাবলি চলবে না। পদাবলির ভাষা কীর্তনিয়াদের মুখে মুখে ক্রমে ক্রমে যুগের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাতে পাল্টাতে আজকের কথ্য ভাষায় এসে দাঁড়িয়েছে। ওটা চোদ্দশো সালের ভাষা নয়। চোদ্দশো সালের ভাষা হল চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—

'আহ্মে তোর বড়ায়ি তোহ্মে মোর নাতি।
চিন্তিবোঁ তোহ্মার হিত পরাণশকতি॥'

'এটাও বাংলা?' কালাচাঁদ বলল।

'সাতশ বছর আগে বাঙালি এই ভাষাতেই কথা বলত', সদানন্দ বললেন। 'পঞ্চাননমঙ্গল যদি পাওয়া যায় তবে তাঁর ভাষা এরকমই হবে।'

এবার বদন জিজ্ঞাসা করল, 'চণ্ডীদাসের পদাবলির ভাষা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টেছে বলছেন, তবে চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা কেন বদলায় নি?'

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুস্তকটি অশ্লীল রসে টইটুম্বুর তাই শ্রীচৈতন্যদেব এই বইটি পড়তেন না। সেজন্য বইটি বাজারে চলে নি। নচেৎ লিপিকাররা এই বইকে একদম বেস্টসেলার বানিয়ে দিত। তখন রূপ গোস্বামীর স্ট্যাম্প না লাগালে বৈষ্ণবদের সাধ্য ছিল না কোনো পুস্তক বাজারে চালায়। এই বইটা তাই লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গেছিল। চণ্ডীদাসের সময় কৃষ্ণ ধামালী নামে একধরনের খিস্তি গান আসরে খুব চলত। চণ্ডীদাস হয়তো তার দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অশ্লীলতা এনেছিলেন।'

'এই হাস্তীকুণ্ডী ভাষায় পুরো কাব্যটা লিখতে হবে?' হরু ঠাকুরের মাথায় হাত।

সদানন্দ বললেন, 'শুধু তাই নয়, ওই চোদ্দশো সালে লোকে গেরস্থালি কেমন ভাবে করত, কী খেত, কী পোশাক পরত, তাদের অলংকার কেমন ছিল, তাদের ধর্মকর্ম, শাস্ত্র, জীবিকা—সব কিছু লেখার মধ্যে একদম ঠিকঠাক লিখতে হবে। এর জন্যে পড়াশোনা চাই, এত সব দু'তিন দিনে অসম্ভব। পঞ্চাননমঙ্গল যদি এই পাঁচমুড়োতে ছিল তবে তোমাদের জানা দরকার এই পাঁচমুড়ো গেরামের মানুষজন, ঘরবাড়ি তখন কেমন ছিল?'

'কেমন ছিল এই পাঁচমুড়ো গ্রাম?' কালাচাঁদ প্রশ্ন করল।

সদানন্দ বললেন, 'তখন এই গাঁয়ের পাশে বইত বেগবতী নদী। বেগবতীর শরীরে তখন মাঝিমাল্লাদের ভিড়—বিশাল বিশাল পাল খাটিয়ে মাস্তুল নিয়ে কত রকমের নাও। বাঙালিরা নৌ বিদ্যায় খুব পারদর্শী ছিল। বেগবতী শরীরের মোচড় দিয়ে দূরে সরে গিয়ে আবার কাছে সরে এসে গ্রামটাকে যেন আলিঙ্গন করে রেখেছিল। একদিকে নদী আরেকদিকে বন-এর মধ্যে ছিল আমাদের পাঁচমুড়ো—আগের নাম বল্লাল গ্রাম।'

বদন বলল, 'বেগবতী নদীর তো নাম শুনিনি।'

সদানন্দ বললেন, 'চোদ্দশো সালের একটা ছোটোখাটো নদী, কবে মুছে গেছে—'

বদন বলল, 'গোটা নদীটা বাংলা থেকে বেমালুম গায়েব?'

সদানন্দ বললেন, 'এটা কোনো নতুন কথা না। চোদ্দশো সালের অনেক নদীই আজকের দিনে গায়েব।'

বদন ভ্রূ কুঁচকাল, তা লক্ষ করে সদানন্দ বললেন, 'উত্তরবঙ্গে করতোয়া এক অতি পবিত্র নদী ছিল। মহাভারতে এর উল্লেখ আছে, প্রাচীন কাব্যগুলিতেও এর উল্লেখ আছে। পূর্ণভবা, আত্রাই এবং করতোয়া, এই তিন নদীর ত্রিস্রোতা উত্তরবঙ্গে ছিল। ১৬৮৭ সালে ভীষণ জলপ্লাবনের ফলে এই ত্রিস্রোতার মূল নদী

BanglaBook.org

পূর্ব খাত পরিত্যাগ করে দক্ষিণ-পূর্বে এসে ব্রহ্মপুত্রে এসে মেলে। কালে কালে লোকের মুখে মুখে ভেঙে ত্রিস্রোতা থেকে তিস্তা হয়ে গেছে।'

কালাচাঁদ বলল, 'বাপ রে। এ যে বিরাট ইতিহাস।'

সদানন্দ বললেন, 'চোদ্দশো সালে গঙ্গা নদী রাজমহল পাহাড়ের রাঙা পাথরকে স্নান করিয়ে বাংলায় ঢুকত। পর্বত ও নদীর মাঝের সঙ্কীর্ণ স্থান পশ্চিমদিক থেকে আগত শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য সর্বোত্তম স্থান ছিল। এই কারণে তেলিয়াগড়ি ও শিকরাগলির গিরিসংকট বাংলার আত্মরক্ষার প্রথম প্রাকার ছিল এবং এর অদূরেই গৌড়, পান্ডুয়া, তান্ডা, রাজমহল ইত্যাদি নগরের পত্তন হয়েছিল। তখন গঙ্গা গৌড়ের উত্তর দিয়ে বয়ে যেত, গঙ্গা নীচে সরে আসতে আসতে আজ গৌড়ের দক্ষিণ দিকে বয়। আজ যেমন গঙ্গার এক বিশাল জলরাশি পূবে পদ্মায় গিয়ে পড়ে, আগে এই জলরাশি এখনকার পশ্চিমবঙ্গে এসে তিন ভাগে ভাগ হয়ে সরস্বতী, ভাগীরথী ও যমুনা এই তিনটে নদী সাগরে প্রবেশ করত। নদীটা এখনকার যে ত্রিবেণী শহর সেখানে তিন ভাগে ভাগ হত। নদীর বেশির ভাগ জল তখন সরস্বতী দিয়ে যেত। এই সরস্বতী নদীর তীরে ছিল বিখ্যাত তাম্রলিপ্ত বন্দর। এখন সরস্বতীও নেই, তাম্রলিপ্তও নেই। সুতরাং বর্তমান কালের নদনদীর অবস্থানের উপর নির্ভর করে প্রাচীনকালের ইতিহাসের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। আমাদের হাতে মোটে একটা দিন আছে। এতসব রিসার্চ পরে করলেও চলবে।'

'ঠিক কথা,' কালাচাঁদ বলল। 'কিন্তু কর্তামশাই, গাঁয়ের নামটা কেমন বেখাপ্পা ধরনের।'

সদানন্দ হাসলেন। 'এই গ্রামে পাঁচমাথা পঞ্চানন দেবতার খুব জাগ্রত মন্দির ছিল তাই দূর-দূরান্তের লোকে এটাকে বলত পঞ্চমুণ্ডের গাঁ। গ্রামের আসল নাম বল্লালগ্রামটা লোকে ধীরে ধীরে ভুলেই গেছিল। আগেকার সময়ে "ণ্ড" প্রায়শই "ড়" হয়ে যেত, যেমন চণ্ডাল থেকে চাঁড়াল, ভাণ্ড থেকে ভাঁড়, ষণ্ড থেকে ষাঁড়, সেরকম মুণ্ড থেকে মুড়ো—তাই পঞ্চমুণ্ড ধীরে ধীরে হয়ে গেল পাঁচমুড়ো। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তখন বাংলার ব্রাহ্মণরা আর্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণদের মতো নিরামিষাশী ছিল না, এরা মাছ মাংস খেতেন। প্রত্যেক জাতের একটা নির্দিষ্ট বৃত্তি থাকে, ব্রাহ্মণদের নির্দিষ্ট কর্ম অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন হলেও আমার পূর্বপুরুষ প্রতাপাদিত্য ভট্টাচার্য প্রখর বুদ্ধিমান এবং দূরদর্শী মানুষ ছিলেন। তিনি তার বাবার মতো আচার্য না হয়ে বাংলার রাজা গণেশের রাজ্যশাসনে উচ্চপদে আসীন হয়েছিলেন। সে যুগে বিভিন্ন জাতের মধ্যে অন্নগ্রহণ ও বৈবাহিক সম্বন্ধের ব্যাপারে বাঙালি সমাজ বাতিকগ্রস্ত ছিল না। যে কোনো উচ্চ বংশের পুরুষ নিম্ন বংশের নারীকে বিবাহ করতে পারে। ব্রাহ্মণের

BanglaBook.org

শূদ্রকন্যা বিবাহ শাস্ত্রে অনুমোদিত এবং সমাজ তা মেনে নিত। প্রতাপাদিত্য গৌড়ের রাজা গণেশের এক শূদ্রাণী উপপত্নীর কন্যার প্রেমে মশগুল হয়ে তাকে বিবাহ করেন। সামাজিক অনুষ্ঠান করেই এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। রাজা গণেশ এতে প্রীত হয়ে প্রতাপাদিত্যকে বল্লালগ্রামের জমিদারি বিবাহের উপঢৌকন হিসাবে দেন। রাজা গণেশের দাক্ষিণ্যে বল্লাল গ্রাম বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রামে রূপান্তরিত হয়। প্রতাপাদিত্য সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ এবং চরিত্রবান বিচক্ষণ জমিদার। তার জমিদারিতে করণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, মাগধ, তন্তুবায়, গান্ধিক-বণিক, নাপিত, গোপ, কর্মকার, তৌলিক, কুম্ভকার, শাঙ্খিক, দাস, বারুজীবী, মোদক, মালাকার, সুত, রাজপুত, তাম্বুলীরা একে অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে সহাবস্থান করে। প্রতাপাদিত্য নিম্ন শ্রেণীর শূদ্রদের যেমন মলেগ্রহি—'

'এসব নাম কখনও শুনিনি কর্তামশাই,' কালাচাঁদ বলল।

'মলেগ্রহি মানে মেথর, যারা মল পরিষ্কার করত। তাদের দিকেও খেয়াল রেখে প্রতাপাদিত্য কুড়ব, চণ্ডাল, তক্ষ, চর্মকার, ঘট্টজীবী, দোলাবাহী, মল্ল এদের সঙ্গে নদীর একধারে বসতি বানিয়ে দিয়ে তাদের প্রিয়ভাজন হয়েছিলেন।'

'অম্বষ্ঠ হল বৈদ্য, মানে ডাক্তার,' হরু ঠাকুর বলল।

'ঠিক। গ্রামে দু'ঘর অম্বষ্ঠ ছিলেন যারা চিকিৎসা ব্যবসা করত,' সদানন্দ বললেন।

'তখন লোকে কবিতা লিখত?'

'সে সময় বাংলাদেশে এক অপূর্ব সাহিত্যের বাতাস বইত। বাঙালি কবি ও গীতিকাররা বাঙলায় সংকীর্তনের গান বেঁধে ও গেয়ে চারপাশের মানুষকে সৎ ধর্মের দিকে আকর্ষণ করতেন—কত রাগ রাগিণীতে সেই সব গান লেখা হত—ভৈরবী, কামোদ, ধানশী, পটমঞ্জরী, গবরা, শীবড়ি, বল্লাড়ি, অরু, গুঞ্জরি—কত সব নাম। কবি ছাড়া আর যারা কলম চালাত তারা হল করণ, করণদের স্থান সমাজে উচ্চে—করণেরা লিপিকর এবং এরা রাজকার্যে পারদর্শী হওয়ায় প্রতাপাদিত্যকে জমিদারির কাজে সাহায্য করতেন। গ্রামের যে দিকে জঙ্গল ছিল সেদিকে বিশাল আল ছিল যাতে বন্য হাতি গ্রামে ঢুকতে না পারে। আলের ধারে বা আলের উপরে ব্যাধ, ভড়, ডোম, কোল, কোঞ্চ, হাড্ডি, বাগতীত, ব্যালগ্রাহী ইত্যাদিরা যাযাবরেরা তাঁবু গেঁড়ে কিছুদিন থাকে, জঙ্গল থেকে পাখি-পশু ইত্যাদি শিকার করে আবার অন্য গ্রামের দিকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে যায়। এরা অস্পৃশ্য ছিল। ডোমরা বাঁশের ঝুড়ি বুনত, ডোমের মেয়েরা নগরে নগরে নেচে বেড়াত। শবরের মেয়েরা কানে দুল, ময়ূর পুচ্ছ, কানে গুঞ্জাফলের মালা পড়ত। প্রতাপাদিত্যের একমাত্র ছেলে জটামদন যেদিন রাতে মত্ত অবস্থায় শবরের তাঁবুতে রাতের শয্যাসঙ্গিনী শিকার করতে গিয়ে ধরা পড়ল সেদিন শবররা শুধু তার বাপ প্রতাপাদিত্যের প্রতি কৃতজ্ঞতায় জটামদনকে আলের ভিতর জ্যান্ত পুঁতে দেয় নি। পরে এজন্য অবশ্য ওরা হাত কামড়েছে। ভেবেছে পুঁতে দিলেই ভালো হত।

BanglaBook.org

প্রতাপাদিত্য বেদেদের যাযাবর জীবনের কষ্ট দূর করিয়েছিল। প্রথমবার বল্লালগ্রামের জঙ্গলে এসে প্রতাপাদিত্যের চোখ এড়ায়নি বনে নাগবৃক্ষ, লিকুচ, বকুল, বটের জঙ্গল আর তাতে পাতায় পাতায় থিকথিক করছে রেশমের কীট। প্রতাপাদিত্যের অজানা ছিল না যে নাগবৃক্ষের কীট থেকে হলদে রেশম বের হয় যার তৈরি পত্রোর্ণ বা পাতার পশম খুব দামি। চীনের তুঁতপোকার পশম গৌড় রাজসভায় দেখেছে প্রতাপাদিত্য—তার রঙ খুব সাদা। লিকুচের পাতায় যে রেশম তৈরি হয় তার রঙ পাকা গমের মতো, বটপাতার যে রেশম তৈরি হয় তার রঙ ননীর মতো। বল্লাল গাঁর রেশমের সুতোয় রঙ করতে হত না, গাছের পোকা থেকেই নানা রঙের রেশম বের হত। বল্লাল গাঁ-র লাগোয়া এত বড়ো নাগবৃক্ষ বা নাগকেশরের বন আর কোথাও দেখে নি প্রতাপাদিত্য, পাশের লিকুচ মানে মাদারগাছের জঙ্গলও বিশাল। দূরদর্শী প্রতাপাদিত্য যাযাবর শবদের দিয়ে জঙ্গলে রেশম চাষ শুরু করালেন। তার আর একটা কারণ ছিল। রেশম কীট তৈরি করার জন্য সে যুগে একটা বাছুরকে তুঁত পাতা খাইয়ে বড়ো করা হত। তারপর সেই গাভীকে মেরে তার মাংস পাত্রে রেখে পচানো হত। সেই পচা মাংসে রেশম কীট বা পুলো জন্ম নেয়। কিন্তু পচা মাংসের দুর্গন্ধ হত, অনেকদিন ধরে গ্রামে রেখে দেওয়া যায় না, তাই জঙ্গলে "বানক" তৈরি করে তার ভিতরে অনেকগুলো মাচা বানিয়ে পচা মাংসে রেশম পোকার চাষ হত।"

'বাংলার রেশম-মসলিনের অনেক গল্প শুনেছি,' হরু ঠাকুর বলল।

'ঠিক—,' সদানন্দ গর্বের সাথে বললেন—'শুনেছি অওরংজেবের কন্যার দেহ তার বস্ত্রভেদ করে দেখা যাচ্ছিল বলে তিনি কন্যাকে তিরস্কার করলে, তার কন্যা বলল যে সে সাতবার সারা শরীর বস্ত্র দিয়ে বেষ্টন করেও শরীর পুরোপুরি ঢাকতে অসমর্থ।'

'ঝুনা নামে বস্ত্র এত সূক্ষ্ম যে প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে এই বস্ত্রের ব্যবহার স্ত্রীলোকের জন্য নিষেধ ছিল।' হরু ঠাকুর বলল।

সদানন্দ বললেন, 'এ ভাবে প্রতাপাদিত্য যাযাবর বেদে-ব্যাধদের একটা স্থায়ী জীবিকা করে দিয়েছিলেন। যাযাবর শবররা এই বানকগুলোর দেখাশোনা করত। বল্লাল গাঁ-র রেশমের নাম ভারতের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সৌরাষ্ট্রে, কর্ণাটের রেশম ব্যবসায়ীরা বড়ো বড়ো পাল তোলা নৌকা নিয়ে বেগবতীর ওপর দিয়ে বল্লাল গাঁ-র ঘাটে এসে ভিড়ত রেশমের কাপড়, সুতো কিনতে। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বিদেশী বণিকরা বল্লাল গ্রামের মসলিন কিনতে আসত। তখন সামুদ্রিক বিশাল জাহাজ উজানে বেগবতীর অপর্যাপ্ত গভীরতার জন্যে ভিতরে আসতে পারত না। তাই তারা সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম বন্দরে নোঙর করে ছোটো পণ্যতরণী নিয়ে বল্লালগ্রামের ঘাটে ভিড় জমাত। সোনার গাঁ-র প্রসিদ্ধ মলমল, কুচবিহারের মৃগনাভি, ঢাকার মলমলখাস, ঝুনা, রঙ্গ, আবরওয়া, খাসা,

আলাবালী, তঞ্জেব, তরন্দম, সরবন্দ, সরবতী, ডোরিয়া, জামদানি বস্ত্রাদি এবং শাঁখের তৈরি অলঙ্কার, হিজলীর তৃণজ বস্ত্রের সঙ্গে বল্লালগ্রামের রেশমজাত কাপড় সপ্তগ্রামের বন্দরের ইউরোপগামী জাহাজে রপ্তানি হওয়া শুরু হল।'

'পঞ্চাননবাবা এখানে কোথায়?' কালাচাঁদ বলল।

'দাঁড়া, অত উতলা হোস না, সবাই ঠিক সময় মতো আসবে,' সদানন্দ মৃদু বকুনি দিলেন। 'একদিন সকালে এই বেগবতীর ঘাটে নৌকা এসে ভিড়ল। সেই নৌকায় ছিলেন একজন পুণ্যাত্মা, সঙ্গে তার ঘুমন্ত কন্যা আর বাবা পঞ্চাননের বিশাল এক লিঙ্গমূর্তি। প্রতাপাদিত্যের দরবারে এসে তিনি পরিচয় দিলেন যে তাঁর নাম নন্দীধন, বাড়ি শ্রীহট্ট। তিনি বললেন শ্রীহট্টে রাষ্ট্রবিপ্লব ও দুর্ভিক্ষের জন্য সকল পণ্ডিতরা দেশত্যাগ করে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে উপনিবিষ্ট হয়ে টোল খুলছে। নন্দীধন বললেন যে, তিনি বল্লালগ্রামে বাস করার অনুমতি চান। প্রতাপাদিত্যের শ্রীহট্টের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি জানতেন যে, এখানে অনেক পণ্ডিত ও গুণী মানুষের বাস। শ্রীহট্টের লস্করপুরের 'উর্নিচাদর', মাহুলিয়ার 'এন্ডি', গায়ে দেবার গেলাপ, এবং ৭০ হাত লম্বা মাছ ধরার জাল—ঝাঁকিজাল, উথালজাল, বাখেরজাল, খেতজাল, সঙ্গাজাল—এসবে শ্রীহট্টের মানুষের বিশাল পারদর্শিতা। প্রতাপাদিত্য চাইলেন শুধু সুতো বিক্রি না করে শ্রীহট্টের বস্ত্র উৎপাদনকারী কুলিকদের দিয়ে চাদর, কাপড়, জাল ইত্যাদি তৈরি করে রপ্তানি করতে। নন্দীধনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্রীহট্টের কুলিকরা পরিবার নিয়ে বল্লালগ্রামে উপস্থিত হল এবং প্রতাপাদিত্যের দূরদর্শিতায় দেখতে দেখতে বল্লাল গাঁ-র শ্রীবৃদ্ধি হয়ে এক জনপদে পরিণত হল। জঙ্গলের আলের পাশে চয়নবিল, তার অনেক আগেই জনপদ শেষ হয়ে গেছে। চয়নবিলের পাড়ে নন্দীধন চারচালা মন্দির বানিয়ে পঞ্চানন বাবার পুজো করত—মাটির দেওয়াল, বাঁশের মটকা, খড়ের ছাউনি আর দরজা কাঠের। তখনকার দিনে বাংলাদেশের আবাসগৃহ এ রকমই হত। কর্ণাটের রেশম ব্যবসায়ীর একটা দল নাগকেশরের বন দেখতে এসে আবিষ্কার করে নন্দীধনের পঞ্চানন বাবার মন্দির। পঞ্চমুখ শিব কর্ণাটদেশেও খুব প্রচলিত। কোনো এক ব্যবসায়ী হয়তো মানত করে বাবার থানে আর খুব ভালো মুনাফা হওয়ায় পাথর দিয়ে মন্দিরের দেওয়াল বানিয়ে দেয়। কিন্তু পঞ্চানন বাবার মাহাত্ম্য লোকে টের পায় আরও কিছুদিন পরে।'

'কীভাবে টের পেল?' বদন বলল।

'বলছি সে কথা, কিন্তু তার আগে বলি যে দূরদর্শী প্রতাপাদিত্য নন্দীধনকে সাধারণ মানুষ মনে করেনি। তাঁর মধ্যে কেমন একটা দৈবশক্তির আধার আছে বলে তার মনে হয়েছিল। নন্দীধন যেন নন্দীর মতো শিবকে পাহারা দিত।

মানুষটার মধ্যে কোনো লোভ নেই। নন্দীধনকে সচ্ছলভাবে থাকার জন্যে প্রতাপাদিত্য নন্দীধনকে তিন কুল্যবাপ ধান আর ইক্ষুর জমি লিখে দিলেন।'

'কি বাপ?' কালাচাঁদ বলল।

হরু ঠাকুর বলল, 'কুল্যবাপ প্রাচীন বাংলার জমির একটা মাপ। কুল্যবাপ শব্দটা কুল্য বা কুলা থেকে এসেছে। মানে এক কুলা বীজ দিয়ে যতটা জমি চাষ করা যায়। পরে সেটা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ১৪ বিঘায় দাঁড়ায়।'

সদানন্দ বললেন, 'প্রতাপাদিত্য লিখে দিলেন যে এই জমির জন্য কোনো কর দিতে হবে না। এই জমির ইক্ষুজাত গুড়—'

'তখনও এখোগুড় হত?' কালাচাঁদ বলল।

'কেন হবে না? আরে অনেক পণ্ডিত তো বলেন যে গুড় থেকেই বাংলার রাজধানীর নাম গৌড় হয়েছিল—' সদানন্দ বললেন।

'কথায় কথায় বাধা দিস নে কালা, গল্পের তালভঙ্গ হয়—' হরু ঠাকুর বলল।

'তখন এক কুল্যবাপ জমির দাম তিন স্বর্ণ দীনার। প্রতাপাদিত্যের সুহৃদদের ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হল। কিন্তু নন্দীধন সেই জমির পাট্টা ফিরিয়ে দিলেন। তিনি বললেন পতঞ্জলি বলেছেন যে, এই আর্যনিবাসের অধিবাসী প্রকৃত ব্রাহ্মণ যিনি তাঁর গৃহে মাত্র কয়েক কলসি ধান সঞ্চয় করে রাখেন, তিনি অলোলুপ, তিনি কোন বিদ্যায় পারগ, তিনিই শিষ্ট মহাশয়।'

'এরকম নির্লোভ মানুষ খুব কম দেখা যায়—' হরু ঠাকুর বলল।

সদানন্দ বললেন, 'ঠিক। নন্দীধন প্রতাপাদিত্যকে বললেন, তুর্কী, আফগানদের আক্রমণে আজ চট্টগ্রাম, যশোহর, ঢাকা প্রভৃতি নানা জায়গায় বৌদ্ধমঠগুলি ধ্বংস করা হচ্ছে। ফলে আজ অনেক বৌদ্ধ গৃহহারা, আশ্রয়হীন। আপনি যদি চয়নবিলের পশ্চিমতীরের অর্ধ্বভগ্ন সঙ্ঘারাম-বিহারের সংস্কার করেন এবং এই বৌদ্ধদের আশ্রয় দান করে তাদের বলি, চরু, চীবর, পিণ্ড, শয়ান, আসন এবং ঔষধের ব্যয় নির্বাহ করেন এবং বুদ্ধমূর্তির পূজার ব্যয়ভার দুই বৎসরকাল বহন করেন তবে ইহাদের তৈরি মলমল, শাঁখা এবং নৌকা বল্লালগ্রামের নাম উজ্জ্বল করবে এবং আমরা বাংলার প্রাচীন ধর্মরত্নের সংস্কার করাতে পারি। প্রতাপাদিত্য বললেন উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু এই বিহার যে বিদেশি শত্রুরা নালন্দা, জগদ্দল, সোমপুর, ওদন্তপুরের মতো আবার ধ্বংস করবে না তার কী স্থিরতা? নন্দীধন বললেন, এই পুঁথি নকল হলে তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা তিনি ভেবে রেখেছেন, এই পুঁথি তিব্বতের বিভিন্ন বৌদ্ধবিহারগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। প্রতাপাদিত্য বললেন উত্তম। তিনি প্রশাসনে বিচক্ষণ, তৎক্ষণাৎ মঠের সংস্কার কার্য শুরু করলেন, মঠের খরচ নির্বাহ করার জন্য একশো পাটক জমি নির্ধারণ করলেন, প্রতি মঠের জন্য অধ্যাপক ও

BanglaBook.org

ছাত্র ছাড়াও একজন গণক, হিসাবরক্ষক হিসাবে একজন কায়স্থ, তিনজন মালাকার, একজন তৈলিক, একজন কুম্ভকার, চারজন কাহল বাদক, দু'জন শঙ্খবাদক, দু'জন ঢক্কাবাদক, চার প্রহরে সময় জ্ঞাপনের জন্য চারজন দ্রাগড়িক, গোটা বিশেক কর্মকার ও চর্মকার, একজন নট, দু'জন সূত্রধার, দু'জন স্থপতি, বেগার খাটার জন্য আটজন বেট্টিক নিযুক্ত করলেন। নন্দীধন মহা উদ্যোগে জীর্ণ পুঁথি জোগাড় করে তার পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু করলেন। সে সময়ে প্রস্তর ও ধাতুশিল্পে বাঙালি কারিগরদের খ্যাতি সারা ভারত জোড়া। কিন্তু নন্দীধনের পাথরের পঞ্চানন বাবার ধাতু-নির্মিত পঞ্চমুখ কোন্ ধাতুর তা বাঙালি জানত না। রূপার ন্যায় ইহার ঔজ্জ্বল্য অথচ অন্নে স্বর্ণ বা রূপার ক্ষয় হলেও এর ক্ষয় নেই। কিন্তু এই পঞ্চানন তারপর ধীরে ধীরে তিনি অম্বষ্ঠদের অম্বষ্ঠ হয়ে ঔথিতাসনিক পদ লাভ করলেন, সে কালে সেটা রাজসভায় সর্বোচ্চ সম্মান অর্থাৎ যার আগমনে রাজা ও রাজসভার সকলে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।'

'একটা প্রশ্ন ছিল—' বদন বলল।

'বল—' সদানন্দ চোখ খুলে বললেন।

'এই প্রাচীন বাংলার বর্ণনাগুলো আপনি কী ভাবে জানলেন?'

সদানন্দ বললেন, 'আমাদের এই বাংলায় জগদ্দল নামে একট মহাবিহার ছিল। সেই মহাবিহার বহিরাগত শত্রুরা কবে ধুলোয় মিটিয়ে দিয়েছে। আরকিওলজিস্টরা এখনও সেই মহাবিহারের খোঁজ করে চলেছে। সেখানে বিদ্যাকর নামে এক বৌদ্ধপণ্ডিত থাকতেন। উনি সুভাষিতরত্নকোষ নামে সংস্কৃতে একটা কবিতার সংকলন করেছিলেন। সেখানে প্রায় ২৭৫ জন কবির কবিতা ছিল। যদিও সেই সংকলনে কালিদাস, ভবভূতি, রাজশেখর প্রভৃতি বিখ্যাত কবিদের কবিতা সংকলিত হয়েছে, বিদ্যাকর কিন্তু বাংলার বা পূবের কবিদের কবিতা বেশি স্থান দিয়েছিলেন—বল্লান, যোগেশ্বর, বসুকল্প, মনোবিনোদ, অভিনন্দ, লক্ষ্মীধর, বীর্য্যমিত্র ইত্যাদি। বহিরাগত রাজার সৈন্যরা যখন জগদ্দল মহাবিহার আক্রমণ করেন, তার ঠিক আগেই এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এই তালপাতার পুঁথিটা নিয়ে তিব্বতে পালিয়ে যান। এই পুঁথি পরে মধ্য তিব্বতের নাগোর থেকে পাওয়া যায়। এর আরেকটা সংস্করণ আবিষ্কৃত হয় নেপালের রাজগুরু পণ্ডিত হেমরাজের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে।'

'এই বইটার গুরুত্ব কি? এ তো সংস্কৃতে লেখা বলছেন?' বদন জিজ্ঞাসা করল।

'সংস্কৃতে লেখা হলেও যেহেতু বাঙালি কবিরা লিখেছিলেন তাই এই বইতে প্রাচীন বাংলার লোকেরা কোথায় থাকত, কী পরত, কী খেত, ওদের সমাজ জীবনের অনেক কিছু জানতে পারা যায়। সেই সব কবিদের বর্ণনা আর আমার

BanglaBook.org

পূর্বপুরুষদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কুলজী থেকে তথ্য নিয়ে মনে এই ছবিটা এঁকে রেখেছি। সেটাই তোদের বললাম।'

'আপনি নিজে পড়েছেন ওই প্রাচীন ২৭৫ জন কবির লেখা?' বদন জিজ্ঞাসা করল।

'পরের মুখের ঝাল খেয়ে নিজেকে পণ্ডিত প্রমাণ করার জন্য আমি ফাঁপা কথা বলি না বদন—' সদানন্দের মাথায় রাগ একদম চিড়িয়াখানার বানরের মতো—যখন তখন লাফিয়ে উপরে ওঠে। বদন চুপ করে গেল।

সদানন্দ বলে চললেন—'বিলেতে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তোর জন্মের অনেক আগে ১৯৬৫ সালে বইটা ছাপিয়েছিল—অ্যান অ্যান্থলজি অব সংস্কৃট কোর্ট পোয়েট্রি—ইংরাজিতেই লেখা, ইচ্ছা হলে পড়ে মিলিয়ে নিস।'

কালাচাঁদ অস্বস্তি কাটাতে বলল, 'কর্তামশাই, রাগ করেন ক্যান, আমি তো না জানি সংস্কৃত, না জানি ইংরেজি। আপনার মুখেই শুনি না কেমন ছিল সে সময় আমাদের বাংলা মা।'

সদানন্দ বললেন, 'ওখানে প্রাচীন বাংলার সুন্দর সব বর্ণনা পাবি—বিভিন্ন ঋতুতে গ্রাম বাংলার জীবনের বর্ণনা। গ্রীষ্মকালে গাছে আম পেকেছে, তাকে ঘিরে মৌমাছি ভনভন করছে, কোকিল ডাকছে, চারদিকে ফুল ফুটে আছে অশোক-কুন্দ-কিংশুক-চাঁপা-বকুল এসব।'

'তারপর,' কালাচাঁদ সম্মোহিত হয়ে শুনছে।

'তারপর একদিন বর্ষা এল, মুষলধারায় বৃষ্টিতে পিপাসিত কলাপাতা যেন হাতের অঞ্জলি ভরে জল খেয়ে সজীব হতে লাগল, চাতক এবং আরও অন্যান্য পাখিরা গরম থেকে মুক্ত হয়ে বৃষ্টির জলে চান করে আরাম পেল, মাঝ বর্ষায় জলে ডোবা ধানক্ষেতে মাঝে মাঝে মাছ তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছে আর কাদামাখা বাচ্চাগুলো লাঠি হাতে সেদিকে দৌড়চ্ছে, ব্যাং ডাকছে, রাতের বেলা সুখী যুবক বিছানায় তার যুবতী স্ত্রীকে জড়িয়ে শুয়ে বাড়ির খড়ের চালে কুমড়ো লতায় বৃষ্টির টুপটাপ আওয়াজ শুনছে।'

'আহা—ছবি যেন চোখের ওপর ভাসছে কর্তা।' হরু ঠাকুর প্রায় ঘোরের মধ্যে থেকে বলে উঠল।

'তারপর আসে শরৎকাল। মাঠের জল নেমে আসে, নদীর পার থেকে জল নীচে নামলেও নদী তখন গর্ভিণীর মতো ভর-ভরন্ত। ক্ষেতে আঁখ পাকে, শস্য পাকে, ফসল কাটার সময় গ্রামের লোকেরা ক্ষেতে মাচা বেঁধে বুনো শুয়োর তাড়ায়, মেয়েরা কবরীতে শরতের ফুলের মালা বেঁধে ধান পাহারা দেয়। চাঁদনি রাতে সাদা গোরুর দল মাঠে নেমে পড়ে আর মাঠের সবুজ তাজা ঘাস খায়,

BanglaBook.org

আকাশেও তখন সাদা মেঘ জ্যোৎস্নায় স্নান করে শ্বেত গাভীর মতো ধীর গতিতে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। ফসল কাটা হওয়ার পর ধনীদের ধানের গোলা পূর্ণ। ধনীদের বাড়িতে ভরপেট খেয়ে ব্রাহ্মণ তাদের আশীর্বাদ করতে করতে বাড়ি ফেরে। তারপর আসে শীত। চাষির বাড়িতে উনুনে ঘুঁটে পোড়ে, চাষির বউ ঘুঁটের আগুনে ফ্যাকাসে হাত সেঁকে আর ধোঁয়ার গন্ধে আঁচল দিয়ে নাক ঢাকে—এসব কত কী। বকবক করে ঘুম পাচ্ছে রে—' সদানন্দ হাই তুললেন—'আমাকে একটু ধর তো রে কালা, উঠি।'

সদানন্দ উঠতে উঠতে বললেন, 'লেখার মধ্যে ওই সময়কালের জীবন ঠিকমতো ধরতে হবে। একটা কথা ভুল লিখলেই পুরো কাব্য জাল বলে ধরা পড়ে যাবে, ওই গৌরচন্দ্রিকার মতো। চিদেটার চোখ কিন্তু মারাত্মক—এক হাজার শকুন মরে একটা চিদে জন্ম নেয়।'

সদানন্দ নিজের ঘরে ঢুকে গিয়ে একটা বই ডান বগলে চেপে বেরিয়ে এলেন—'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এটা পড়ে ফেল, পঞ্চাননমঙ্গলের ভাষা এর সঙ্গে মিলিয়ে লিখলে ঠিক লাগবে। ঘুম পাচ্ছে, একটু মশারিটা টানিয়ে দে তো কালা,' সদানন্দ ভিতরে চলে গেলেন, পিছনে পিছনে কালাচাঁদ সদানন্দের ঘরে ঢুকে কালো লৌহের মতো থামওয়ালা কাঠের ডালপালা মেলা খাট দেখে বিস্ময় চেপে রাখতে পারল না—'বাপরে, এটা খাট? এখানে দু'জন কুস্তিগির কুস্তির লড়াই করলেও এটা ভাঙবে না।'

সদানন্দ হাসলেন—'এটাকে বলে পালঙ্ক। এক সময়ে এই পালঙ্ক চিনাংশুকে আবৃত থাকত। চীনদেশের সর্বোৎকৃষ্ট সব জিনিস।' তারপর উদাস হয়ে বললেন, 'সে সব দিন আর নেই। কত দামি সে জিনিস, সে সব ভেবে কী হবে।'

'না না কর্তামশাই,' কালাচাঁদ সান্ত্বনা দিল। 'আজকাল চাইনিজ মাল খুব সস্তা হয়ে গেছে। আপনি কলকাতায় যান না তো, তাই জানেন না, কলকাতায় চাইনিজ মালে ছেয়ে গেছে। এসপ্ল্যানেড থেকে আপনার ওই মেড-ইন-চায়না চিনাংশুক আমি এনে দেব। তবে হ্যাঁ, কোয়ালিটি কিন্তু খুব খারাপ হয়ে গেছে। তার গ্যারান্টিও দিতে পারব না।'

সদানন্দ কালাচাঁদের দিকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইলেন, কি বলবেন তা বুঝে পেলেন না।

সদানন্দের মশারি টানিয়ে কালাচাঁদ বেরিয়ে এল। সদানন্দ স্মৃতির জাবর কাটতে কাটতে ঘুমিয়ে পড়বে। বদনের কাছ থেকে এবার শুনতে হবে ধাড়ার কেচ্ছা-কাহিনি।

BanglaBook.org

।। বাইশ ।।

বিছানায় শুয়ে হরু ঠাকুরের ঘুম এল না, মাথায় দুশ্চিন্তা যেন তটে সাগরের ঢেউ। কাল সারাদিনে পঞ্চাননমঙ্গলকাব্য নামবে কী করে? আরবের খুনিগুলোর কথা মনে হলেই শিরা-উপশিরার মধ্যে রক্ত ভয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। বাইরে ঝিঁঝি পোকারা ডেকেই চলেছে। পাশে শুয়ে বদন নাক ডাকছে। বেচারার আজ খুব ধকল গেছে। কালাচাঁদের বিছানা থেকে কুটকুট করে দাঁত দিয়ে নখ কাটার আওয়াজ আসছে। জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না ঘরের মেঝেতে এসে পড়েছে। হরু ঠাকুর উঠে বসল, বিছানায় কিছুক্ষণ বসে থেকে হরু ঠাকুর দরজা খুলে বৈঠকখানায় এল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে আলোটা জ্বালল। মোটা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনটা টেবিলে রাখা। হরু ঠাকুর বইটা খুলল। কর্তামশাই বলেছেন পঞ্চাননমঙ্গলের ভাষা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর মতো হওয়া উচিত। হরু ঠাকুর পড়া শুরু করল। কয়েক পাতা পড়ার পর হরু ঠাকুরের মনে হল এ ভাষা তো তার কাছে একদমই অচেনা না। সে তো এই ভাষায় অনেক ঝুরো পুঁথি নকল করেছে এশিয়াটিক সোসাইটিতে। হেনরি সাহেব যে বইগুলো নিয়ে বিলেতে পালিয়ে গেছিল সেগুলো বেশিরভাগ এই ভাষায় লেখা বই। তার মধ্যে পঞ্চাননমঙ্গল ছিল কিনা মনে নেই, তবে এটা নিশ্চিত হেনরি বেশ কটা চোদ্দশো সালের বই নিয়ে ভেগেছিল। হরু ঠাকুরের মনে হল চেষ্টা করলে সে লিখতে পারবে পঞ্চাননমঙ্গল। শুধু একটা ভালো গল্প চাই। রাত গভীর হল, হাওয়া শীতল হয়ে গেছে, বাইরের জ্যোৎস্না যেন হরু ঠাকুরকে ডাকছে। হরু ঠাকুর সদর দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। আকাশে কাক জ্যোৎস্না—সামনের আখক্ষেত আলোয় ভেসে যাচ্ছে। জোনাকিগুলো এত আলোয় দিশেহারা হয়ে মাঠের বনতুলসীর ঝাড়ের আড়ালে স্বল্প আঁধারে ঠাসাঠাসি করে ভিড় করেছে। বাতাসে ছাতিম ফুলের গন্ধ। হরু ঠাকুর আলপথ ধরে হাঁটতে লাগল, পলাশডাঙ্গার মাঠের দিকে।

হরু ঠাকুর হন হন করে হাঁটছিল। হরু ঠাকুর ভাবছিল একসময় নন্দীধন নামে এক পুরোহিত এ গাঁয়ে ছিল—সে সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বেলে অঙ্ক ছন্দে মিশিয়ে তালপাতার পুঁথিতে লিখত। হরু ঠাকুরের খেয়াল হল সে অনেকক্ষণ হাঁটছে কিন্তু পলাশডাঙ্গার মাঠ, রেললাইন এ সব তো এল না এখনও! হাওয়াটা শীতল হয়ে গেছে, যেন কাছেপিঠে নদী আছে। হরু ঠাকুর ভালো ভাবে তাকিয়ে দেখল—জায়গাটা সে চিনতে পারছে না তো। ওই চারচালা—ওই মন্দির যার পাথরের দেওয়াল—এগুলো দিনের বেলা কোথায় ছিল? হরু ঠাকুর মাথা উঁচু করে আকাশের দিকে তাকাল—আকাশটা ঠিক আছে—হরু ঠাকুর ভাবল সে কি জ্যোৎস্নাতে হারিয়ে গেল—নাকি সে নিজেই জ্যোৎস্না হয়ে গেল?

BanglaBook.org

*

বাইরে আকাশে কাক-জ্যোৎস্না। কুঁড়ের ভিতর প্রদীপের আলোয় নন্দীধন তালপাতায় লিখছিলেন। পাশে আর্যভটের 'আর্যভটীয়', তাঁর গণিতপদের তেত্রিশতম শ্লোকটা বাংলায় অনুবাদ করছিলেন, পাশে রাখা ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত'। আজ যেন অনুবাদ ঠিকমতো হচ্ছে না। ফুৎকারে প্রদীপটা নিভিয়ে দিয়ে দালানে এসে দাঁড়ালেন নন্দীধন। তাঁর পরনের ধুতি মেখলা দিয়ে আবদ্ধ। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। সাদা চাদর বামস্কন্ধের নীচ দিয়ে উপবীতের ন্যায় বেষ্টন করে আছে। তাঁর চিন্তিত মুখটা কুঁড়ের বারান্দার খড়ের চালার আচ্ছাদনের ছায়ায় অন্ধকার। নন্দীধন দালানে পায়চারি করতে লাগলেন, তাঁর মন অশান্ত। হাজার হাজার পুঁথি বহিরাগত সেনা এসে পুড়িয়ে দিচ্ছে, কত পুঁথি লুট করে নিয়ে চলে যাচ্ছে পশ্চিমের দেশগুলোতে পারস্য, আরব, গ্রিস। বৈদিক যুগের অনবদ্য আবিষ্কারগুলোকে পশ্চিমের এই দেশগুলির পণ্ডিতরা হয়তো একদিন নিজেদের বলে দাবি করবে, আর তাই তাদের দরকার আমাদের সমস্ত পুঁথির চিহ্ন জ্বালিয়ে অঙ্গার করে দেওয়া। আজ বাংলাদেশের ঘোর দুর্দিন। গৌড়ের মসনদে রাজা গণেশ হিন্দুরাজ ফিরিয়ে এনেছিল। কিন্তু রাজা গণেশ যেদিন নিজের প্রাণ বাঁচাতে নিজের পুত্র যদুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষা নেওয়াতে রাজি করালেন, সেদিন নন্দীধন বুঝেছিলেন ব্রাহ্মণদের দ্বারা অত্যাচারের দিন এবার শেষ কিন্তু এবার আবার ধর্ম পরিবর্তনের জন্য জোরাজুরি—অত্যাচার শুরু হবে। যাদের জবরদস্তি ধর্মান্তর করা হয়, তারা মুসলমান হয়েও শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা ত্যাগ করে না, এত দিনের বিশ্বাস ত্যাগ করতে দু'তিন পুরুষ লাগে। যদু জালালুদ্দিন নাম নিয়ে রাজত্ব করতে লাগল। ব্রাহ্মণেরা বিধান দিলেন যে যদুকে সুবর্ণগোধন যজ্ঞ করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। যদু মনে মনে হাসলেন, তিনি যজ্ঞের আয়োজন করে এক হাজার ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করলেন। নন্দীধনেরও নিমন্ত্রণ ছিল কিন্তু তার পক্ষে মন্দির আর ভানুমতীকে ছেড়ে বাইরে রাত্রিযাপন সম্ভব হয় না। তাই নন্দীধন যেতে পারে নি। প্রাসাদের বিশাল দক্ষিণার লোভে দূর দূরান্তের ব্রাহ্মণরা গৌড়ে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। অচিরেই ব্রাহ্মণসমাজে শোকের ছায়া নেমে এল। সুবর্ণগোধন যজ্ঞে উপস্থিত সব ব্রাহ্মণকে জালালুদ্দিন জোর করে গো-মাংস খাইয়ে জাতচ্যুত করেছে। নন্দীধন ভাবছিলেন আবার মন্দির ভাঙ্গচুর লুঠতরাজ শুরু হবে। তবে জালালুদ্দিনের চেয়ে অনেক বড় চিন্তা হল জমিদার জটামদন। বাবা প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পর জমিদারি হাতে নিয়েই জটামদন সঙ্ঘারাম-বিহারের খরচ অপচয় বলে বন্ধ করে দিয়েছে। বাবা প্রতাপাদিত্যের রক্ত এর শরীরে বইছে বিশ্বাসই হয় না, প্রতিদিন তার নিত্য-নতুন অত্যাচারে গ্রামের মানুষ ভীত। বিশেষ করে যাদের ঘরে যুবতী মেয়ে আছে তারা। এত প্রতিহিংসা এই মানুষটার মনে যে আজ সকালে ওর দলবল জঙ্গলে আগুন

লাগিয়ে এসেছে শবরদের ব্যবহারের প্রতিশোধ নেবার জন্যে। রেশম কীটের লালা সব জ্বলে খাক। যাযাবর মানুষগুলো একটু সুখের মুখ দেখা শুরু করেছিল, ওরা তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে যাবে অন্য গ্রামে যেখানে জমিদার অধিক রাতে মদ্যপ অবস্থায় লেঠেল দল নিয়ে তাদের মেয়ে বউদের শিকার করতে তাদের বস্তিতে হামলা করবে না। কাল প্রভাতে নন্দীধনকে যেতে হবে নগরে, একজনের নামকরণ করাতে। উষাকালেই সে যাত্রা করবে যাতে সন্ধ্যা হওয়ার আগে ফিরে আসতে পারে। মেয়েটাকে একা রেখে যাওয়া দুশ্চিন্তার। ভানুমতী বড্ড ডানপিটে মেয়ে। বাড়িতে থাকতে চায় না। এমনকি শবর বস্তিতে পর্যন্ত ওর বন্ধুত্ব। শবররা এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে শুনে আজ মেয়েটা খুব কেঁদেছে। মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে বাবার শোবার জন্য খেজুর পাতার মাদুর পেতে, তার ওপর সুতির কাপড় বিছিয়ে বিছানা তৈরি করে, মাথার কাছে জাম কাঠের পিঁড়িতে ঘড়ায় জল ঢেকে রেখে নিজে গেছে শুতে।

নন্দীধনের দৃষ্টি হঠাৎ স্থির হয়ে গেল আলের ওপারে—মাঠের ওপাশে বনের ঠিক সামনে বিশাল আল—প্রায় দশ গজ উঁচু আর প্রায় বিশ গজ প্রশস্ত। আলের ওপর দিয়ে দেখা যায় কয়েকটা পাহাড়ি গুহা, তার একটাতে যেন আলো দেখা যাচ্ছে? আলোটা নিভে গেল—নন্দীধন ভাবল ভুল দেখেছেন। নন্দীধন কুটিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে শয্যাগ্রহণ করলেন। কাল ভোরে বেরিয়ে পড়তে হবে।

BanglaBook.org

বলরাম গুহায় বসে সকালের অপেক্ষা করছিল। ভোর হচ্ছে। ফুলের রেণুগুলো ঠাণ্ডা বাতাসের তরঙ্গের দোলায় দুলতে দুলতে ডানা মেলে বেরিয়ে পড়েছে কোনো অজানা জমিতে ঘর বাঁধার আশা বুকে নিয়ে। কৃষ্ণচূড়ার কুঁড়িগুলো যেন আগুনকে বুকের ভিতর চেপে সূর্য ওঠার প্রতীক্ষা করছে। দিন শুরু হয়ে বেলা বাড়লে সূর্য যখন তার প্রকোপ দেখাতে শুরু করবে তখন তার গরমে কৃষ্ণচূড়াও তার আগুন ছড়িয়ে দেবে বনে বনে। বনে আগুন অন্যেও ছড়ায়। ধূপের শুকনো ডালে ডালে ঘষা লেগে আগুন লাগে বনে, আর গ্রীষ্মের দাবদাহে শুকনো পাতায় সেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে যায়। গতকাল বেলা পড়ে আসার সময় জাফরান রঙের আগুন জঙ্গলে ছড়িয়ে যেতে দেখেছে বলরাম। বাতাসে সেই আগুনের গরম হলকা তার গুহাতে বসে টের পেয়েছে সে। আগুনের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে যেন আকাশ ছুঁতে চাইছিল। বন্য পশুদের জন্যে কষ্ট হয় বলরামের, মন্থরগতির প্রাণীরা দলে দলে আগুনে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে যায়। শ্বাপদের বাচ্চারা, সাপ, বনমোরগ সব ঝলসে যায়। নিরীহ হরিণ, ভালুক, এমনকি কত পাখি অসহায় ভাবে আটকা পরে আগুনের চক্রব্যূহে আর সহ্য করে মরণ যন্ত্রণা। আর যারা বেঁচে থাকে তাদের অনেকে

মারাত্মক আহত থাকে। কাল সারা সন্ধ্যা আর রাতে অনেকক্ষণ ঘৃতকুমারীর পাতা পাথরে বেটে মলম তৈরি করেছে বলরাম। বনে যেদিন আগুন লাগে তার পরদিন শবররা সকাল সকাল বনে ঢুকে পরে শিকারের জন্যে। আধমরা প্রাণীকে হত্যা করে শবরপল্লীতে রাতে ভোজ হয়। কিন্তু শবরপল্লী কাল রাতে ছিল ভয়ের মহামারীতে আক্রান্ত। কপাল ভালো থাকলে মহামারী থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রামের হিংস্র জমিদার জটামদনের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যমের হাতছানিকে উপেক্ষা করার মতো অসম্ভব। ওরা সারারাত জেগে ডেরা গুটিয়ে শেষরাতে উত্তরে রওনা দিল। বলরামকে শবরদের গোঠপতি বলেছিল তাদের সঙ্গে পলায়ন করতে, কেননা জটামদন বলরামকে কোনোমতেই নিস্কৃতি দেবে না। একজন রোমথা জঙ্গলের ভিতর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে জটামদনের গলায় বল্লম ঠেকিয়ে তার হাতের মুঠো থেকে তার শিকার যুবতী শবরী নারীকে উদ্ধার করবে, এ দুঃসাহস জটামদন স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। কিন্তু বলরাম জানে তার সঙ্গ শবরদের জন্য ভয়াবহ হতে পারে। রোমথা মৃত্যুকে একবার জয় করেছে, তার হারাবার কিছু নেই। তাছাড়া শবরদের খোঁজে জটামদন নিশ্চয়ই তার চর পাঠাবে। তার চেয়ে এই পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে থাকা সহজ, উপর থেকে নজর রাখা যায় নীচের পথে কারা আসছে যাচ্ছে। গুহা থেকে গ্রামের রাস্তা দেখা যায়। বলরাম অবাক হয়ে দেখল, এই ভোরবেলা একলা একটা মেয়ে আল পার হয়ে বনের দিকে চলেছে। এর মাথা খারাপ নাকি? বলরাম চমকে উঠল। ওই মেয়ে কি জানে না যে কাল জঙ্গলে অনেক পশু আহত হয়েছে? তাছাড়া ঝোপের ভিতর চোরা আগুন লুকিয়ে থাকে, পা ফেললেই হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠে পা পুড়িয়ে দেয়। পোশাক দেখে তো শবরের ঘরের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে না। আর শবররা তো কাল রাতেই নিজেদের পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে চলে গেছে। জটামদনের ভয় অগ্রাহ্য করে দ্রুতপদে পাহাড়ের পাথর থেকে পাথরে লাফাতে লাফাতে নীচে নামতে লাগল বলরাম। মেয়েটাকে আটকাতে হবে যাতে সে বনে প্রবেশ না করতে পারে।

*

ভানুমতীর মন ভালো নেই। গতকাল সন্ধেবেলা বাবাকে খেতে দিয়েছে এমন সময় বাড়িতে এল চন্দ্রা সুচ-সুতো চাইতে, শবরের মেয়ে, মা-র কাপড় শতছিদ্র সেগুলো সেলাই করার দরকার। চন্দ্রা আর ভানুমতী সমবয়সী কিন্তু চন্দ্রাকে দেখে মনে হয় যেন একটা ফ্যাকাসে চলমান শব, কাঁখে একটা মাটির হাঁড়ি, লাক্ষা দিয়ে জোড়া। নন্দীধনের ভাতের থালার দিকে যে ক্ষুধার্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিল চন্দ্রা—সিদ্ধ ঝরঝরে শালি চালের ভাত, দুধ, আখের গুড়ের মিছরির মতো

BanglaBook.org

'খণ্ডশালুক', সে দৃষ্টিতে যেন এক মুহূর্তের জন্যে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গা লোভের ঢেউ নন্দীধনের থালায় আছাড় খেয়ে পড়েছিল। এরপর কি সেই ভাত মুখে তোলা যায়? বাবার খাওয়ার পর চন্দ্রাকে খেতে বলেছিল ভানুমতী, কিন্তু সে মেয়ের খুব আত্মসম্মানবোধ, কিছুতেই খাবে না। সুচ-সুতোর সঙ্গে অনেকটা চাল, বহেঞ্চি, বাস্তুক শাক, সিহুল্লী শুঁটকি বেঁধে জোর করে চন্দ্রাকে দিয়েছিল সঙ্গে।

চন্দ্রাদের বাড়িতে প্রথমবার গিয়ে চমকে উঠেছিল ভানুমতী। হঠাৎ নেমে এসেছিল বৃষ্টি। চন্দ্রার মা চালের কাঁকর বাছতে বাছতে বাচ্চাদের তীব্র চিৎকার শান্ত করতে করতে ক্লান্ত। জরাজীর্ণ বাড়িতে ছাদের ফুটো দিয়ে বৃষ্টিধারা নেমে আসছে, এক হাতে মাথায় ভাঙা কুলো ধরে, অন্য হাতে ভাঙা মাটির হাড়ির টুকরো নিয়ে নেমে আসা জলের ধারা আটকাচ্ছে যাতে বিছানার খড়গুলো না ভিজে যায়। ভানুমতী দেখেছিল চন্দ্রাদের ছিটে বেড়ার কুঁড়েতে একটাই বড়ো ঘর—সেটাই ওদের রান্নাঘর, ঢেঁকিঘর, ভাঁড়ার ঘর, সেটাই ওদের শোবার ঘর। চন্দ্রা বলেছিল যে ওই ঘরের এক কোণে নাকি চন্দ্রার মা-র আতুর হবে।

চন্দ্রা বলে গেল একটা গোপন কথা ফিসফিস করে—এই সুচ-সুতো নাকি সে ফেরত দিতে আসবে না। জঙ্গলে গন্ধগোকুলের যে গাছের পাশে কাঠবিড়ালির বাসা আছে সেখানে সে এটা রেখে যাবে। ওরা নাকি গভীর রাতে এ-গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে উত্তরে অনেক দূরে—যেখানে দুশ্চরিত্র জটামদনের লম্বা হিংস্র হাত শবর মেয়েদের স্পর্শ করতে পারবে না। চন্দ্রা তাকে গা ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে যে ভানুমতী বাইরের কারুকে বলবে না—জটামদন জানতে পারলে লেঠেল পাঠিয়ে তাদের শেষ করে দেবে। চন্দ্রার চলে যাওয়ার পর থেকে ভানুমতী কাল সারারাত শুধু কেঁদেছে।

আজ সকালে বাবা বেরিয়ে গেল যজমানের বাড়ি—ফিরতে ফিরতে বিকাল হয়ে যাবে, বাবা বেরিয়ে যাওয়ার পরই ভানুমতী দরজায় কোঞ্চা তাল লাগিয়ে দৌড় লাগিয়েছে শবরদের বস্তির দিকে। আল থেকে ভানুমতী পিছন ফিরে দেখল—নীচে চয়নবিলের জলের পাশে একজোড়া চক্রবাক চঞ্চুতে চঞ্চু লাগিয়ে সোহাগে ব্যস্ত। ভানুমতী জানে যে চক্রবাকরা শাপগ্রস্ত অপ্সরা। এরা কোনো মুনির তপস্যা ভঙ্গ করতে গিয়ে শাপ মেখে এসেছে যে এরা দিনে যতই এদের প্রেমিকের কাছে থাকুক না কেন এদের রাত কাটবে একাকী। তাই এরা রাতের দীর্ঘ বিরহের পর সকালে একে অপরকে সোহাগে আদরে ভরিয়ে দিচ্ছে। দূরে পঞ্চানন মন্দির আর ওর বাড়ি দেখা যাচ্ছে, আরও দূরে দেখা যাচ্ছে পঞ্চমুণ্ড গ্রাম—বেগবতীর আঁচলে মোড়া।

আল পেরিয়ে নীচে তাকিয়ে দেখে গোটা শবর বস্তি মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে—ওদের কুকুর, মুরগি কিচ্ছু নেই—চন্দ্রারা গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। ভানুমতী

ছুট্টে আল থেকে নীচে নেমে এল শবরদের বস্তিতে, কান্নার দলা ভানুমতীর বুকের ভিতর হাতুড়ির মতো ঘা মারতে লাগল। ভানুমতী জানে শরীরের অঙ্গ থাকে, মনের থাকে কিনা ভানুমতী জানে না কিন্তু তার আজ মনে হচ্ছে যে তার মনের একটা অঙ্গ যেন খসে পড়েছে।

সেখান থেকে জঙ্গলের মুখে এসে ভানুমতী শুনল পিছনে পাহাড়ে পাথর পড়ার শব্দ। ভানুমতী চমকে দেখল, একটা মানুষ পাথরের ওপর দিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে নীচে তার দিকে নেমে আসছে। ভানুমতীর বুক ধ্বক করে উঠল।

রোমথা!

এর কথা তো সে ভুলেই গেছিল। গতকাল সন্ধ্যাবেলা জমিদারের পাইকরা রাস্তায় সিঙ্গা বাজিয়ে দুন্দুভি পিটতে পিটতে পঞ্চমুণ্ডবাসীদের সাবধান করে দিয়ে গেছে এক রোমথা নাকি পলাতক। এই বিপজ্জনক রোমথাই নাকি জঙ্গলে আগুন লাগিয়েছে, একে দেখলেই যেন জমিদারকে খবর দেওয়া হয়। কথাটা শুনে ভানুমতী ভয় পেয়ে গেছিল। রোমথা সে আগে একবারই দেখেছে। মাংসল কাফ্রির মতো কালো ছিল লোকটা। পায়ের সঙ্গে লোহার শিকল বাঁধা মনখানেক ভারী একটা বাবলা গাছের কাণ্ড দুহাতে তুলে ধীরে ধীরে অস্বষ্ঠ পদ্মনাভের পিছন পিছন আসছিল, কপালে খোদাই করে একটা ছাপ মারা। পদ্মনাভ নাকি ওকে হরিকেল থেকে নিয়ে এসেছে। মৃত্যুদণ্ডে শূলে চড়াবার মুহূর্তে নাকি ওকে রোমথা করে নেয় কবিরাজ পদ্মনাভ। অবশ্য সেই একবারই দেখা গেছিল লোকটাকে। আর তাকে গ্রামে দেখা যায়নি। ভানুমতী শিউরে উঠেছিল কানাঘুষা শুনে যে লোকটাকে নাকি পদ্মনাভ রোমথা করে এনেছিল মহামাঁষ তেল বানাবার জন্য। জ্যান্ত মানুষকে ফুটন্ত গরম তেলে ফেলে নাকি এই তেল বানানো হয়।

লোকটা ছুটতে ছুটতে এদিকেই আসছে ; ভানুমতী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল জঙ্গলের ভিতর। একটা ঝোপের আড়াল চাই। এদিকটা আগুন জ্বলে গাছ সমস্ত পুড়ে গেছে, আধপোড়া কাণ্ডগুলো কালো কাঠকয়লা হয়ে রয়েছে। ভানুমতী পিছন ফিরে তাকাল। লোকটা ছুটতে ছুটতে জঙ্গলে এসে ঢুকল। ভানুমতীর এখন সামনে দৌড়ানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। সামনে গন্ধগোকুলের ঝোপটা পেরিয়ে সে বনের কাঠুরিয়াদের রাস্তা ছেড়ে একটা শুড়িপথ ধরল। পাহাড়ি পথ ঝোপের মধ্যে দিয়ে অনেকটা উপরে উঠে গেছে, ভানুমতী উপরে এসে হাঁপাতে লাগল, তারপর পথ আবার নীচে নেমে একটা জলায় এসে মিশেছে। জলার পাশে এসে ভানুমতী পিছন ফিরে তাকাল ; মানুষটাকে আর দেখা যাচ্ছে না, ও নিশ্চয়ই সোজা পথে গেছে। ভানুমতী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজল, তারপর চোখ খুলেই চমকে উঠল সামনের জলা জায়গাটাতে কাদাঘাসের মধ্যে ঐরাবতের মতো এক বিশাল হাতি। ভানুমতীকে দেখে হাতিটা শুঁড় তুলে

বৃংহণে সারা জঙ্গল কাঁপিয়ে তার দিকে তেড়ে এল। ভানুমতীর শরীর ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল, দৌড় লাগাতে গিয়ে পিছন ফিরতেই ভানুমতী যেন যমকে দেখে আঁতকে উঠল।

পিছনে রোমথা!

সামনেও মরণ পিছনেও মরণ—ভানুমতী চোখ বন্ধ করে ফেলল ভয়ে—রোমথা এগিয়ে এসে ভানুমতীর দুই বাহু ধরল তারপর এক ঝটকায় ভানুমতীকে ছুড়ে দিল পাশের বাজবরণ, বঁইচির কাঁটাভরা ঝোপঝাড়ে আর নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়ল ভানুমতীর ওপর। কাঁটার তীক্ষ্ণ দংশনের যন্ত্রণার মধ্যেও ভানুমতী টের পেল পাশ দিয়ে যেন এক চলমান পর্বত গর্জন করতে করতে দৌড়ে চলে গেল। লোকটার নিঃশ্বাস পড়ছে ভানুমতীর গায়ে, ঝোপের পাতায়-ডালে-কাঁটায় ভানুমতী এমন ভাবে আটকে গেছে যে তার আর নড়ার ক্ষমতা নেই, লোকটার কপালে খোদাই করে লেখা 'রোমথা' যেন ভানুমতীর ক্রুর মৃত্যুপরোয়ানা। রোমথাটা উঠে দাঁড়াল। হাতিটা আবার ফিরে আসছে, এবার রোমথা ফাঁকা জমির ওপর দৌড় লাগাল, হাতি পিছনে পিছনে দৌড়ল। রোমথা এক লাফে সামনের মহীরূহের ডালে উঠে পড়ল আর হাতি গর্জন করতে করতে যেই নীচে এল, রোমথা হাতির পিঠে লাফ দিয়ে নামল। হাতির ঘাড়ের কাছে অনেকটা পোড়া দাগ—সম্ভবত কাল দাবানলে কোনো জ্বলন্ত গাছের ডাল ওর ঘাড়ে পড়েছে। রোমথা কোমরের গেঁজে থেকে বের করে সবুজ পাতা বাটা নিয়ে হাতির ঘাড়ের ঘায়ে চেপে ধরল। পাতার রস হাতির গলা বেয়ে নীচে নামতে লাগল। হাতি চিৎকার করে উঠল। রোমথাটা পাতার রস দিয়ে ভালো ভাবে ঘায়ে প্রলেপ লাগাতে লাগল আর হাতির দু'কানের পিছনে দু'পা দিয়ে হালকা ভাবে লাথি মারতে লাগল। ধীরে ধীরে হাতি যেন কোন্ মন্ত্রবলে শান্ত হয়ে গেল। হাতি পা মুড়ে মাটিতে বসল। রোমথা হাতির ঘাড়ে ভালো ভাবে মলম লেপে দিল আর হাতির গলার কাছে হাত দিয়ে থাবড়া মেরে চলল। ভানুমতীর কোনো ধারণা ছিল না লোকটার এত সাহস। সে রুদ্ধশ্বাসে দেখতে লাগল পশুকে বাঁচাবার জন্য মানুষের লড়াই। কত দণ্ড-পল কাটল ভানুমতী জানে না ; ঐরাবত উঠে দাঁড়াল তারপর শুঁড় নাড়িয়ে এক ছুটে চিৎকার করতে করতে জঙ্গলে মিলিয়ে গেল।

ভানুমতী যখন উপরে উঠে এল ওর সারা শরীর ঘামে সিক্ত, শাটক ছিন্ন হয়ে অন্তর্বাসের কাঁচুলি উঁকি মারছে, গলার সরু সুতলি হার, পায়ের পাইজোর কোথায় ছিটকে খুলে পড়ে গেছে। রোমথা তার কোমরের গেঁজের গাঙ্গৌর খুলে ভানুমতীকে দিল তার শরীরের ছিন্ন বস্ত্র ঢাকার জন্য। ভানুমতী তাকিয়ে দেখল তার রক্ষাকর্তাকে—সুন্দরকান্ত সুপুরুষ—যদিও কপালে রোমথার আগুনছাপ।

।। তেইশ ।।

একের পর এক কালো মেঘ কোথা থেকে উড়ে এসে চাঁদটাকে ঢেকে দিতে অন্ধকার পাঁচমুড়োর জ্যোৎস্নাকে গ্রাস করে ফেলল। হরু ঠাকুরের সম্বিত ফিরে এল। হরু ঠাকুর হতবাক হয়ে দেখল সে মাঠে আলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে জনমানব নেই।

এখানে সে কী ভাবে এল?

কোন্‌দিকে জমিদারবাড়ি তাও ঠাহর হচ্ছে না। হরু ঠাকুর ভয় পেয়ে গেল। মাঠে এই রাতে হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে এক জোড়া আলো দেখা গেল। ভালো করে তাকিয়ে হরু ঠাকুর বুঝল একটা গাড়ির হেডলাইট গ্রামের রাস্তায় দুলতে দুলতে তার দিকে আসছে। হেডলাইটের আলোয় হরু ঠাকুর দেখল গাড়ি চলাচল করার রাস্তাটা বেশি দূরে নয়। হরু ঠাকুরের মনে সাহস এল। আলের ওপর দিয়ে সে রাস্তার দিকে হাঁটতে লাগল, গাড়ির লোকজন যদি ভালো লোক হয় ওকে জমিদার বাড়ি পৌঁছে দেবে। হঠাৎ হরু ঠাকুর থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

এত রাতে কেন গাড়ি এই পাঁচমুড়োর অজ গাঁয়ে?

হরু ঠাকুর রাস্তায় না গিয়ে আল থেকে তাড়াতাড়ি মাঠে নেমে পড়ল। গাড়ির রাস্তা অনেকটা উঁচুতে। গাড়িটা কাছাকাছি এসে গেছে। হরু ঠাকুর উবু হয়ে ক্ষেতের ওপর বসে পড়ল।

গাড়িটা হরু ঠাকুরের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে একটু সামনে হঠাৎ ব্রেক কষল। হরু ঠাকুরের বুক ধ্বক করে উঠল। তবে কি ওরা ওকে দেখতে পেয়ে গেছে?

গাড়ি থেকে কথা বলতে বলতে জোরালো টর্চ নিয়ে প্রথমে যে নামল সে হরু ঠাকুরের দুঃস্বপ্নে দুঃস্বপ্ন।

পাগলা শেখ!

শেখের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নামল ধাড়া। সঙ্গে আরো একটা বড়ো টর্চ নিয়ে শেখের সাকরেদ দীর্ঘদেহী খুনেটা।

হরু ঠাকুর দমবন্ধ করে বসে রইল। ধাড়া তার মানে বাজিতপুর যায় নি? লোকগুলো এদিকে মাঠে টর্চ মারলেই হরু ঠাকুরকে দেখতে পেয়ে যাবে। দেখতে পেলে ওরা হরু ঠাকুরকে হয়তো এখানেই খুন করে ফেলবে।

ধাড়া আর শেখ কিন্তু মাঠের এদিকে এল না। ওরা রাস্তার অন্যদিকের মাঠে টর্চ হাতে নেমে পড়ল। একটা কাঁচা রাস্তা এঁকেবেঁকে মাঠের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। ওরা সেই পথে চলতে লাগল। হরু ঠাকুর একটু সাহস করে মাথাটা

BanglaBook.org

তুলে ওদের টর্চের আলোয় জায়গাটা চিনতে পারল। একটু দূরেই বিলের নীচ থেকে তোলা পাথরগুলো রাখা হয়েছিল। টর্চের আলো ক্রমশ দূরে সরে সরে মাঠের অনেকটা ভিতরে চলে গেল। হরু ঠাকুর বুঝল চয়নবিলের পাড়ে ধাড়া শেখকে পাথরের প্রত্নলিপি দেখাতে এনেছে। অন্ধকারে বার বার ক্যামেরার ফ্ল্যাশ লাইট জ্বলতে লাগল। হরু ঠাকুর জানে চয়নবিলের পাড়ে পাথর বেশি নেই, সব পাথর পলাশডাঙার মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কয়েকটা ভাঙাচোরা মাত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে।

হরু ঠাকুর মাথা আরও একটু উঁচু করে দেখতে লাগল কীর্তিকলাপ। শেখের দীর্ঘদেহী অনুচরটা একটা পাথর মাথার ওপর তুলে মাটিতে আছাড় মারতেই পাথরটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে গেল। লোকটা আরেকটা পাথর ও ভাবে তুলে ছুড়ে মারল। পাথর ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এতেও যেন শেখের রাগ গেল না, সে পা দিয়ে লাথি মেরে মেরে পাথরের ভাঙা টুকরোগুলোকে আরও ভাঙতে লাগল।

হরু ঠাকুরের মাথায় যেন খুন চেপে গেল। 'ব্যাটা বক্তিয়ার খিলজির অওলাদ' হরু ঠাকুর দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে বলল। 'আমাদের সব পুঁথি তো জ্বালিয়ে শেষ করেছিস। তাও আশ মেটে নি তোদের। দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা।' হরু ঠাকুর উবু হয়ে গাড়ির পিছনের চাকার সামনে এসে চাকার হাওয়া খোলার চেষ্টা করতে লাগল। হঠাৎ হরু ঠাকুরের নাকে আতরের তীব্র গন্ধ ভেসে এল। মোটা মোটা আঙুল পিছন থেকে হরু ঠাকুরের গলায় সাঁড়াশির মতো চেপে বসল।

হরু ঠাকুর শেখের অন্য চাকরটার কথা ভুলেই গেছিল।

মুহূর্তের মধ্যে এক ঝটকায় খুনেটা হরু ঠাকুরের গলা টিপে ধরে শূন্যে তুলে ধরল আর জোরে চেঁচিয়ে আরবিতে কিছু বলল। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে দূরের টর্চগুলো তাদের দিকে নিক্ষিপ্ত হল। শেখ ওখান থেকে চেঁচিয়ে কিছু একটা হুকুম দিল, সাঁড়াশির দাঁড়া এবার দু'হাতে তার গলায় আরও জোরে চেপে বসতে লাগল। হরু ঠাকুর বুঝল শেখ তার মৃত্যুদণ্ড দিল। হরু ঠাকুরের দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। চোখ দু'টো যেন অক্ষিকোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল। হরু ঠাকুর দু'পা শূন্যে দুলিয়ে ছাড়ান পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। কিন্তু লোকটার গায়ে অসুরের শক্তি। সাঁড়াশির দাঁড়া আরও জোরে গলায় চেপে বসল। দ্রুত হরু ঠাকুরের দেহ অসাড় হয়ে এল। হঠাৎ সাঁড়াশির দৃঢ় বন্ধন আলগা হয়ে গেল। হরু ঠাকুরের দেহ মাটিতে পড়তে পড়তে হরু ঠাকুর দেখল লোকটা পায়ে হাত দিয়ে বসে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। একটা আস্তিকমুনী লতাপাতা দ্রুত মাঠে নেমে গেল।

হরু ঠাকুর লতা চেনে—পদ্মগোখরো।

শেখের অন্য খুনে সাকরেদটা আর ধাড়া দৌড়ে আসতে লাগল। হরু ঠাকুর এক নিমেষে উলটো দিকের মাঠে আখের ক্ষেতের ভিতর নেমে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে দৌড়োতে লাগল। দৌড়াতে দৌড়াতে হরু ঠাকুর টের পেল গাড়িটা যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে দ্রুতগতিতে চলে গেল। হরু ঠাকুর এবার হাঁফাতে হাঁফাতে ক্ষেত থেকে আলে ওঠার জন্য পা বাড়াল, কিন্তু আল যেন পাঁচিলের মতো উঁচু হয়ে গেছে। আলের ঢালে চড়তে চড়তে হরু ঠাকুরের হৃদপিণ্ডটা যেন আর বুকের খাঁচায় আটকে থাকতে চাইল না। হরু ঠাকুর চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। হাওয়া চাই হাওয়া। হরু ঠাকুর আকাশের দিকে তাকাল, তারপর জ্ঞান হারিয়ে আলের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল।

।। চব্বিশ ।।

গুহার মুখে বসে বলরাম সন্ধ্যা নেমে আসা দেখছিল। বসন্তে সেজে উঠেছে পঞ্চমুণ্ড গ্রামের প্রকৃতি। সূর্যের আলোতে লালিমা বেড়ে গেছে, দিন লম্বা হয়ে গেছে। আমের পাতার ফাঁকে কোকিলটা আমের মুকুলের গন্ধে মাতাল হয়ে একটানা ডেকেই চলেছে, দখিনা বাতাসে যেন মালাবারের চন্দনের ঘ্রাণ, পুকুরে পদ্মের না ফোটা কলি ফোটবার জন্য ছটফট করছে, যেমন টিয়াপাখির বাচ্চাগুলো ওড়ার জন্যে অপরিণত ডানা ঝাপটে ছটফট করে, আমের মুকুলে মৌমাছি গুনগুন করছে, পলাশ ফুল যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে পিছনে বন-বনান্তে। পলাশের পাতায় গায়ের রঙ মিলিয়ে বসে আছে টিয়ার ঝাঁক।

গুহার আশেপাশে চারদিকে ভ্রমরের ঝাঁক—ভ্রমর যেন বসন্তের বাহন। বসন্তের আমেজ এরা গুনগুনিয়ে পৌঁছে দিচ্ছে জুঁই ফুলের পাতায় পাতায়, বিচকিলা জুঁইগুলো থোকা থোকা মুক্তোর মতো ফুটে উঠেছে। যে গাছে ফুল এখনো আসেনি তাদের কাছে ভ্রমর যেন বসন্তের দূত হয়ে ফিসফিস করে বলছে সময় হয়েছে আনন্দ-উৎসবের, এবার জাগো। ডুমুরের ডালে পুরোনো পাতা খসে নতুন পর্ণবাস, বলরাম অশোকের লাল আগুনের দিকে তাকিয়ে যেন সম্মোহিত হয়ে গেল, চোখ যেন সরানো যায় না এত রূপ অশোকবনের। চাঁপাফুলের সাঁঝবাতিরা দিনের শেষ আলো থাকতে থাকতে জ্বলে উঠছে, পশ্চিম দিগন্তে বুড়ো সারসের মাথার মতো লাল সূর্যটা পাহাড়ের মাথা থেকে সবুজ বনের আঁচলের ভিতর এই ঢলে পড়ল বলে। বলরাম জানে গাঁয়ের বধূ কুয়ার শীতল জলে শরীর ঠাণ্ডা করে, শরীরে বকুল ফুলের হলুদ রেণু লেপে অপেক্ষা করে আছে তার সোয়ামীর জন্যে—কানে ছোট্ট

আমের মুকুলের দুল দুলছে, কোমরে-পাছায় দোলে কুরবকের মালা, বুকে দুলছে লাল অশোকের মালা, বিনুনিতে মাধবী। রাতে শয্যায় সব ফুল সঙ্গমে একাকার হয়ে সোয়ামীর সোহাগের সাক্ষী হয়ে সকালের অপেক্ষা করবে।

ধীরে ধীরে আঁধার সূর্যের লালিমা পান করে চলল। কাকগুলো বটের ডালের ভিতর বাসায় ডেকে ডেকে একসময় চুপ হয়ে গেল। কোটরে মুখ বের করে পেঁচা দেখে নিল এই আলো তার চোখ সহ্য করতে পারবে কিনা। বলরাম জানে এবার সরীসৃপেরা বাইরে আসবে তাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য, বাইরে আসবে হিংস্র শ্বাপদেরা। গুহার মুখে পাথরে লৌহ-শলাকা গেঁথে বলরাম তাতে লোহার মশারি আটকে গুহামুখে জানোয়ারের প্রবেশের অন্তরাল সৃষ্টি করে। বলরাম ধীরে ধীরে নীচে ঝর্ণায় গেল বড় ভাণ্ডি নিয়ে রাক্ষসীবেলায়, পশুরা জল পান করতে আসার আগে ফিরে আসবে। কিন্তু বলরাম জানত না ঝরনার ধারে অনেকগুলো শ্বাপদ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে তার জন্যে—তাদের হাতে টঙ্কী, কুড়ারি, বল্লম, কারো হাতে শূল, লাঠি, কারও হাতে শাণিত তরবারি। পাথরের ওপর বসে সবচেয়ে হিংস্র শ্বাপদ জটামদন।

অতর্কিত বন্দি হল বলরাম। জটামদনের চোখ রাগে রক্তবর্ণ, মুখে মদিরার উগ্র গন্ধ। জটামদনের পাশে পাথরে গাঁথা শূলদণ্ড—এটা বধ্যভূমি। অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড এখানে কার্যকর করা হয়। জটামদন আদেশ দিল বলরামকে শূলে চড়ানো হোক।

বলরামকে পিছমোড়া করে বেঁধে তরবারি বল্লায় ঠেকিয়ে শূলের কাছে আনা হল। বলরাম চোখ বন্ধ করে জিম্মানির চরণ স্মরণ করল।

'দাঁড়াও।'

বজ্রনাদে বলরাম চোখ খুলল। পাথরের ওপর এক দীর্ঘকায় ছায়া।

'আমি কবিরাজ নন্দীধন। মৃত্যুদণ্ডে আদিষ্ট এই অপরাধীকে আমার রোমথা করতে চাই।'

'অসম্ভব! এ আমার শিকার—' জটামদন গর্জে উঠল। 'ভুলেও এর কাছে এসো না।'

'এ কবিরাজের অধিকার।' অনলবর্ষী নয়নে নন্দীধন বাজুবন্ধে প্রতাপাদিত্যের তাম্রপত্র হাত তুলে দেখাল। 'মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এই ব্যক্তিকে আমার রোমথা করলাম।'

রোষকষায়িত দৃষ্টিতে জটামদন দলবলসহ স্থান পরিত্যাগ করার সময় বলরাম ও নন্দীধনকে শাসিয়ে গেল। বলরামের চোখে জল। দু'দুবার মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেল সে। ঈশ্বরের এ কি রকম খেলা! বলরাম যুক্ত কর-এ জীবনদাতা নন্দীধনকে প্রণাম করল।

'কী তোমার পরিচয়?' নন্দীধন জিজ্ঞাসা করলেন।

BanglaBook.org

'আমি রোমথা।'

'তোমার ললাটের চিহ্ন সে পরিচয় জানাচ্ছে। তোমার নাম কি?'

'আমি বলরাম, বাস ছিল একসময়ে বারেন্দ্রে ধুলা গ্রামে। আমরা বৌদ্ধ।'

'কোন্ অপরাধে তোমার মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল?'

'বিখ্যাত ব্রাহ্মণ কুলজ্ঞ কুমারাচার্য বৌদ্ধদের ঘৃণা করতেন। বৌদ্ধদের ওপর এক চরম আঘাত হানার জন্য তিনি মৃত্যুপণ করে ধুলাগ্রামের সঙ্ঘারাম-বিহারের স্থবির অগ্নিমিত্রকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন এবং পরাজিত করেন। পরাজিত অগ্নিমিত্র আগুনে আত্মহুতি দেন।'

নন্দীধন শিউরে উঠলেন। তিনি জানেন সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা বৌদ্ধদের ঘৃণা করে। তারা ভাবে বুদ্ধদেব সংস্কৃত ভাষার ক্ষতি করে গেছেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে বুদ্ধদেব বলে গেছিলেন আমার উপদেশবাক্য যে সংস্কৃতে অনুবাদ করবে সে বিশেষ অপরাধী হবে। আমি যেমন পালিভাষায় উপদেশ দিচ্ছি, তেমন তোমরাও গ্রন্থাদিতে পালি ভাষায় লিখবে। তাই বুদ্ধবাক্য ত্রিপিটক পালিভাষায় লিখিত হয়েছিল। সংস্কৃত যদি দেবভাষা হয়, তবে বুদ্ধ সংস্কৃতের স্বর্গারোহণ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন এবং ভাষার ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন।

'এতেও কুমারাচার্য শান্ত হলেন না, তিনি অগ্নিমিত্রের প্রিয় শিষ্য আমার পিতা গণিতজ্ঞ জিম্মানির সঙ্গে মৃত্যুপণ করে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন, কিন্তু এবার তিনি পরাজিত হলেন,' বলরাম বলে চলল। 'পরাস্ত ও অপমানিত হয়ে কুমারাচার্য বনে গিয়ে প্রাণত্যাগ করেন। এতে তার পুত্র পণ্ডিত যোগেশ্বর বৌদ্ধদের ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা করেন। ইনি আমার পিতাকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন এবং আমার মৃত্যুপণ করে তর্কযুদ্ধ শুরু করেন। তিনদিন তুমুল তর্কের পর আমার পিতা পরাজিত হন এবং তাতে আমার মৃত্যুদণ্ড হয়। আমার পিতা মনস্তাপে আগুনে ঝাঁপ দেন এতে যোগেশ্বরের ক্রোধ প্রশমিত হয়। যোগেশ্বর নিজে কবিরাজ ছিলেন। তিনি আমাকে রোমথা করে আমার প্রাণ বাঁচান। কিন্তু যোগেশ্বর বেশীদিন বাঁচলেন না, তিনি নিজে রাজরোগে আক্রান্ত ছিলেন। মৃত্যুকাল আসন্ন হলে যোগেশ্বর আমাকে মুক্তি দেন বটে কিন্তু সেই মুক্তিদানের কেউ সাক্ষী ছিল না। পলাতক রোমথার শাস্তি মৃত্যু। তাই তারপর থেকে আমি বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। কপালের ছাপের জন্য আমি লোকালয়ে যেতে পারি না।'

'জটামদন কেন তোমাকে হত্যা করতে চায়?'

'আমি চরিত্রহীন জমিদারের মুখের শিকার ওকে গ্রাস করতে দিইনি তাই।'

'ঘটনাটা খুলে বলো।'

'শবরের বস্তির অল্পবয়সী মেয়েরা রোজ ভোরে জঙ্গলে যায়।'

'জঙ্গলে ওদের রেশম চাষের 'বানক' আছে—' নন্দীধন বললেন—'অল্পবয়সী মেয়েরাই সর্বোৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম মসলিন তৈরি করতে পারে। এদের ত্বকের ইন্দ্রিয় এত তীক্ষ্ণ হয় যে সূতার ভার সামান্য বৃদ্ধি হলেই এরা সেটা অনুভব করতে পারে। ত্রিশের বেশি বয়স হয়ে গেলে তাদের এই ইন্দ্রিয় ভোঁতা হয়ে যায়, তখন ওরা এই কাজে অপটু হয়ে পড়ে।'

'কিন্তু, অত ভোরে কেন?'

'ডলন কাঠির টেকো দু'আঙুলে ঘোরাতে গিয়ে বেশ ভার লাগে আর গরমে আঙ্গুল ঘেমে যায়। বেশি গরমে উৎকৃষ্ট মসলিনের সূক্ষ্ম সূতো তৈরি হয় না, তাই ওরা ভোরে কিংবা সূর্যাস্তের সময় সূতা কাটে। এদের তৈরি সূক্ষ্ম রেশমের পোশাক সম্রাজ্ঞীরা বা রাজনর্তকীরা পরে। আসল ঘটনাটা বল।'

'কিছুদিন ধরে গুহার থেকে লক্ষ করছিলাম জমিদারের পাইকরা লুকিয়ে লুকিয়ে শবর মেয়েদের গতিবিধি লক্ষ্য করে। প্রথমে ভেবেছিলাম ওরা বুঝি মেয়েদের জঙ্গলে রক্ষা করার জন্য ওখানে থাকে, তারপর বুঝলাম ওদের অভিপ্রায় বদ। আমার পাহাড়ের গুহা থেকে জঙ্গলের অনেকটা দেখা যায়। তাই আমি ওদের ওপর নজর রাখলাম। গতকাল এক শবর রমণীর চিৎকার শুনে ওপর থেকে দেখলাম জমিদার তার শিকার ধরতে ব্যস্ত। কাপুরুষটাকে ঘায়েল করতে বেশি কষ্ট করতে হয় নি। তাই ওর রাগ আমার ওপর।'

নন্দীধনকে চিন্তিত দেখাল। জটামদনের প্রতিহিংসা কি তা সে ভালোই জানে। জটামদন বলরামকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে। বলরামকে তাড়াতাড়ি কোথাও সরাতে হবে। কিন্তু কোথায়? কীভাবে? জটামদনের গুপ্তচর সর্বত্র—ব্যাপারী, ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী, ঘাটের পাটনি। নন্দীধন জিজ্ঞাসা করলেন—বলরাম কী কাজ জানে, বলরাম বলল যে সে পাথরের কারিগর। পুরুষানুক্রমে তারা প্রভু বুদ্ধের বাণী পাথর কুঁদে লিখে আসছে। তার পূর্বপুরুষদের সম্রাট অশোকের শিলালিপি লিখনের সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে যেতে হত।

নন্দীধন বললেন যে তিনি তাঁর কন্যার কাছ থেকে শুনেছেন কী ভাবে বলরাম নিজের প্রাণ বিপন্ন করে তাঁর কন্যার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। এর জন্য নন্দীধন বিশেষ কৃতজ্ঞ। এর প্রতিদানে নন্দীধন বলরামকে তাঁর রোমথা করেছেন। কিন্তু জটামদন কিছুতেই বলরামকে চরম শাস্তি না দিয়ে ছাড়বে না। তাই তিনি বলরামকে আপাতত চয়নবিলের তীরে সঙ্ঘারাম-বিহারে লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। এখন সময় নষ্ট না করে শীঘ্র পাহাড় থেকে নীচে নামতে হবে। বলরাম তার নতুন মনিবকে প্রণাম করল। বলরাম গুহা থেকে তার ঝোলা কাঁধে নিয়ে তার মনিবের সঙ্গে নীচে আধো আঁধারে পথে নেমে এল। রোমথার দ্বিতীয়বার পুনর্জন্ম হল।

BanglaBook.org

দ্রুতপদে ফিরে আসছিল নন্দীধন, সঙ্গে বলরাম। আকাশের চাঁদের আলো পথ দেখাচ্ছে তাদের। আল ধরে মাঠ পেরিয়ে গ্রামের কাঁচা পথে পড়ল নন্দীধন। মাঠে অন্ধকারে জোনাকিরা যেন কালো রেশমি ওড়নায় চুমকি। আর একটা কালো রেশমি ওড়নায় মুখ ঢেকে একজন যেন বুকে নিশ্বাস চেপে তাকে মুখোমুখি পেরিয়ে গেল। নন্দীধন নজর করল চন্দ্রালোকে চিকমিক করে ওঠা হাতের সবুজ পান্না খচিত সোনার বালা, নীলকান্তমণির হার, অভিসারিকার কানের কাছে ময়ূরের ছোটো পালক, গায়ে চন্দনের সুবাস।

প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পর জটামদনের সময় থেকে পঞ্চমুণ্ড গ্রামে গরিবের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ধনীরা যেন দিনের পর দিন নিষ্ঠুরতা বাড়িয়ে চলেছে। রাস্তার কোনায় বসে ভিখারিটা শতচ্ছিন্ন কম্বল গায়ে দিয়ে কাশছে, মুখের কোনা দিয়ে লালা গড়িয়ে ঝুলছে। নন্দীধন বুঝল এর শীঘ্র ওষুধ লাগবে। কিন্তু অম্বষ্ঠের কাছে যাবার মতো এই গরিবের সামর্থ্য নেই। অন্য সময় হলে নন্দীধন বৃদ্ধকে বলত মন্দিরে আসতে। বৃদ্ধ নিশ্চয়ই অভুক্ত। নন্দীধনের মনে পড়ল কত খাবার ধনীদের বাড়িতে ব্রাহ্মণভোজনের সময় উদ্বৃত্ত হয়ে নষ্ট হয়। নন্দীধন বৃদ্ধকে বলল বসে থাকতে সে খাবার এবং ওষুধ পাঠিয়ে দেবে। নন্দীধন জানেন এই মানুষগুলোর কোনো বাড়িঘর নেই। এরা খড় বিছিয়ে কোনো মন্দিরের চাতালে শতচ্ছিন্ন চাদর গায়ে ঢেকে রাতটা কাটায় আর সারাদিন চেষ্টা করে ভিক্ষা করে গ্রাসাচ্ছাদন জোগাড় করতে। কিন্তু এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল কী ভাবে বলরামের প্রাণ বাঁচাবে তার উপায় করা।

জটামদনের রাজত্বে চারদিকে গরিবি। বাংলার সাধারণ হিন্দু মানুষের জন্যে কষ্ট হয় নন্দীধনের। একদিকে বহিরাগত সুলতান সুবেদারদের লুটতরাজ আর অন্যদিকে ধর্মের নামে অত্যাচার। হিন্দুসমাজের বিশুদ্ধিকরণ ও উচ্চ আদর্শ রক্ষা করার জন্যে মুহুর্মুহু নেমে আসছে ব্রাহ্মণদের শাসনের খাড়া। যদি কেউ মুসলমান সমাজের দ্বারা এতটুকু অপমানিত হত, তাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক রাখতে উচ্চবংশীয়রা ইতস্তত করতেন। মুসলমানদের অত্যাচারের ফলে কুলঞ্জের অনেক কুলীনের কুলপাত হবার উপক্রম হয়েছিল। পাছে কেউ মুসলমান সংস্রবের পক্ষপাত করেন সেই আশঙ্কায় যাদের ওপর মুসলমানদের অত্যাচার হয়েছে তাদের সহানুভূতি না দেখিয়ে ব্রাহ্মণসমাজ তাদের শাস্তি দিচ্ছে। প্রভাকরের পত্নীকে আলিয়া খানের সেনারা উঠিয়ে নিয়ে গেল, তার অপরাধে প্রভাকরকে দোষী সাব্যস্ত করে ব্রাহ্মণ সমাজ প্রভাকরকে একঘরে করে দিল। কোনো আত্মীয় তার বাড়িতে খায় না, এমনকি ভিক্ষাজীবী বৈষ্ণবেরা ওর বাড়ি ভিক্ষা চাইতে যায় না। নন্দীধন দেখেছেন সমাজটা দ্রুত ধীরে

ধীরে মাঝ নদীতে ভেঙ্গে যাওয়া নৌকার মতো তলিয়ে যাচ্ছে। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, আবৃত্তি, নিষ্ঠা, তপঃ ও দান এসকল কুললক্ষণ আর মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। সন্ধ্যা, আহ্নিক, নিত্য পূজা ছেড়ে অনেক ব্রাহ্মণ শুধু গায়ত্রী মন্ত্র স্মরণ করে ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করতে লেগেছে। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যারা বৌদ্ধ হয়ে গেছিল, তাদের সমাজেও অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। এক সময়ে পালরাজাদের অনুকরণে ও শ্রীজ্ঞান অতীশের ধর্মোপদেশে বৌদ্ধতন্ত্র প্রচার লাভ করেছিল। সেই তন্ত্রের রীতি মেনে নীচ জাতীয়া রমণী ও বেশ্যা প্রভৃতিদের নিয়ে ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। আজকাল বৌদ্ধরা তন্ত্রের দোহাই দিয়ে ইন্দ্রিয় লালসা পূরণে মেতে উঠেছে—তাই গণিকা, অভিসারিকাতে সন্ধ্যার পর রাস্তায় থিক থিক করে। নন্দীধনের গা রি-রি করে।

সঙ্ঘারাম-বিহারে পৌছোতে পৌছোতে রাত্রি হয়ে গেল। সঙ্ঘের স্থবির জ্ঞানদত্ত শ্রীহট্টে নন্দীধনের বিদ্যালয়ের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু বিহারের দ্বারে নন্দীধন খবর পেলেন জ্ঞানদত্ত গৌড় থেকে আজ অধিক রাতে ফিরবেন।

নন্দীধন স্থির করলেন পরদিন প্রভাতে বলরামকে নিয়ে আবার সঙ্ঘারাম-বিহারে আসবেন। বলরামকে নিয়ে দ্রুত পঞ্চানন মন্দিরে এলেন তিনি। বলরামকে পঞ্চানন মন্দিরের সংলগ্ন কক্ষের কুঁজি তাল খুলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে নন্দীধন বললেন—আজ রাত্রি বলরাম এই কক্ষে অতিবাহিত করুক, নন্দীধন শয্যার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। কাল প্রাতে তাকে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম-বিহারে নিয়ে যাবেন।

বলরাম বলল—সে বৌদ্ধ, বৌদ্ধরা উচ্চাসন, মহাসন ত্যাগ করে মাটিতে শয়ন করে, শয়নের জন্য একখানা কম্বল তার কাছে আছে।

'উত্তম,' গৃহের দিকে দ্রুত পা চালাল নন্দীধন। ঘরে ভানুমতী একলা।

।। পঁচিশ ।।

খুব ভোরে কালাচাঁদের ঘুম ভেঙ্গে গেল হৈ হট্টগোলে। কারা জোরে জোরে সদর দরজা ধাক্কাচ্ছে। বিছানায় ধড়মড় করে উঠে বসে কালাচাঁদ দেখল বদন পাশে ঘুমোচ্ছে, হরু ঠাকুর বিছানায় নেই। কালাচাঁদ উঠে গিয়ে দরজা খুলে অবাক। তিনজন গ্রামবাসী হরু ঠাকুরকে একটা রিক্সা-ভ্যানে শুইয়ে নিয়ে এসেছে। একজন বলল যে ভাগ্যিস তারা কবিরাজকে শেষ রাতে বাড়িতে ডাকতে যাবার সময় একে দেখতে পায় না হলে আলের ওপর অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকা এই বুড়োকে শেয়ালে

BanglaBook.org

খেয়ে নিত। হৈচৈ শুনে পিছনে বদন আর কর্তামশাই ঘুম চোখে এসে দাঁড়াল। পরশু কর্তা মশাইয়ের সঙ্গে একে পলাশডাঙার মাঠে দেখেছিল তাই সোজা এখানে নিয়ে এসেছে। হরু ঠাকুরকে ধরাধরি করে বিছানায় শোয়ানো হল, নাড়ি তখনও তার ধীরে চলছে। 'কবিরাজ বলেছে ভয়ের কিছু নেই, বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যাবে—' গ্রামের মানুষগুলো বিদায় নিল।

হরু ঠাকুর টানা দুপুর পর্যন্ত ঘুমাল। ঘুম থেকে উঠে বৈঠকখানায় এসে সদানন্দকে জিজ্ঞাসা করল—'আগেকার কালে বাংলার গ্রামে জমির শেষে কি বিশাল উঁচু উঁচু আল দেওয়া হত?'

সদানন্দ বললেন, 'হ্যাঁ দিত। প্রায় আট দশ গজ উঁচু আর প্রায় পনেরো-বিশ গজ প্রশস্ত আল—তাই দেখে আবুল ফজল আইন-এ-আকবরী-তে বলেছিলেন যে বঙ্গের সঙ্গে ওই আল থেকেই বঙ্গাল নাম হয়েছে। তবে আবুল ফজল বোধ হয় ঠিক—' সদানন্দ বলতে গিয়ে থেমে বললেন, 'কেন বল তো?'

হরু ঠাকুর কালাচাঁদকে বলল, 'আমার খাতা কলমটা কি ও ঘরে আছে?'

কালাচাঁদ বলল, 'হ্যাঁ।'

সকলকে অবাক করে দিয়ে হরু ঠাকুর গম্ভীর মুখে আবার ঘরে ফিরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। কালাচাঁদ দরজা ধাক্কাতে যাচ্ছিল, সদানন্দ বাধা দিল—'ও এখন লিখবে, ওকে লিখতে দে।'

BanglaBook.org

পাঁচমুড়োতে সন্ধ্যা নেমে এলেও হরু ঠাকুর যখন দরজা খুলল না, তখন কালাচাঁদের ভয় হল কিছু গণ্ডগোল হয়নি তো? কালাচাঁদ হরু ঠাকুরের ঘরের বন্ধ দরজা ধাক্কাল। দু'তিনবার ধাক্কা মারার পর হরু ঠাকুর দরজা খুলে মুখ বার করল, দু'চোখ বেদানার মতো লাল—'দিলি তো সব গুবলেট করে। লেখার সমস্ত তাল কেটে গেল। আবার কেঁচেগণ্ডুষ করতে হবে।'

কালাচাঁদ মিনমিন করে বলল, 'নাওয়া নেই খাওয়া নেই, শরীরটা আবার খারাপ হল কিনা তার খোঁজ নেব না?'

হরু ঠাকুর দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বলল, 'খুব খিদে পেয়েছে।'

কালাচাঁদ হরু ঠাকুরকে রান্নাঘরে নিয়ে তাড়াতাড়ি কিছুটা ভাত-ডাল গরম করে দিল। হরু ঠাকুর হাপুস-হুপুস করে খেয়ে এক গ্লাস জল ঢকঢক করে খেয়ে একটা সিংহের গর্জনের মতো বড়ো ঢেকুর তুলে বলল, 'আরবের শেখটার সাহস কম না!'

'মামা প্লিজ, ওসব কথা এখন থাক, তোমার শরীর ভালো না—' বদন বলল।

'আমার চোখের সামনে চয়নবিলের পাড়ে আছাড় মেরে মেরে পাথরগুলো ভাঙল।' হরু ঠাকুর বদনের কথায় আমল দিল না। 'যদি এগুলোকে বাঁচাতে চাস

ঘরের এই পাথরগুলো শিগগির লুকিয়ে ফ্যাল কালা, আর ঘুণাক্ষরেও পলাশডাঙার কথা যেন ধাড়া না জানতে পারে।'

কালাচাঁদ হতভম্ব হয়ে গেল হরু ঠাকুরের কাহিনি শুনে।

'পাথরগুলোকে আমার শোওয়ার ঘরে পালঙ্কের নীচে ঢুকিয়ে রাখবে বাবা বদন?' সদানন্দ অনুরোধ করলেন। বদন খুব সাবধানে পাথর দু'টো পালঙ্কের নীচে ঢুকিয়ে দিল যাতে না দেখা যায়। তারপর বাইরের ঘরে ফিরে এল।

'কর্তামশাই, শুনবেন নাকি পঞ্চাননমঙ্গল? মানে, যতটা লিখেছি—'

সদানন্দ ভটচাজ চেয়ারে বসে বলল, 'শোনাও শোনাও, নিশ্চয়ই শুনব।'

হরু ঠাকুর হাত মুখ ধুয়ে খাতা খুলে বলল, 'প্রথমে সিদ্ধিদাতা গণেশের স্তব করব, তারপর বিদ্যাদেবী সরস্বতীর স্তব করব, তারপর মাতা লক্ষ্মীর স্তব করব, তারপর বেদের দেবতা সূর্যের স্তব করে আমার মঙ্গলকাব্য শুরু করব।'

হরু ঠাকুর পড়তে লাগল—

গণেশ বন্দনা।

নমসি গণেশ চরণ লম্বোদর গজানন
রাখুক তোহ্মার চারি হাথ।
তোহোর সুর ছান্দে মোঞে আখর বান্ধে
পঞ্চানন কাহিনী সূত্রপাত।
ভকতী দিলেঁ বাপেঁ মাঞঁ নিবেদিলোঁ তোহ্মার পাএ
বউল মাল বত্মনে হাথে।
দেব বক্রতুন্ড মহাকাএ পৃথুবি তোহোর গীত গাএ
দিহ সিদ্ধি তুহ্মি মোর মাথে॥

হরু ঠাকুর দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল, তারপর বলল—এবার সরস্বতী বন্দনা—

সরস্বতী বন্দনা।

সরস্বতী ভারতী আরপি মোর আরতী
নেহ জেন বরিষে আঝর।
লিখি পঞ্চানন গাথা সকতী দিহ হে মাতা
মন শরণ ভৈলোঁ তোহোর।
সজাইবোঁ তিলে তিলে গণিত ছান্দএ মিলে
কাহিনী আঞ্জলী বান্ধিআঁ।
হে শেত সরস্বতী দিহ হে শুভ মতি
দাস মাঙ্গএ চরণে কান্দিআঁ॥

BanglaBook.org

হরু ঠাকুর দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল, তারপর বলল—এবার লক্ষ্মী বন্দনা—

লক্ষ্মী বন্দনা।

নমসি লক্ষ্মী মাঞঁ কমল ফুটিলছে পাএ
মেদনীত করুণা বরষে।
তোহ্মার করাতেঁ ধান মাথার মণ্ডল মান
সদা সুখ তোহ্মার হরষে।
হে মহালক্ষ্মী মাতা শিঅরে শান্তি দাতা
বন্দী তোহ্মার চরণে।
সতোঁ আঁকড়ে ধরি আন্তরে তোহেঁ স্মরি
তব পাএ পাঁও জেন মরণে॥

হরু ঠাকুর দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল, তারপর বলল—এবার সূর্য বন্দনা—

সূর্যবন্দনা।

উয়িল নবসূরে সহস্র যুগ দূরে
চৌদিশে ঘুচে আঁধার।
ঝাঁটে রআনী টুটে সন্ধাঞিঁ সংপুটে
করযোড় সংসার।
জুতি তোহ্মা দিনমণি চুম্বীল সভ ধরণী
মাতিল ধরা রৌদ ভানে।
লঅ প্রণাম মনত প্রভু প্রভাত আদিত
পরাণী মজে বেদ গানে।

হরু ঠাকুর কপালে হাত জোড় নমস্কার করল।

কালাচাঁদ বলল, 'আরিব্বাস, এতো সেই হাড্ডিকুড্ডি ভাষায় লিখে ফেললে গো হরু ঠাকুর!'

সদানন্দ বললেন, 'কাল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনটা বেশ মন দিয়ে পড়েছ দেখছি।'

হরু ঠাকুর রহস্যময় অন্যমনস্ক হাসি হেসে বলল, 'এবার প্রস্থারম্ভ। প্রথম দু'টো লাইন আমি চয়নবিলের পাথর থেকে টুকেছি,' হরু ঠাকুর পড়তে লাগল—

জপয়ে কবিরাজ পঞ্চানন নাম।
বেগবতী নইকূলে পঞ্চমুন্ড গ্রাম॥
পরজা সন্ধে অন্নপাণি ছছন্দে পাআঁ।
পঞ্চাননে পুজে কামোদ ধানশী গাআঁ॥
বামে বহে বেগবতী ডাহিনেঁ পাথর।

BanglaBook.org

মাঝত পঞ্চমুন্ড গ্রাম পাছে পান্তর॥
সরোঅর দহ এক পাণি বার মায।
পঞ্চানন দেব দুআর তারি পুব পাস॥
গহন আন্ধারী বন পাথরের পার।
বনত আন্ধারে বাঘ হাথী দুরুবার॥
পঞ্চানন দেব মোর আইলাহা সপনে।
পঞ্চানন তত্ত্ব তেএঁ কবিরাজ ভণে॥ —ঠিক হচ্ছে?'

'কবিরাজ কেন?' বদন বলল। 'ওটা কবি হরু ঠাকুর হবে।'

'হরু ঠাকুরের কবিগান কখনও শুনেছ তোমরা?' হরু ঠাকুর বলল।

'তোমার কবিগান?' কালাচাঁদ বলল।

'না রে, আসল হরু ঠাকুর ছিল প্রায় তিনশো বছর আগেকার এক কবি। বর্ধমানের রাজসভা, কৃষ্ণনগর রাজসভা, কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়িতে কবিগান গাইতেন। হরু ঠাকুর আমার বাবার প্রিয় কবি ছিলেন। আমি তখন খুব ছোটো, মনে আছে বাবা বাড়িতে গুনগুন করে হরু ঠাকুরের গান গাইতেন—

এ তো বড় রঙ যাদু এ তো বড় রঙ্গ
চারি রাঙা দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ—

সদানন্দ বললেন, 'হরু ঠাকুরের ছড়া আমরা পড়েছি। হরু ঠাকুরের নাম লোকে ভুলে গেলেও তার ছড়া এখনও লোকের মুখে মুখে ঘোরে—

খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়োল বর্গি এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।'

হরু ঠাকুর বলল, 'যখন ছোটোবেলায় আমার প্রথম কবিতা লিখে দেখালাম, আমার বাবা খুশি হয়ে বলল, "এই তো আমার হরু ঠাকুর" তারপর থেকে আমার ডাকনাম হয়ে গেল হরু ঠাকুর।'

সদানন্দ বললেন, 'তুমি ঠিকই করেছ। চোদ্দশো সালের পুঁথিতে হরু ঠাকুরের নাম থাকলে লোকে সন্দেহ করবে পুঁথির বয়স নিয়ে। কবিরাজই ভালো।'

কালাচাঁদ খাতার দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞের মতো বলল, 'একটা স্পেলিং মিসটেক নজরে এল। ওটা "পাস্তর" না "প্রাস্তর" হবে।'

সদানন্দ ভুরু কুঁচকালেন—'পাস্তর ঠিক আছে। ঠাকুমার ঝুলিতে ছোটোবেলায় পড়িস নি তেপান্তরের মাঠ—ওটা আসলে ত্রি প্রান্তরের মাঠ—তেপান্তর হয়ে গেছে। হাতে সময় বেশি নেই। হরু ঠাকুর তুমি পড়ো।'

হরু ঠাকুর পড়তে লাগল—

BanglaBook.org

পঞ্চানন দেউলত পূজএ নন্দীধন।
নিতি পূজা ভকতীএঁ আগর চন্দন॥
নেহালিআঁ শুণী যবে পূজা পন্ডিআঁর।
ততিখনে পরসনে পরাণী সম্মার॥
দীঘল দীঠি জেন সরোঅর গহন।
পাটোল বাস মুণ্ডিত শির নন্দীধন॥
দেহকান্তি পাটাবুক দেব ধরণীত।
উজল অঙ্গবরন জেন নবনীত॥
এয়ি মাহাজন কণ্যা বড় পুনমতী।
পুনমীর চাঁদ জেন হাসএ ভানুমতী॥
শিশুমতী কণ্যার ঠাঁঠী ওঠ আধর।
উতরলমতি হৌক হিআ মনোহর॥
শবর কণ্যা চন্দ্রা খেলে দোহেঁ বনে।
পঞ্চানন কথা শুন কবিরাজ ভণে॥ —ঠিক হচ্ছে?'

কালাচাঁদ বলল, 'ইন্ডিপিন্ডি ভাষায় কী লিখলে সেটার মানেটা একটু বলবে তো?'

হরু ঠাকুর বলল, 'নন্দীধন নামে এক পূজারি পঞ্চাননের মন্দিরে নিত্য পূজা করে ধুপ-চন্দন দিয়ে। সেই পণ্ডিতের পূজা যে দেখে আর শোনে তার মন তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হয়ে যায়। রেশমের কাপড় পড়ে নন্দীধনের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহকান্তি দেখলে মনে হয় যেন দেবতা ধরণীতে উপস্থিত। এরকম শ্রেষ্ঠ পুরুষের কন্যা তো বড়ো পুণ্যমতি হবেই, তার হাসি যেন পূর্ণিমার চাঁদ, সে চঞ্চল কিন্তু তার মন সুন্দর, জাতের কোনো ভেদাভেদ নেই তার কাছে, তার প্রিয় বন্ধু শবর কন্যা চন্দ্রার সঙ্গে দু'জনে বনে বাদাড়ে খেলে বেড়ায়।'

হরু ঠাকুর বলল, 'কর্তামশাই, নন্দীধনের মন্দিরের ধুপ-চন্দন দিয়ে পূজার কথা শুনে খেয়াল এল যে আপনার উঠানের দেউলে মা কালীর বেদিতে আজ প্রদীপ জ্বালানো হয় নি।'

সদানন্দ বললেন, 'সে আজ কত বছর হয়ে গেল, মা আঁধারেই থাকেন। আলোটালো জ্বলে না।'

হরু ঠাকুর বলল, 'এ তো ভালো কথা নয়। কালা, তুই প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে আয়। তুই এলে তারপর আমি পড়ব—'

কালাচাঁদ রান্নাঘরে গিয়ে তেল নিয়ে উঠোন পার হয়ে মায়ের দেউলের দিকে গেল। মাঝে তুলসীতলার বেদিতে কোনো গাছ-টাছ নেই। কালাচাঁদ অন্ধকার দেউলের

BanglaBook.org

দরজায় লাইটের সুইচটা টিপল। কোনো কাজ হল না, ফিউজ-টিউজ কেটে গেছে বোধহয়। তেল ঢেলে পিলসুজের শুকনো সলতে ভিজিয়ে প্রদীপ জ্বালাতে জায়গাটা আলোকিত হল। মা-র চোখে যেন ক্লান্তির ছাপ। তার বিকলাঙ্গ ছেলের দ্বারা পুজোআচ্চা হয় না। মার্বেল পাথরের উঁচু বেদি, মাথার ওপর মাকড়সার জালে মোড়া ঝাড়বাতি, দেওয়ালে মার্বেল—এক সময় যে এখানে জাঁকজমক করে পুজো হত তার নিদর্শন। নীচে গর্ভগৃহের দিকে তাকিয়ে কালাচাঁদ শিউরে উঠল।

যুপকাষ্ঠ!

এখানেই কালাচাঁদের বাবা মধুচোরের গর্দান আটকে বলি দিতে চেয়েছিল কর্তামশাইয়ের ঠাকুরদা। কালাচাঁদ প্রদীপটা মায়ের পায়ের কাছে রেখে একটা পেন্নাম ঠুকে উঠে দাঁড়াল। মন্দিরের ভিতরটা যেন পায়রার সূতিকাঘর, দেওয়ালের প্রতি ঘুলঘুলিতে পায়রার বাসা—নীচে সারা মেঝেতে পায়রার বৃষ্ঠা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে একাকার। কালাচাঁদ মেঝে থেকে চেঁছে চেঁছে পায়রার আঁঠালো বৃষ্ঠা এক জায়গায় জড়ো করে মন্দিরের মেঝে পরিস্কার করল। তারপর বৈঠকখানায় ঢুকে সদানন্দ ভটচাজের এক হাতওয়ালা ঠাকুর্দার ছবির দিকে তাকিয়ে হরু ঠাকুরের পাশে এসে বলল, 'প্রদীপ জ্বালিয়ে এসেছি। এবার পড়ো।'

হরু ঠাকুর বলল, 'হ্যাঁ পড়ছি। এবার রাজার অত্যাচার—

গণেশ রাজার রাজ হৈলা আবশেষ আজ
পাটে পো যদু জালালুদ্দিন॥
কবি কবিরাজ বুয়িল দুরুজন রাজা হৈল
আয়িলা এবেঁ দুখদিআঁ দিন॥
ব্রাহ্মণেরে গাই মাঁস খায়াইআঁ ধম্ম নাশ
মন্দির দেউল লুলিত ধুলাএ॥
ঘর ঘর লুড়িআঁ পাঁজী পুথী জালিআঁ
দাপে কংসে রাক্ষসিবেলাএ॥
দুষ্টজন বন্ধু তার নিঠুর জমিদার
দুঠঠ কুচরীত জটামদন॥
কাম আনলে দেহ কুসুম কোঁঅলী কেহো
নিতি নিলজী দগধে নিধুবন॥
সগর্গ পঞ্চমুন্ড ভৈল নরককুন্ড
কান্দে নারী কাকুতীবচনে॥
আভাগিনী আপমানে পঞ্চমুন্ড রাজ থানে
পাপ টালিলেক পঞ্চাননে॥

হরু ঠাকুর থামল। সদানন্দ বললেন, 'ত্রিপদী। আগেকার কাব্য কখনও ত্রিপদী আর কখনও পয়ার এ ভাবেই মিশিয়ে মিশিয়ে চলত।'

কালাচাঁদ বলল, 'তারপর কী হল?' হরু ঠাকুর পড়তে লাগল—

পঞ্চমুন্ড পিছত গঅন বনত পাশ।
শবর সমাজ গোঠ বসতী বাশ॥
জটামদন শিকারত আহিলাহা বনে।
শবরী তিরীক তেহেঁ দেখিলা তথাখণে॥
তনুকান্তি লীলা জেন ফুটিত বনমাহ্নী।
দুলালী দিলা দেহে কাম আনল জালী॥
কুসুম কোঁয়লী আনহ প্রাসাদে।
বল কৈলে ফুকরে শবরী কান্দে॥
জটামদন উমতমতী শঠ জমিদার।
কোথা হৈতে পথ রহাইল এক দুরুবার॥
কিরিপান হাথে জেন সিংহ চলন।
পাটাবুক করিবেহেঁ অসুরদলন॥
ভঞ্রেঁ জটামদন ছাড়িল শিকার।
কারাগার থান তোহ্মা জানহ বাটোয়ার॥
আড় দীঠি জমিদার কোপিল মনে।
পাইক জালিআঁ আগ ছাড়ায়িলেঁ বনে॥
শবরের ঘর গেহ পোড়াআঁ ছারখার।
জমিদার জুড়ায়িলেঁ কোপ আনল তার॥
তরাসিত মনে বনে শবর সমাজ।
দূরে চলি গেলা ছাড়ি পঞ্চমুন্ড রাজ॥

হরু ঠাকুর পাতা উলটে বলল, 'এবার শোন ভানুমতীর কাহিনি—

নিশি শশাঙ্ক ডুবিল রআনী পোহাইল।
তরাসিলী ভানুমতী বাটত পাইজ॥
চলী ভৈল বিহাণে চাহিতেঁ তার সখি।
চন্দ্রা গেলা কোন দিশে খুজএ দুঈ আঁখি॥
পন্তিআঁ রাজধামে গেলেঁ রাজ কাজেঁ।
বেগবতী পার হৈআঁ ফিরিবেক সাঁঝে॥
বনের কিনারে চাহিলেক চারি পাশ।
সঙ্গিনী চন্দ্রা হের নাহি আশপাশ॥

BanglaBook.org

চৌদিশে চাহীল তার আসুখিলী চীত।
কেমতেঁ এড়ি গেলা মরমের হীত॥
আচম্বিত পাথরত হৈল আলোড়ন।
পাহাড় হৈতে পাম্বিলা এক নর জন॥
চন্দ্রা বুয়িলে উচে গুহাএ বাসে নর।
পাটাবুক তার কপালে রোমথা আখর॥
দেখিয়াঁ তরাসে নারী কাম্পে থরথর।
এহি দিশে আয়িলাহা পাটাবুক নর॥
পাম্বিছে দ্রুত পাএ পাথর বাটে।
বাঘ যেহ্ন ছুটি আহে শিলাপাটে॥
তিরছ দিঠাএ নর পাহাড়ত বাট।
তরাসিত ভানুমতী ছুটিলেক ঝাঁট॥
চমকি দেখিল যথা চাহিলেক পাছেঁ।
অনুসারী আয়িল তাঁ বেগেঁ পাছে পাছে॥
বলি সম দেহ রোমথা দীঠি টেন্টন।
তিরিবধ খেড়া ইহার উচাটন মন॥
দিশ বিদিশ নাহি দেখিঁ তরাসে মাঞাঁ।
ছুটিল বনের পানে কণ্যা ধাআঁ ধাআঁ॥
পঞ্চানন দেবেঁ কণ্যা করিল স্মরণ।
কবি কবিরাজ পূজে পঞ্চানন চরণ॥'

সদানন্দ বললেন, 'কোথা থেকে রোমথার কথা শিখলে হরু ঠাকুর?'

হরু ঠাকুর রহস্যমাখা মুখে বলল, 'ঘটনা ঘটলে তা হারিয়ে যায় না।'

কালাচাঁদ বলল, 'রোমথা কী?'

সদানন্দ বললেন, 'সে সময়ে হিন্দু রাজ্যে অপরাধীকে চারভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। সম্ভ্রান্ত লোককে শ্মশানে দেবতার সামনে বলি দেওয়া হত। আসামি মহাব্যাধি যুক্ত হলে তাকে মাটিতে জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হত, আর বাকিদের হয় শূলে চড়ানো হত নতুবা হাত-পা বেঁধে আগুনে ফেলে দেওয়া হত। এই শেষের দুই দলের মধ্যে কোনো স্বাস্থ্যবান লোক থাকলে কবিরাজরা তাকে রাজার নিকট গিয়ে রোমথা করতেন। তাদের কপালে উল্কি দিয়ে রোমথা শব্দটা চিরস্থায়ী করে লিখে দেওয়া হত। তাদের প্রাণ তখন কবিরাজের ইচ্ছাধীন ছিল। কবিরাজরা তাদের শরীরের ওপর দিয়ে যত সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। তাতে রোমথার কোনো রোগ হোক, মরে যাক তার জন্যে কবিরাজদের কোনো অপরাধ হত না। কখনও কখনও

কবিরাজরা রোমথাকে উত্তপ্ত তেল বা উত্তপ্ত ঘৃতে জীবন্ত ফেলে মহামাঁষ তৈল বা মহামাঁষ ঘৃত তৈরি করত।'

মহামাঁষ তেলের নাম শুনে কালাচাঁদ শিউরে উঠল।

হরু ঠাকুর বলল, 'ভানুমতী দেখল রোমথা পিছনে পিছনে ছুটে আসছে—'

ধায়িআঁ মেদনী নিচে কণ্টকিত পাএ।
পিছে ধাএ জেন কংস ধরিবাক তাএ॥
চৌদিশে কেহো নাহি এ শুন পান্তরে।
ভানুমতী একলী কান্দতি আন্তরে॥
মাথাত খোঁপা খসি লোটন লোটাইল।
খসিল ঘাঘর গাএ আঞ্চল খসিল॥
পসিআঁ গহন বনে কণ্যা ভাবে একা।
আরণে আন্ধারে নাহি বাট যাএ দেখা॥
পিআসত কণ্ঠ জেন কাঠ শুখাঞাছে।
উমত যম সম কংশাসুর পাছে॥
আগে কাঁটীবন পিছে চাঁদ খাবে রাহু।
চিরিল কুসুম কোঁঅলী কণ্যার বাহু॥
কাঁটীবন বিদরে আগে কাদা মাখা ঘাস।
সামনে উমত হাথী মনে ভাগে তরাস॥
রাগে আন্ধল হাথী কাঢ়ে দীঘল রাএ।
এই খনে চিপিয়া মারিবে তন্ত পাএ॥
কাম্পএ কণ্যা পঞ্চাননে করিল সরণ।
কবিরাজ ভণে পূজে পঞ্চানন চরণ॥

হরু ঠাকুর পাতা ওল্টাল—

আঠকপালী আড় দীঠি ত্রাসে দেখিল।
দীর্ঘ রাএ রোমথা আগত আইলো॥
উমত আকার হাথী কাঢ়ে দীর্ঘ রাএ।
এক খণে দাহিনেঁ সুন্ড আর খণে বাঞ॥
খণে খণে সুন্ড তোলে আকাশের পানে।
উপাড়িল ছাতীঅন মারিবারে হানে॥
সুন্ড এড়ি আগুছিআঁ পাটাবুক নরে।
হাথীর পাছেত ঝাঁট গেলা তরু ধরে॥
লাম্ফ দিয়া উঠিআঁ ছাতিঅন ডালে।

BanglaBook.org

ণাম্বিল হাথীর পিঠে বীরদাস চালে॥
হাথীপিঠে লহমায় বসি নর বীর।
ততিখণে আঙ্কুশেঁ কিলেঁ হাথী শির॥
কিলাআঁ উলটি উলটি হাথীশিরত।
আচরিজ হাথী উপবেশে ধরণীত॥
হাথীর উঝঁট নেহালিআঁ শূর বীরে।
গোঞ্জা খুলি ওষধি লাগাএঁ শরীরে॥
জড়িবুটি গুনে হাথীর জুড়াএ অঙ্গ।
খোনেকেঁ জুড়াএ ঘাঅ শান্ত হৈল খঙ্গ॥
পাছে হাথী ধিরে ধিরে চলি গেলা বনে।
পঞ্চানন কৃপা শুন কবিরাজ ভণে॥

হরু ঠাকুর পড়া থামিয়ে বলল, 'গলা শুকিয়ে গেছে।'

কালাচাঁদ তাড়াতাড়ি উঠে হরু ঠাকুরের জন্য এক গ্লাস জল নিয়ে এল। সদানন্দ বললেন, 'এই হাতির আইডিয়াটা কোথা থেকে আসলো?'

হরু ঠাকুর ঢক ঢক করে জল খাচ্ছিল, মুখ থেকে গ্লাস সরিয়ে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'কেন ভুল লেখা হয়ে গেছে?'

কালাচাঁদ একটু সন্দেহ প্রকাশ করে বলল, 'হাতির চিকিৎসা? অত বছর আগে?'

সদানন্দ বললেন, 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে "হস্তীপ্রচার" অধ্যায়ে হস্তীচিকিৎসকের কথা আছে। একদম ঠিক লিখেছ। বাঙালিরাই তো এদেশে হাতিকে বশ করায় তুখোড় ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষরা দুটি বিষয়ে সকলকে টেক্কা দিয়েছিল—নৌকা তৈরি করা আর হাতিকে পোষ মানানো। আর্যরা যখন ভারতে এসেছিল তখন ওরা হাতি চিনত না। হাতি তো আর ভারতের পশ্চিমে পাওয়া যেত না, আর্যরা যখন প্রথম হস্তী দেখল তখন তাকে হাতওয়ালা মৃগ বলল। এ তল্লাটে হাতির আসল বাসস্থান আসলে বাংলা, বোর্ণিও, সুমাত্রা ইত্যাদি। হাতি ধরা, হাতিকে পোষ মানানো, যুদ্ধের জন্য তৈরি করা ইত্যাদিতে এই প্রকাণ্ড প্রাণীকে বশ মানাবার শিক্ষা দেয় এই বঙ্গদেশই। বাংলাদেশে পালকাপ্য নামক একজন মহান হস্তী বিশারদের জন্ম হয় যিনি হস্তী চিকিৎসায় নিপুণ ছিলেন—যাগগে হরু ঠাকুর তুমি বল তারপর কী হল।'

হরু ঠাকুর বলল, 'এবার ভানুমতী রোমথার মুখোমুখি হল। পড়ছি শুনুন।'

হরু ঠাকুর পড়তে লাগল—

কুসুম কোঁঅলী তার ছিন্ডিআঁছে অলঙ্কার।
ছিন্ডিআঁছে যত মানভএ॥
গোরা তার দেহকান্ত আনুপাম বীর শান্ত।

দীঠি কৈল তারি মন জয়॥
ছিয়া নিচোল ছিয়া কেশ দেয়ি আপনা বেশ।
ঢাকিলেঁ তিরির লাজ॥
পুরুষের বসনে জেন বনদেবী বনে।
অপরুব তার দেহসাজ॥
ফিরিল রোমথা সঙ্গে গ্রামত আহত অঙ্গে।
কৃপা তব বাবা পঞ্চানন॥
পঞ্চানন কথা শুনি যোড় হাথ করহ গুণী।
ভকতী ভরে করি বাখান॥

সদানন্দ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, 'তুমি এগুলো লিখলে কী ভাবে?'

হরু ঠাকুর বলল, 'কাল রাতে ওপাড়ায় গিয়ে দেখে এসেছিলাম, তার থেকেই একটু কেটে ছেটে-মানে অত ডিটেল তো আর লেখা যায় না—'

'ফালতু কথা বোলো না তো,' কালাচাঁদ বলল। 'কী ভাবে তুমি ওই মাঠে গিয়ে পড়লে?'

হরু ঠাকুর বলল, 'কি জানি?'

বদন গম্ভীরভাবে মন্তব্য করল, 'সমনামবুলিজম।'

হরু ঠাকুর বলল, অন্ধকার মাঠের ভিতর চোখে অন্ধকার দেখলাম আর 'বাপেরনামভুলিযম' হয়ে গেল রে বদন, সব যেন ভুলে গেলাম।'

সদানন্দ বললেন, 'আরও লিখেছ, না এই পর্যন্ত?'

হরু ঠাকুর বলল, 'আর একটু আছে—যা দেখলাম তার থেকে একটু পালটে লিখলাম, সেটা পড়লে চলবে?'

সদানন্দ বদনের সঙ্গে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে বললেন, 'ঠিক আছে, কী লিখেছ সেটাই শোনাও, কী দেখলে সেটা না হয় আরেকদিন শোনা যাবে।'

হরু ঠাকুর বলল, 'সেদিন বিকালে পাহাড়ের গুহায় রোমথা বসে বসে পাথর কুঁদে কৃষ্ণমূর্তি বানাচ্ছে, এমন সময় গুহার মুখে নন্দীধন উপস্থিত হলেন।'

বদন বলল, 'গদ্যে না, পদ্যে শোনাও।'

হরু ঠাকুর বলল, 'শোন এবার রোমথার কাহিনী—'

একচীতে পাথর কাটে আঁকএ শিলাপাটে।
কাহ্ন কদম তরুতলে॥
মোহনবাঁশী হাথে ময়ুর পুছ মাথে।
পাথরে কাহ্নই জাগিল বনফুলে॥
জন মানুষ নাহি গাঁএর বাট বাহি।

BanglaBook.org

নন্দীধন আইলেঁ সেথাত ধিরে।
অনমিষ নয়ন দেখে অমূল চয়ন।
মুরতী মুগধ করিল তারে॥

'তোমার রোমথা পাথর কেটে মুরতি বানায়?' কালাচাঁদ বলল।

সদানন্দ বললেন, 'কেন বানাবে না? ভাস্কর শিল্প বাংলার গৌরব। এককালে বাঙালির ঘরে ঘরে শিল্পী ছিল যারা পাথর কুঁদে দেবতার ক্রোধ মূর্তি, করুণা মূর্তি, শান্তমূর্তি—এরকম কত যে মূর্তি গড়ত তার ঠিকানা নেই। পাথরকে এঁরা যেন মোমের মতো ব্যবহার করত। একেকটা কৃষ্ণমূর্তি এমন যে নাস্তিকের ভক্তিরসের ফল্গুকে টেনে বাইরে প্রস্রবণের মতো বের করে আনে। মহীশূর, কেরালা এদেরও ভাস্কর্য নিপুণ ছিল কিন্তু তাদের যেন সাজসজ্জাই বেশি। আজও কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের দিকে তাকিয়ে আমার চোখে জল চলে আসে—যেন জীবন্ত।'

হরু ঠাকুর চুপ করে রইল।

'তোমাকে বাধা দিলাম, তুমি পড়ো—' সদানন্দ বললেন।

হরু ঠাকুর পড়ে চলল—

আকপট বচন তার নাহি মোটে আখরে আড়।
বুয়িল জেন মেঘ বজর নাদে॥
সরূপ কহ খুলে জনম কোণ কুলে।
রোমথা হৈলে কোণ আপরাধে॥
বুইলে মোকে ভানুমতী তুহ্মি মহাজন অতি।
হাতে সরস্বতী বসসি তোমার॥
হাথীরে যে বশ করে তার জনম বঙ্গ ঘরে।
কে তুহ্মি বঙ্গজ কুমার॥
উঠিআঁ করিল প্রণাম কেশব মোহোর নাম।
পিতার কণ্ঠএ বাস সরস্বতী—'

'কেশবটা ঠিক জমল না,' সদানন্দ চোখ মুঁদে থাকা অবস্থায় বললেন। 'গোরা অঙ্গ বলছ, কেশব মানে তো কৃষ্ণবরণ। তাছাড়া কেশব শুনলে মনে হয় কৃষ্ণলীলা থেকে টোকা। নামটা পালটে বলরাম করে দাও।'

হরু ঠাকুর কিছু বলতে যাচ্ছিল, কালাচাঁদ মাঝখানে বলল, 'বলরাম গোরা ছিল?'

সদানন্দ বললেন, 'একম্ শুক্লমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্—'

কালাচাঁদ করুণ মুখে বলল, 'কর্তামশাই, বাংলায়—'

সদানন্দ থমকে গেলেন, তারপর বললেন, 'নারায়ণ স্বীয় মস্তক হতে এক শ্বেত কেশ এবং এক কৃষ্ণকেশ উৎপাটন করে রোহিনী ও দেবকীর গর্ভে উপস্থাপন

BanglaBook.org

করলেন। শ্বেতকেশ থেকে জন্ম নিলেন বলরাম এবং কৃষ্ণকেশ জাত হলেন শ্রীকৃষ্ণ। কেশ জাত বলে তাঁর আরেক নাম কেশব। হরু ঠাকুর, নামটা বলরাম করে দাও।'

হরু ঠাকুর গোলগোল চোখে শুনছিল, এবার বলল, 'কর্তামশাই ঠিক বলেছেন, ওর নাম আসলে বলরামই ছিল। চয়নবিলের পাথরেও ওর নাম লেখা আছে।'

সদানন্দকে অবাক করে হরু ঠাকুর এবার খাতায় কিছুক্ষণ কাটাকাটি করে আবার পড়তে লাগল—

উঠিআঁ করিল প্রণাম মোর নাম বলরাম।
পিতা জিম্মণি বিচক্ষণ॥
ধরমে আচরি বুদ্ধ হারিলা শাস্ত্র যুদ্ধ।
মোকে করিয়া মৃত্যুপণ॥
আদেশিলা গৌড়েশ্বর দন্ড দিলা মরণের।
শ্মশানত আনে দড়ী বান্ধিয়া॥
মোর নাহি কোণ দোষ হে প্রভু কেন রোষ।
দেবতারে স্মরি কান্দিয়া॥
দয়া হৈল বেজরাজে বুয়িলেঁ লাগিবে কাজে।
রোমথা আমার এই নর॥
কোন জনমের পাপে রাজার আগুন ছাপে।
কপালে হের কলিআঁ খড়॥
দেখিয়া মোর ভকতী বেজরাজেঁ দিলা মুকুতি।
মরণের কালে সেই প্রাজ্ঞ।
বেজরাজ হৈলেঁ গত ললাট জুড়ি ক্ষত।
তেঁএ না কাটে দুর্ভাগ্য॥
বইলেঁ বলরাম কিবা তোহ্মার নাম।
কিবা বল তোহ্মার পরিচএ॥
পঞ্চানন নাম সরন ভজিআঁ প্রভুর চরণ।
কবিরাজ লিখিল কাব্যচয়॥

'গল্পে পঞ্চানন ঠাকুর কোথায়?' কালাচাঁদ অস্থির হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'ধৈর্য ধর কালা, ঠাকুর ঠিক সময়মতো আসবেন,' সদানন্দ বললেন। 'মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুসারে ভক্ত বিপদে পড়ে ঠাকুরকে ডাকে, তখন ঠাকুর এসে তাকে উদ্ধার করেন। আগে ওদের বিপদে পড়তে দে, তবে না ঠাকুর আসবেন।'

হরু ঠাকুর বলল, 'কর্তামশাই ঠিক বলেছেন। বাকিটা শেষ করি—

BanglaBook.org

বুইলে পন্ডিআঁ ধিরে রাখি পঞ্চানন শিরে।
আহ্মি তাঁর আতি দীন দাস॥
নন্দীধন নাম মোর দেব পুজি রাতী ভোর।
পঞ্চমুন্ডে মোর বসবাস॥
হাসিআঁ বলরাম কহে বত্তিশ রাজলক্ষণ দেহে।
কহ তোহ্মা আসল পরিচএ॥
থাকিআঁ প্রভুর নিচে পাকিল দাঢ়ীর পিছে।
নিরঞ্জন ভক্ত তুহ্মি কোন মহাশয়॥
শুনিআঁ পূজারি হাসে থাকহ মোর আশেপাশে।
বাবার দেউলে লিখহ তার নাম॥
গিরি এঁড়ি আইস গ্রামে বাবা পঞ্চাননের নামে॥
আশীর্বাদে হৈবে পূরণ মনস্কাম॥
প্রতিদিন একে একে দেউল গাত্রে লিখে।
পঞ্চানন মঙ্গল স্তব॥
প্রভুর আদেশ শুনে কবি কালাচাঁদ ভণে।
পঞ্চানন স্তোত্র বৈভব॥'

কালাচাঁদ বললে, 'এবার কঠিন কঠিন সব শাস্ত্রর ঝাড়ছো হরু ঠাকুর। এই বত্তিরিশ রাজলক্ষণ-টক্ষণ তো বুঝতেই পারলাম না। মানেটা বুঝিয়ে দাও।'

সদানন্দ বললেন—

'পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ
ত্রিহ্রস্বপৃথুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশোলক্ষণো মহান্।'

কালাচাঁদ বলল, 'দেখলে হরু ঠাকুর, কর্তামশাই কেমন জলের মতো সোজা ভাবে বুঝিয়ে দিলেন।'

সদানন্দ হাসলেন, 'তার মানে হল যাঁর দেহে বত্রিশ রাজলক্ষণ বর্তমান, তিনি মহাপুরুষ পদবাচ্য—পঞ্চদীর্ঘঃ মানে বড়ো নাক, বড়ো বাহু, বড়ো বড়ো চোখ, জানু আর ভুজ। পঞ্চসূক্ষ্মঃ মানে—ত্বক, কেশ, রোম, দন্ত—এ্যাই কালা, নাকে হাত বোলাচ্ছিস কেন? নাক বড়ো কিনা দেখছিস বুঝি?'

কালাচাঁদ ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জা পেল—'নাকটা চুলকাচ্ছিল।'

সদানন্দ বললেন, 'কিন্তু হরু ঠাকুর, এই নন্দীধন পুরুতকে মহাপুরুষ বানাচ্ছ কেন সেটা বুঝলাম না।'

হরু ঠাকুর বলল, 'মহাপুরুষ কি আর বানানো যায়? মহাপুরুষেরা নিজে থেকেই মহাপুরুষ হয়।'

BanglaBook.org

সদানন্দ বললেন, 'এটা বেশ বলেছ। কিছু কারেকশন নজরে এসেছে। ওটা কাল ঠিক করে দেব। তারপর কি হল?'

হরু ঠাকুর বলল, 'এই কালাটা দরজা ধাক্কিয়ে সব গোলমাল করে দিল। বলরামের কী হল সেটা যেন মন থেকে মুছে গেছে, কিছুতেই মনে আসছে না। দাঁড়া ভাবি।' হরু ঠাকুর চোখ বুঁজে ভাবতে লাগল, আর কখন একসময় কালের গণ্ডি পেরিয়ে গেল।

।। ছাব্বিশ ।।

পরদিন উষাকালে ঘন্টাধ্বনিতে বলরামের নিদ্রাভঙ্গ হল। চোখ খুলে বলরামের মনে হল সে বহুদিন এত নিশ্চিন্তে ঘুমায় নি। বলরাম দ্রুত বিছানা ছেড়ে দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সূর্য দিগন্তে এসে পৌঁছায় নি কিন্তু তার আগমনী বার্তা পূবাকাশে রক্তিমাভায় ছড়িয়ে গেছে, অথচ পশ্চিমে বেগবতীর অপর পাড়ের আকাশে কালো মেঘ জমছে। মন্দিরের চাতালে একটা রজ্জু বাঁধা দোদুল্যমান ঝুলন্ত ঘন্টা, লম্বা রজ্জুর অপরপ্রান্ত যার হাতে তাকে বলরাম চিনতে পারল—শুভ্র ও স্নিগ্ধ ক্ষৌমবস্ত্র পরিহীতা ভানুমতী। বলরামকে দেখে ভানুমতী ঘাড় স্বল্প ঝুঁকিয়ে স্মিত হেসে অভিবাদন করল কিন্তু ঘন্টার রজ্জুতে আকর্ষণ করেই চলল। বলরাম হাতজোড় করে প্রতিসম্ভাষণ জানাল। মন্দিরের ভিতর হতে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ ভেসে আসছে, রোমথার মন্দিরে প্রবেশের অধিকার আছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে মন্দিরে প্রবেশ না করাই উচিত এই সিদ্ধান্ত নিল। বলরাম মন্দির প্রদক্ষিণ করে মন্দিরের পিছনে এসে মন্দিরের দিকে ভালো ভাবে চেয়ে দেখল। পাথরের গাত্রে লিপি লিখতে গিয়ে এর আগে বলরাম অনেক রকম আকারের মন্দির দেখেছে কিন্তু এরকম আকৃতির মন্দির সে আগে কখনও দেখেনি। পোড়ামাটির ইস্টকের ওপর ইস্টক স্থাপন করে এই মন্দিরের দেওয়াল তৈরি হয়েছে, দেওয়ালের উপরি ভাগে কিছুটা উন্মুক্ত স্থানে দারুস্তম্ভ, তার ওপর মন্দিরের খড়ের চাল। বলরাম একটু খুঁটিয়ে দেখল এ মন্দিরে ইস্টকের স্তরগুলির ভিতর জোড়া লাগানোর জন্য কোনো চুনামাটি ব্যবহার করা হয়নি।

কিয়ৎক্ষণ পর মন্দিরে মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হল, ঘন্টাধ্বনীও নীরব হল। বলরাম মন্দিরের অগ্রভাগে উপস্থিত হয়ে দেখল নন্দীধন মন্দিরের অভ্যন্তর হতে বাহিরে আসছে, পরনে নেতপাটোল, উর্ধাঙ্গে নেত উত্তরীয়, ললাটে তিলক। বলরাম

হাতজোড় করে মাথা নুইয়ে প্রণাম জানাল, নন্দীধন হাত উত্তোলন করে আশীর্বাদের মুদ্রা করে স্মিতহাস্যে তার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। বলরাম বলল—এই মন্দিরের আকার বিচিত্র। এরকম গুম্বাকৃতি সে আগে দেখে নি।

নন্দীধন বললেন—বৈদিক মুনিদের গার্হপত্যাগ্নি বেদির আকৃতিতে এই মন্দির তৈরি। এখানে দেওয়ালে ইষ্টকের বিশাল পাঁচটি স্তর আছে, প্রতিটি স্তরে একুশটি ইস্টক আছে, সব ইস্টক সম আকৃতির নয়। এই ইস্টকগুলি এখানে বিশেষ ভাবে নির্মিত হয়েছে। মন্দিরের গঠনে স্থায়িত্ব আনবার জন্য কোনো দু'টো পাশাপাশি ইস্টকের ফাঁক অন্য স্তরের বা অন্য দুটো পাশাপাশি ইস্টকের ফাঁকের সঙ্গে মিলবে না। এতে মন্দিরের গঠন এত স্থায়ী হয় যে দুটো ইস্টককে ধরে রাখার জন্য ইস্টকের মাঝে চুনামাটি জাতীয় মশলা ভরাট করার দরকার পরে না।

বলরাম বলল—কে এর স্থপতি?

নন্দীধন স্মিত হেসে বললেন—২৫০ অব্দে আলেকজান্দ্রিয়ায় বিখ্যাত গণিতবিদ ডায়োফনটাস এর সমীকরণ লিখেছিলেন। অবশ্য, তার অনেক আগে প্রায় ৮০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে বৌধায়ন নামে আমাদের দেশের এক বিখ্যাত শুল্বশাস্ত্রকার এরকম সমীকরণদ্বয় সিদ্ধ করে এরকম চার অজানা রাশির মান নিরূপণ করেন।'

নন্দীধন হাটু মুড়ে মাটির ওপর বসে এক মুষ্টি অঙ্গারচূর্ণ নিয়ে এক মসৃণ প্রস্তরের ওপর এক বিচিত্র জ্যামিতিক নকশা অঙ্কন করে বললেন, 'এই মান অনুযায়ী বৈদিক যুগে যজ্ঞের জন্য গার্হপত্যাগ্নি নামে এক প্রকার বেদি তৈরি করা হত। এই বেদির আকৃতি এই সমীকরণদ্বয় মেনে করা হয়। প্রতি স্তরে একুশটি বিভিন্ন আকৃতির ইস্টক থাকতে হবে। প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম স্তরে নয়টি ইস্টক এক ষষ্ঠ একক আকারের, এবং বারোটি ইস্টক এক চতুর্থ একক আকারের ; দ্বিতীয় এবং চতুর্থ স্তরে ষোলোটি ইস্টক এক ষষ্ঠ একক আকারের এবং পাঁচটি ইস্টক এক তৃতীয় একক আকারের। আমি তো মাত্র তার অনুসরণ করে এই মন্দিরের বহির্গঠণ করিয়েছি।'

'এই মন্দিরে ইস্টকের দুই স্তরের মধ্যে কোনো চুনামাটি নেই।'

'না নেই, প্রাচীন মিশরীয়দের পিরামিডের গাত্রও কোনো চুনামাটি বা সংযোজক পদার্থের বন্ধন ছাড়াই নির্মিত হত—' নন্দীধন স্মিত হেসে বললেন। 'ইস্টকের ভার পাথরের তুলনায় অনেক লঘু হওয়ায় এই মন্দিরের দেওয়াল দরকার পড়লে দ্রুত নিরাবরণ করা যায়।'

বলরাম বুঝল এই নন্দীধন শুধুমাত্র চিকিৎসক ও পুরোহিত নন ইনি একজন গণিতজ্ঞও বটে। নন্দীধন একটা কাপড়ের টুকরো দিয়ে অঙ্কন মুছে ফেললেন। ভক্তিতে বলরামের মাথা নতজানু হয়ে গেল।

নন্দীধন বললেন, 'ডায়োফনটাসের সমীকরণের সমাধান বের করতে আজকাল

অবশ্য কোনো অসুবিধা হয় না। আমাদের দেশের মহান গণিতজ্ঞ ব্রহ্মগুপ্ত ও আর্যভটের কুত্তক পদ্ধতিতে এর সমাধান সহজেই হয়ে যায়। আমি এই মন্দিরের আকার নিরূপণে কুত্তক ব্যবহার করেছি।'

ব্রহ্মগুপ্ত ও আর্যভটের নাম উচ্চারণ করার সময় নন্দীধন দু'কানের লতিতে দু'আঙুল স্পর্শ করলেন। নন্দীধন আবার স্মিত হাস্য প্রদান করে বললেন—এবার তোমার হাতের ছোঁয়ায় মন্দিরগাত্র ছন্দে অঙ্কে সজ্জিত হবে। বলরাম অর্থ পুরোপুরি না বুঝেও প্রশ্ন করা থেকে নিজেকে বিরত রাখল। তার ভুললে চলবে না—সে রোমথা।

চয়নবিলের তীরে একটা শালতি এসে থামল, একজন রোগা-পাতলা মানুষ শালতি থেকে নেমে দ্রুত মন্দিরের দিকে আসতে লাগল। নন্দীধন মানুষটাকে দেখে এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হলেন, তারপর তিনিও লম্বা লম্বা পা ফেলে চয়নবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। বলরাম লক্ষ করল বেগবতীর ওপার থেকে যে ঘন কালো পুঞ্জীভূত বাদল মেঘের সারি হাওয়ায় দ্রুতবেগে এদিকে উড়ে আসছে তার কালিমা যেন নন্দীধনের মুখে লেপে গেছে।

মানুষটা নন্দীধনকে হাত-পা নাড়িয়ে কিছু বলল, বলরাম শুনতে না পেলেও বুঝতে পারল গুরুতর কিছু ঘটেছে। মানুষটা আবার শালতিতে ফিরে গেল, নন্দীধন হনহন করে ফিরে এসে বললেন—খবর ভালো না। জটামদন কাল সন্ধ্যায় দ্রুতগামী অশ্বে রাজদূত পাঠিয়েছে রোমথার প্রাণদণ্ডের আদেশ বহাল রাখার জন্য। দূত ফিরে এলেই সে পাইক-পেয়াদা নিয়ে এসে বলরামকে শূলে চড়াবে। কাল রাত দ্বিপ্রহর অবধি জটামদন নাকি পিঞ্জরাবদ্ধ বন্যব্যাঘ্রের মতো ক্রুদ্ধ গর্জন করেছে এবং সে কিছুতেই তার অপমান ভুলতে পারছে না।

নন্দীধন ক্ষিপ্রহস্তে তালপত্রে বিহারের অধ্যক্ষ জ্ঞানদত্তের উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখে ভানুমতীর হাতে দিয়ে বললেন আলপথে মাঠের ওপর দিয়ে এক্ষুনি বলরামকে সঙ্ঘারাম-বিহারে নিয়ে যেতে।

ভানুমতী শাড়ির আঁচল গাছকোমরে বেঁধে বলরামের দিকে তাকাল ; বলরাম প্রস্তুত। কিন্তু দূর হতে তূর্যনিনাদ ভেসে এল।

'জমিদারের অশ্বারোহী পাইক আসছে—' নন্দীধনের মুখ ফ্যাকাশে। 'ওরা দু' দণ্ডের মধ্যে এসে পড়বে। এখন আলের ওপর দিয়ে যেতে গেলে ধরা পড়ে যাবে। তাড়াতাড়ি আখের ক্ষেতের মধ্যে আত্মগোপন করে সঙ্ঘারাম-বিহারের দিকে অগ্রসর হও।'

বলরামকে নিয়ে ভানুমতী ছুটে মাঠে নেমে আলের ওপাশে আখ ক্ষেতের আড়ালে চলে গেল। নন্দীধন অপেক্ষা করতে লাগলেন জমিদারের পাইকের।

BanglaBook.org

নন্দীধনের আশঙ্কা অমূলক নয়। সুলতানের আদেশনামা নিয়ে এল অশ্বারোহী সৈন্য, সঙ্গে জটামদন।

'রোমথা কোথায়?' জটামদনের চোখ লাল, মুখে কটু সুরার গন্ধ। 'কোথায় ওকে লুকিয়ে রেখেছ?'

'নন্দীধন অবিচল দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'অপ্রণীতো হি মাৎস্যন্যায়মুদ্ভাবয়তি বলীয়ানবলং হি গ্রসতে দণ্ডধরাভাবে—'

'আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিও না—' জটামদন সাপের মতো হিসহিস করে বলল। 'সংস্কৃত আমি অধ্যয়ন করি নি। তোমার পুজোর মন্ত্র শোনার সময় আমার নেই।'

নন্দীধন অবিচল ভাবে বললেন, 'এটা পুজার মন্ত্র নয়। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য মাৎস্যন্যায় বর্ণনা করছেন—যখন রাজশক্তির দণ্ড অপ্রণীত থাকে, তখন মাৎস্যন্যায়ের প্রভাব হয়। উপযুক্ত দণ্ডধরের অভাবে প্রবল দুর্বলকে গ্রাস করে থাকে। আমি মাৎস্যন্যায়ের যন্ত্রণা হৃদয়ে অনুভব করছি।'

জটামদনের নিষ্কোষিত অসির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ নন্দীধনের কণ্ঠে স্থাপিত হল—'চুপ, আর একটা শব্দ উচ্চারণ করলে—' জটামদন বাক্য অসমাপ্ত রেখে দ্রুত মন্দিরের চাতালে উঠে মন্দিরের ভিতরে ক্ষিপ্র দৃষ্টিপাত করে আবার ত্বরিতপদে নীচে নেমে এসে একজন পাইককে হুকুম দিল নন্দীধনের কুটীরের অভ্যন্তরে খুঁজে দেখতে। সেখানেও যথারীতি নিরাশ হয়ে, বাইরে চতুর্দিকে চেয়ে বলল—'আখ ক্ষেত। রোমথা আখ ক্ষেতে লুকিয়েছে। ওকে ওখানেই শেষ কর, যেন আর আখ ক্ষেত থেকে বাইরে না আসতে পারে।'

ভানুমতী আর বলরাম মাথা নীচু করে দ্রুতগতিতে এগোচ্ছিল। আখক্ষেতের ভিতরটা ভানুমতীর অচেনা নয়, সে আর চন্দ্রা অনেকবার এই ক্ষেতের ভিতর সময় কাটায়, কিন্তু আজ ভয়ে যেন তার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। মাথা উঁচু করে দেখতে যাচ্ছিল সে, বলরাম ওকে হ্যাঁচকা টানে মাটিতে বসিয়ে দিল।

'উঃ—' ভানুমতী ব্যাথায় কাতরে উঠল।

'চুপ!' বলরাম বলল—'ওরা ক্ষেতে ঘোড়সওয়ার নামিয়ে দিয়েছে।'

মাথা ঘুরিয়ে গাছের ফাঁকে ভানুমতী যা দেখল তাতে সে শিউরে উঠল—আট-দশটা ঘোড়সওয়ার আখের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে তাদের দিকে ছুটে আসছে আর ছুটন্ত ঘোড়সওয়ারদের হাতের তরবারি এলোপাথাড়ি আখ গাছ কেটে ধরাশায়ী করে চলেছে।

'আমাদের ওরা কেটে ফেলবে,' বলরাম কম্পিত গলায় বলল।

'এদিকে, আমার পিছনে এসো,' ভানুমতী মাথা নীচু করে দিক পরিবর্তন করল।

বলরাম ভানুমতীকে অনুসরণ করে ক্ষেতের মাঝে এক পাতায় ঢাকা জমির

BanglaBook.org

সামনে এসে উপস্থিত হল। 'বুনো শুয়োর ধরার ফাঁদ,' ভানুমতী হাঁপিয়ে বলল। 'লাফাও।'

বলরাম পাতা-ঢাকা জমিতে লাফ দিতেই তার শরীর মাটির নিচে গর্তে প্রবেশ করল। পর মুহূর্তে ভানুমতীর শরীর বলরামের গা ঘেঁসে তার সামনে উপস্থিত হল। ঘোড়সওয়ারদের চিৎকার ও অশ্বখুরের শব্দ কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। গর্তের ভিতর পরিসর স্বল্প। দুটো শরীর একে অপরের মুখোমুখি গা ঘেঁসে। ভানুমতীর বক্ষ বলরামের বক্ষের সংলগ্ন। ভানুমতীর পুনঃ কম্পমান হৃদপিন্ড যেন জায়গার অভাবে ঠিকমত স্পন্দিত হতে পারছে না। ঘোড়ার খুরের শব্দ একদম মাথার কাছে এসে পৌঁছাল। ভানুমতী ভয়ে চোখ বন্ধ করে মনে মনে কাতরভাবে বাবা পঞ্চাননকে ডাকতে লাগল। ঘোড়সওয়ারদের অসিদ্বয় মাথার উপরে জমিকে প্রায় স্পর্শ করে বেরিয়ে গেল ; কয়েকটা আখের গাছ মাথার ওপর ধরাশায়ী হল। অশ্বখুরের শব্দ ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল। ভানুমতীর খেয়াল হল সে ভয়ের চোটে আড়ষ্ট হয়ে চোখ বন্ধ করে বলরামকে সজোরে বেষ্টন করে আছে।

এতক্ষণ বেগবতীর মাথার ওপর দিয়ে যে বাদল মেঘ উড়ে আসছিল সেই বর্ষণোন্মুখ মেঘপুঞ্জ বিপর্যস্ত আখের ক্ষেতের ওপর গলে পড়তে লাগল। বুনো শুয়োর ধরার গর্তের ভিতর ভিজতে ভিজতে ভানুমতী দেখল ঘোড়সওয়াররা মাঠ ছেড়ে আলের ওপর উঠল। শীঘ্রই জমিদারের অশ্বারোহী সৈন্যদল পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হল।

সৈন্যরা দূরে মিলিয়ে গেলে বলরাম ও ভানুমতী গর্তের থেকে উঠে এল। প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে দুটো দেহ স্বল্প পরিসরে আষ্টেপৃষ্টে একে অপরকে জড়িয়ে শ্বাসরোধ করে যেন এক অস্তিত্বে পরিণত হয়েছিল, একে অপরের প্রতিটি হৃদস্পন্দন অনুভব করেছে এতক্ষণ, অনুভব করেছে একে অপরের শরীরের উষ্ণতা। ষোড়শবর্ষীয়া ভানুমতী এর আগে কখনও পুরুষ শরীরের এত কাছে আসেনি। গর্তের ওপর এসে মাটিতে ছিন্নভিন্ন আখের গাছের ওপর বসে তার ভয়ে ভীত মুখে লজ্জা মিশে গেল। কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্য স্থায়ী হল, পরমুহূর্তে অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে ভানুমতী বলরামের সঙ্গে কর্তিত ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে দৌড় লাগাল। সৈন্যরা এপথে ফিরে আসার আগে বৌদ্ধবিহারে বলরামকে পৌঁছে যেতে হবে। তার নিজেরও বিপদ কম না। রোমথাকে পালাতে সাহায্য করার শাস্তি কি তা সে জানে না, তবে গুরুদণ্ড এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। কিন্তু এখন ও সব ভাবার সময় নেই, সময় নেই পায়ে আখের খোঁচায় সূচবিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণায় থেমে যাওয়ার। ধীরে ধীরে বৃষ্টির জলকণার মাঝে চোখের সামনে আবছা বৌদ্ধ-বিহারের অবয়ব ভেসে উঠল।

BanglaBook.org

শিশুকাল থেকে বলরাম অসংখ্য বৌদ্ধ মহাবিহারের কথা পড়েছে—নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুর, জগদ্দল, রক্তমৃত্তিক, রাঢ়ে কর্ণসুবর্ণ, পূর্বদেশে সমতট, সুহ্মে তাম্রলিপ্তি। সে সব মহাবিহারে ধর্মের সর্বাস্তিবাদ, নাগার্জুনের মধ্যমক, মহায়ন যোগ ইত্যাদি নানা বিষয়ের অধ্যয়নের কথা শুনেছে ; কত বিখ্যাত বিখ্যাত নাম এই সব মহাবিহারের সঙ্গে জড়িয়ে—সঙ্ঘস্থবির দীপঙ্কর, শান্তরক্ষিত, শীলভদ্র, ধর্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র, জিনমিত্র, জ্ঞানচন্দ্র সব মহাপণ্ডিতগণ। বল্লালগ্রামের বৌদ্ধবিহারকে বলরাম ভেবেছিল, এটাও ওইরকমই আর একটা শিক্ষালয় হবে। কিন্তু এই সঙ্ঘারাম-বিহারের মানুষজন বড়ো অদ্ভুত। এরা সকলেই যেন দাবানল থেকে কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে আসা আহত বন্যপ্রাণী। এদের প্রত্যেকের সঙ্গে জড়িত এক চরম দুঃখের তাজা স্মৃতি—বাপ-মা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, প্রিয়জন হিংস্র বিধর্মী সেনাদের লুটতরাজের চরম বলি। কারও ঘর জ্বালিয়েছে তুর্কি পাঠান, আবার কারও সংসার তছনছ করে গেছে মগ-আরাকান। এরা সকলেই বাঙালি হলেও ভাষার টানে ভিন্ন—শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, যশোহর। বলরামের কপালে 'রোমথা'র ছাপ দেখে মঠের বেশির ভাগ ভিক্ষুই তাকে এড়িয়ে চলছে। ব্যাতিক্রম সহদেব।

চয়নবিলের একটা খাড়ি সঙ্ঘারাম-বিহারের ভিতর ঢুকে গেছে। সেই খাড়ির পাড়ে একদল মানুষ একটা নৌকোর কাহন প্রস্তুত করছিল। বলরাম সেখানে সহদেবকে দেখে এগিয়ে গেল। সহদেব যে নৌকোতে কাজ করছিল সে নৌকোটা অতিশয় দীর্ঘ।

'এটা তো বিশাল নৌকো—' বলরাম বলল।

বলরামকে দেখে সহদেবের মুখ খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'এটা "গোধা নৌকো", সাধারণত শুঁটকি মাছের ব্যবসায়ে সাগরে যায়। এই নৌকোগুলোতে লোহার পেরেক মারা হয় না ; শক্ত বেত দিয়ে এমন ভাবে বাঁধা হয় যে, জল ঢুকতে পারে না। এর বাক, কাহন, ইরাক, সুকানবিলা, গুদস্তা, রাদ, মাস্তুল, মাস্তুলের চালুতা, ইসকা এসব আলাদা আলাদাই রাখা থাকে, সমুদ্রযাত্রার ঠিক আগে এগুলো জোড়া দেওয়া হয়।'

'নৌকোর কথা বলতে গেলেই তোমার মুখ-চোখ আনন্দে ভেসে যায়।'

'আমরা বালামী। নৌকো আমাদের প্রাণ।'

বালামীদের কথা বলরাম অনেক শুনেছে। চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তীরে বালামীরা নৌ-নির্মাণে অত্যন্ত পারদর্শী, বাঙালিদের গর্ব এরা। জটামদন তার তহবিল থেকে বৌদ্ধমঠের খরচা বন্ধ করে দেওয়ার পর এরাই এগিয়ে এসেছে নৌকো নির্মাণ ও বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে মঠের খরচা চালাবার।

BanglaBook.org

'বর্ষাকালে সমুদ্র থেকে গোধা নৌকোগুলি ফিরত—' সহদেব বলল—'শ'য়ে 'শ'য়ে হাঙরমুখো নৌকোতে জেলেরা মাছ ধরে ফিরত। কর্ণফুলীর তীরে তখন জেলেদের প্রিয়জনেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকত আর দামামা, দগড়, ঢোল পিটিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে তাদের পরিবারের লোকেদের অভিনন্দন জানাত। আমি ভাবতাম বড়ো হয়ে আমিও একদিন সাগরে যাব। সব একরাতে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল।' সহদেবের চোখ ছলছল করে উঠল।

প্রসঙ্গ পাল্টাতে বলরাম অন্য একটা ছোটো নৌকো দেখিয়ে বলল, 'এগুলো সাগরে যায় না?'

'এটা তো সারেঙ্গা নৌকো, ডোঙা বা শালতির মতো এগুলো নদীতে চলে। এগুলো সাগরের বড়ো ঢেউ সামলাতে পারবে না,' সহদেব বলল। 'এগুলো একটা গাছের কাণ্ড কুঁদে বানানো হয়।'

'কী অপূর্ব তোমাদের নৌ-নির্মাণ,' বলরাম প্রশংসা করল।

'এ তো কিছুই না, চল, তোমাকে আমাদের আসল হাতের কাজ দেখাই।' সহদেব বলরামকে চয়নবিলের খাড়ি যেখানে সঙ্ঘারাম-বিহারের প্রাচীরের তলে ঢুকে গেছে সেখানে নিয়ে গেল। প্রাচীরের ঠিক নীচে জলে দাঁড় করানো একটা বিশাল নৌকো তার সামনেটা হাতির মুখের মতো শুঁড় উঁচিয়ে অভিবাদন করছে।

'অপূর্ব—' বলরাম বিস্ময় প্রকাশ করল।

'এর নাম গজমতি—' সহদেব বলল। 'এটা বালাম নৌকো।' আদর করে নৌকোর গায়ে হাত বোলাল সহদেব। 'যে রাতে আমাদের বৌদ্ধদের গ্রামটা জ্বালিয়ে দিল, এই নৌকোই আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে। অবশ্য সকলের না, আমরা যারা ছুটে কর্ণফুলীর ঘাট পর্যন্ত পৌঁছোতে পেরেছিলাম, তাদের। আমার মায়ের এক পায়ে বিশাল গোদ ছিল, আমার মা পারেনি। সারা গ্রাম শ্মশান হয়ে গেছিল।' তারপর সহদেব বাস্তবে ফিরে এসে বলল, 'বালাম ষোলো দাঁড়ে পাল খাটিয়ে তীব্রগতিতে ছুটে চলে। যে কোনো সাগরের উত্তাল তরঙ্গ অনায়াসে জয় করতে সমর্থ এই বালাম গজমতি।'

বলরাম ভাবল এবার বিহারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হবে, জটামদনের গুপ্তচরেরা তাকে কেউ দেখলে সমূহ বিপদ।

।। সাতাশ ।।

কালাচাঁদের কনুইয়ের এক গুঁতোয় হরু ঠাকুর ধড়মড় করে উঠে বসল—'গুঁতোচ্ছিস কেন?'

'নাক ডাকছিলে!' কালাচাঁদ বলল। 'এদিকে আমরা হা-পিত্যেশ করে বসে আছি শুনব যে রোমথার কি হল।'

'মনে পড়েছে আমার সব—' হরু ঠাকুর বলল, 'তারপর নন্দীধন বলরামকে তাঁর রোমথা করে নিলেন। বলরাম গুহা ছেড়ে পঞ্চানন মন্দিরের পাশে সেবাইতের ছোটো ঘরে এসে উঠল বটে কিন্তু অপমানিত ক্রুদ্ধ জটামদন সুলতানের আদেশনামা বের করাল বলরামের প্রাণদণ্ডের। তার দোষ সে নাকি জঙ্গলে জমিদারের ওপর প্রাণঘাতী হামলা করেছে। জটামদনের সঙ্গে সুলতানের সৈন্য এল বলরামকে বন্দি করতে, কিন্তু তার আগেই নন্দীধন ভানুমতীর সাহায্যে বলরামকে বৌদ্ধবিহারে লুকিয়ে ফেলল। নন্দীধন তালপাতায় লিখে বাবা পঞ্চাননের কিছু মন্ত্র বলরামকে পৌঁছে দিতেন আর বলরাম বৌদ্ধবিহারে বাইরের জগতের অলক্ষ্যে সারাদিন ধরে পাথর কুঁদে সেই পঞ্চানন মন্ত্র মন্দিরের দেওয়ালের জন্য লিখত। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা শালতিতে সেই পাথর নন্দীধনের মন্দিরে পাঠিয়ে দিত।'

'আর ভানুমতী?' কালাচাঁদ বলল।

'ভানুমতী তার প্রিয় সখা চন্দ্রাকে হারিয়ে কিছুদিন মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিল, কী ভাবে জানি না ধীরে ধীরে বলরাম তার মনের শূন্যস্থানে প্রবেশ করল। প্রতিদিন দুপুরে সে বৌদ্ধ-বিহারে বলরামের জন্য খাবার নিয়ে যেত। নন্দীধন ভানুমতীকে সাবধান করে দিয়েছিল—জটামদনের গুপ্তচর সর্বত্র—ভিখারি, বণিক, সন্ন্যাসী, ক্ষৌরকার। তাই ভানুমতী একেক দিন একেক পথ দিয়ে বুদ্ধ বিহারে যেত। বলরাম বজ্রসূচি, হাতুড়ি, ছেনি রেখে খেতে বসত, আর ভানুমতী বসে বসে পাষাণে বলরামের উৎকৃষ্ট হাতের কাজ দেখত। কখনও খাওয়ার পর বলরাম বাঁশি বাজাত। দেখতে দেখতে মাস গড়িয়ে গেল, বলরামের মুণ্ডিত মস্তকে একরাশ বাবরি চুল—যখন সে চোখ বুঁজে একমনে বাঁশি বাজায় মনে হয় যেন ভগবান বলরাম তার অনুজে রূপান্তরিত হয়েছে।'

'ভানুমতী আর বলরাম—,' কালাচাঁদ বলল।

'কথা বলিস নে কালা—' হরু ঠাকুর বাধা দিল। 'ভুলে যাওয়ার আগে চট করে লিখে ফেলি দাঁড়া।' হরু ঠাকুর খসখস করে অনেকটা লিখে ফেলল। তারপর বলল, 'আমি পড়ি শোন—

ভানুমতী আইলী রম্ভঅ পত্তা মাথে।
তডডু, ভাণ্ড, ভাবাড়িআ কোঅলী হাথে।
ঘডুলি পাণি দেসি ধুয়িআঁ দুঈ হাথ।
গাইক ঘিত্তা ছড়াঞা ওগগর ভাত।
বাতিঙ্গন মোইণি মাছ রসাউণ দিআঁ।

দ্রগড় ছন্দ খীর তিন্তিলি ওড়শিআ।
বলরাম খাএ জেন উপভোগে অতি।
খিধা খন্ত হৈল তাঁর দেখে ভানুমতী।
গাঙ্গৌর গঞ্জাত দিলা পান মজা গুয়া।
বলরাম আঁখি ধারা ভিজালেক হিআঁ।
অন্ন খাআঁ বলরাম শুরু কৈলা কাজ।
পঞ্চানন আখর উয়িবে শিলা মাঝ।
পাথরত পাথর পাণি ঘষি একমনে।
আঙ্গুল চালাঞা রাম হেরে খনে খনে।
পাছেতঁ পাথরত লিখি খড়ী আখর।
বলরাম খিরদীঠে নেহালে এবার।
হাতইড়া টঙ্কী মাইলেঁ কাম্পে পাথর।
ধীরে ধীরে পাথরত উয়িল আখর।
অপরুব দেহকান্তী গঢ়ন সুঠাম।
পাথর পাঞ্চর জেন নাহাইলঁ ঘাম।
ভানুমতী বৈশে দেখী তরল নয়নে।
টালিলেক হিআ তাঁর জানে কোণ খণে।
ময়ূর নাচহ মন বারিযাএ যথা।
কবি কবিরাজ ভণে পঞ্চানন কথা।।'

হরু ঠাকুর থামল।

সদানন্দ বললেন, 'বেশ হয়েছে। শিলালেখ, তাম্রপত্রলেখ এক সময়ে বারেন্দ্র কায়স্থদের একচেটিয়া পারদর্শিতা ছিল। সেকালের রাজারা এঁদের দূর দূরান্তে নিয়ে যেত লিখন কার্যের জন্যে। সেকালে পাথরে পাথর ঘষে ঘষে পাথর মসৃণ করে তারপর তার ওপর খড়ি দিয়ে লিখে তাকে হাতুড়ি ছেনি দিয়ে খোদাই করে শিলালিপি লেখা হত। কিন্তু তুমি কীভাবে এটা জানলে হরু ঠাকুর?'

হরু ঠাকুর লাজুক মুখে বলল, 'বইতে পড়েছিলাম কর্তামশাই।'

কালাচাঁদ মনে মনে বলল—মাছকে শুধায় ডুব সাতার শিখলে কী ভাবে?

বদন বলল, 'মামা, তারপর কী হল?'

হরু ঠাকুর বলল, 'বলছি শোন—

বিহাণে আইলী কণ্যা বুদ্ধ বিহার।
গাঙ্গৌর বসন কানে তালিপত তাড়।
কেশপাশেঁ আমলক গলে গুঞ্জা-হার।।

বলরাম হয়িল আদেখ দেউলে।
ণাম্বিছে বলরাম সরোঅর জলে।
আবগাহি খণে খণে পশিছে পাতালে॥

ভানুমতী আসিল সরোঅর কুলে।
থাহা হৈতে তটে বলরাম তুলিলেঁ।
বুয়িল কনআঁ কঙ্কন পাতালে পাইলে॥

সিকিত বসন অঙ্গে আদিত্য সোনাএ।
কনক কঙ্কন আম্হি দিলু তোম্হাএ।
পঞ্চাননকথা হেথা কবিরাজ গাএ॥

'তারপর?' সদানন্দ বললেন।

'এইবার আমরা পঞ্চাননমঙ্গলের অঙ্কের স্তোত্রগুলোতে আসব—' হরু ঠাকুর বলল। 'চয়নবিল থেকে তোলা পাথরে লেখা স্তোত্রগুলো এখানে লিখে রেখেছি।' হরু ঠাকুর পড়তে লাগল—

এহিমতেঁ পঞ্চমুন্ডে কাটী গেলা মাষ।
দেউল গাতরে লিপি ভৈল চারিপাশ।
শুন সভাজন পঞ্চানন স্তোত্র ভাণী।
হাঁস যথা পাণী ছাড়ি দুধ খাএ গুণী॥'

'এখানে একটা সূত্র দিয়েছ হরুবাবু—' সদানন্দ বললেন। 'যে যেমনভাবে দেখে এটাকে। কেউ দেখবে পঞ্চাননস্তোত্র আবার কালাচাঁদের মতো যারা অঙ্কে তুখোড় তারা দেখবে আর্যভট্ট।'

'কর্তামশাই, একটা কথা ছিল—' কালাচাঁদ মাথা চুলকে ইতস্তত করে বলল।

'বল কী কথা—' সদানন্দ বললেন।

'সব কিছু যখন সত্যি কথাই বলা হয়ে গেল, তখন এটাও বা বাদ থাকে কেন—' কালাচাঁদ বলল।

'কালা, ঝেড়ে কাশ—' হরু ঠাকুর বলল।

কালাচাঁদ দু'কানের লতিতে আঙুল দিয়ে চেপে বলল, 'একটু মিছে কথা বলতে হয়েছিল কর্তামশাই। অঙ্কের ধাঁধাগুলো আসলে...এই বদন হল অঙ্কের মাস্টার...এসব কী আমার কম্মো?'

সদানন্দ রাগ করবেন কী করবেন না ভাবার আগেই কালাচাঁদ বলল, 'তবে হরিণটা যে আমি নিজেই রান্না করেছিলাম, ওটা তো আপনি নিজের চোখেই দেখলেন, আপনার রান্নাঘরেই—'

BanglaBook.org

সদানন্দ বললেন—'ওই হরিণের মুখ চেয়ে তোকে ক্ষমা করে দিলাম। হরু ঠাকুর, তারপর কী?'

হরু ঠাকুর বলল, 'এবার আসবে পঁয়ষট্টিটা অঙ্কের পদ্য।'

হরু ঠাকুর পড়া শুরু করল—

ত্রিদিবেশ॥

চন্দ্রচূড় মহেশ্বর ধেআই চরণ।
চতুর্দ্দিশ ভকতীএঁ ভরায়িলেঁ মন॥
ঈশর ত্রিদশগণের শৈবলিনী মাথ।
পঞ্চানন দেহযুতী দেব ভোলানাথ॥
গ্রহতারা—'

বাইরে রাস্তায় একটা বড়ো গাড়ি থামার আওয়াজ হল। দড়াম করে গাড়ির দরজা বন্ধ হল। কালাচাঁদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মাথার ভিতর বিপদঘণ্টি বাজিয়ে দিল। কালাচাঁদ জানলার পর্দা অল্প সরিয়ে তড়িতপদে ফিরে এসে উত্তেজিত গলায় বলল—'সব্বোনাশ, ধাড়া।'

BanglaBook.org

॥ আটাশ ॥

'ধাড়া এই অসময়ে?' সদানন্দ বিস্মিত।

'নিশ্চয়ই ধাড়া ওর পাথর নিতে এসেছে। এখন উপায়?' কালাচাঁদ বলল।

সদর দরজা ধাক্কানোর আওয়াজ উঠোন পেরিয়ে ভেসে এল।

'আজ ওর বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব। লন্ডনে মিউজিয়ামের গুষ্টির তুষ্টি করে না ছেড়েছি তো আমার নাম সদানন্—'

'কর্তামশাই, আপনার মাথাটা এসময়ে ঠাণ্ডা রাখতেই হবে। যা বলার আমি বলব, আপনি শুধু চোখটা বুজে বসে থাকুন—' কালাচাঁদ বলল। 'হরু ঠাকুর, তুমি আর বদন পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাও। এ বাড়ির ত্রিসীমানায় এস না। আমি ধাড়াকে সামলাচ্ছি।'

বদন বলল, 'ওই ফ্রডটার ভয়ে আমি পিছন দরজা দিয়ে পালাব? অসম্ভব।'

'পাগলামো করিস না, কালা যা বলছে তাই কর—' হরু ঠাকুর বদনকে ঠেলতে ঠেলতে পিছনের দরজা দিয়ে দ্রুতপদে বের হয়ে গেল। কালাচাঁদ পিছনের দরজা বন্ধ করে বৈঠকখানায় একবার ভালো ভাবে দেখল তারপর দালান-উঠোন পেরিয়ে এসে সদর দরজা খুলল—ডান হাতে একটা বড়ো

মিষ্টির বাক্স নিয়ে হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে অংশুমান ধাড়া, গলায় ঝুলছে একটা ক্যামেরা।

ধাড়ার মুখ দেখে মনে হল সে কালাচাঁদকে এ সময়ে এখানে একদম আশা করে নি। কালাচাঁদের দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে তাকে একদম অগ্রাহ্য করে ধাড়া বৈঠকখানার দিকে এগিয়ে গেল। কালাচাঁদ পিছনে পিছনে ঢুকে দেখল সদানন্দ চোখ বন্ধ করে দু'হাত কাঁঠাল কাঠের চেয়ারের হাতলে রেখে এলিয়ে বসে আছেন। ধাড়া ভিতরে ঢুকে হাসিমুখে জোর গলায় বলল, 'কনগ্র্যাচুলেশনস্! ভটচাজমশাই, মিষ্টিমুখ করুন। দু-দু'টো সুসংবাদ আছে।'

সদানন্দ ভটচাজ চোখ খুলে তাকালেন, কিন্তু নিরাসক্ত দৃষ্টি। কালাচাঁদ জানে সুসংবাদ নয়, আপাতত মিষ্টির নাম শুনে বুড়ো চোখ খুলল। বুড়োটা বড্ড লোভী।

'প্রথম সুসংবাদ হল আপনার বাঁ-হাতের ট্রিটমেন্টের জন্য এক নামকরা বিলেত ফেরত ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছি। আমার সঙ্গে ওনার লন্ডনেই আলাপ। আপনার হাত এবার ঠিক হয়ে যাবে। কাল সকালে এসে আপনাকে নিয়ে যাব। নার্সিংহোমে কটা দিন থাকতে হবে। আর দ্বিতীয় খুশখবর হল আমার আরবের সুপণ্ডিত বন্ধু আল খোয়ারিজমি আপনার সমস্ত অঙ্কের কবিতা লেখা পাথর কিনে ফেলছেন। উনি ওগুলোকে সারা পৃথিবীর লোক সমক্ষে আনতে চান। একটু চুপচাপ বেচাকেনাটা করতে হবে, কিন্তু সে আমি সামলে নেব। নিন মিষ্টিমুখ করুন, আপনার জন্য কলকাতা থেকে বাঞ্ছারামের কড়াপাকের জলভরা এনেছি, আপনি বলেছিলেন বাঞ্ছারামের মিষ্টি আপনার প্রিয়।' ধাড়া প্যাকেট খুলে একটা আপেল সাইজের কড়াপাকের সন্দেশ বের করে দেখল সদানন্দের দু'চোখ বন্ধ।

কালাচাঁদ ফিসফিস করে বলল, 'ওনার পরশু সকালে একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। ডাক্তার পনেরো দিন একদম বেড রেস্টে থাকতে বলেছেন। কিন্তু ডাক্তারের কথা শোনে কে? জোর করে এখানে এসে বসলেন।'

'ও মাই গড?' ধাড়ার গলার স্বর খাদে। 'ওনাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কাল বিকালে একটা পুঁথি দেখাবার খুব দরকার ছিল। এসব কী ভাবে হল?'

'কাল সকালে আরকিওলজি ডিপার্টমেন্টের লোকেরা বাড়িতে এল। আপনার শিলালিপি দুটো নিয়ে ওদের সঙ্গে কর্তামশাইয়ের কথা কাটাকাটি মতো হল। তারপরই—'

ধাড়া ঘাড় ঘুরিয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার পাথর দু'টো?' ধাড়ার মাথায় হাত। 'ভেবেছিলাম একটা ফটো তুলে নেব আমার লন্ডনের মিউজিয়ামের এক্সিবিশনের জন্য।'

সদানন্দ চোখ বন্ধ রেখে ডান হাতটা সামনে এগিয়ে দিল।

ধাড়া উত্তেজিত হয়ে বলল, 'দাঁড়াও, উনি বোধহয় দেখাচ্ছেন পাথরগুলো কোথায় রাখা।'

'উনি কড়াপাকের একটা সন্দেশ চাইছেন,' কালাচাঁদ উত্তর দিল।

কালাচাঁদ ধাড়ার হাত থেকে সন্দেশটা নিয়ে সদানন্দের হাতে দিল আর সদানন্দ হাতি যেমন শুঁড়ে করে মুখে খাবার ঢোকায় সে ভাবে হাতটা মুখে ঢুকিয়ে জলভরাটা একমনে চিবোলেন তারপর আবার চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন।

'আপনার পাথরগুলো নিয়েই তো এত ঝামেলা হল—' কালাচাঁদ ধাড়াকে ঘরের কোনায় টেনে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল। 'কর্তামশাই বললেন—ডক্টর ধাড়াকে আমি কথা দিয়েছি, এ পাথর আমি কিছুতেই দেব না। জোরাজুরি হল, ওরা সবকটা পাথর নিয়ে গেল। বলল এ পাথর পাঁচমুড়োর সম্পত্তি এখানেই থাকবে। রাতারাতি সরকার এই পাঁচমুড়োতে পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দির বানিয়ে ফেলল যাতে এই পাথর অন্য প্রদেশের মিউজিয়ামে চলে না যায়।'

'চয়নবিলের পাথর দিয়ে মন্দির?' ধাড়ার চোখ কপালে। 'সব্বোনাশ—' ধাড়া ধপ করে চামড়ার চেয়ারে বসে পড়ল। 'আমি যে আল খোয়ারিজমিকে কথা দিয়ে ফেলেছি। কথার নড়চড় হলে ওই পাগলা—'

কালাচাঁদ বলল, 'কী আর হবে, শেখ আপনার গলা কেটে ফেলবে না। আপনি বাজিতপুর গেসলেন নাহলে আপনাকে খবরটা দিতাম। এদিকে কত কিছু ঘটে গেল।'

'কী ঘটল?'

কালাচাঁদ বলল, 'কর্তামশাই সুস্থ থাকলে আপনাকে শুভ সংবাদটা দিয়ে কত আনন্দ পেতেন, কথাটা আমিই বলি, আপনি শুনেছেন কি যে পঞ্চাননমঙ্গল পাওয়া গেছে?'

'বল কি? কোথায়?'

'একটাকিয়ার ভাতুড়িয়াদের বাড়িতেই রাখা ছিল একটা কপি। চোদ্দশো সালের লেখা পুঁথি।'

'সত্যি?' ধাড়া অবাক। 'চারদিক থেকে দেখছি পঞ্চাননমঙ্গল আগাছার মতো গজিয়ে উঠছে। আরেকজনও কে নাকি শেখের কাছ থেকে দু'লাখ টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে গেছে। শেখ তাড়াহুড়া করে ফোন করে ডেকে পাঠাল। আমায় বলেছে পুঁথিটা ভালো ভাবে যাচাই করতে।'

'ওটা আমিই—' কালাচাঁদ বলল। 'সেদিন বললেন শেখের তেলের পয়সা, লাখ টাকা নস্যি, তাই ডিবেতে শেখের কাছ থেকে কিছু নস্যি নিয়ে এলাম।'

'তুমি তো ডেঞ্জারাস লোক হে। কত দাম বলেছ?'

'দু' খোকা।'

BanglaBook.org

'মাত্র দু'কোটি।' ধাড়া কপাল চাপড়াল। 'ডাহা ঠকিয়ে দিল। শোনো, আমি তোমাকে আড়াই দেব। শেখের কাছ থেকে আমি তিন আদায় করব। চলবে?'

'শেখ রাজি হলে আমার কী আপত্তি—' কালাচাঁদ বলল। 'তবে কাল বিকেলে বলেছে আপনি নাকি চেক করে বলবেন পুঁথিটা খাঁটি না জাল।'

'আরে এই জন্যেই তো এত রাতে এই ধ্যাড়ধ্যাড়ে গোবিন্দপুরে আসা। কিন্তু এখন কী হবে? ভেবেছিলাম সদানন্দ বাবুকে দিয়ে পুঁথিটা যাচাই করাব। পুঁথিটা আসল তো?'

'হাম্ড্রেড পার্সেন্ট। নকল হলে পয়সা ফেরত।'

'সে সুযোগ শেখ দেবে না। বলেছে একদম ঠিকঠাক দেখে নিতে, নকল মাল কিনলে কুচি কুচি করে কেটে চিড়িয়াখানায় বাঘের মুখে দেবে। কাল তিনটের সময় আমার হোটেলে এস। আমি দেখি কি করা যায়।' ধাড়ার হঠাৎ কি মনে পড়ল। 'কিন্তু একটা মুস্কিল আছে। শেখ এই পাথরের লেখা দেখতে চেয়েছে। বলেছে এই পুঁথির সঙ্গে পাথরের লেখা পদ্যের লাইন মেলে কিনা সেটা দেখবে।'

'এই চয়নবিলের পাথরের কথা ওকে কি আক্কেলে আপনি ওকে বললেন?'

ধাড়া অপরাধীর মতো মুখ করে বলল—'আমি কি জানতাম পুঁথিটা পাওয়া যাবে? শেখ এত প্রেসার দিচ্ছিল, ম্যানেজ করতে পারছিলাম না। তাই—'

'একটা কথা বলুন তো, এই পঞ্চাননমঙ্গল পুঁথিতে কী এমন মারাত্মক কিছু আছে যার জন্যে আপনার শেখ এত টাকা খরচ করতে চায়?'

'জানিনা—' ধাড়া ঘড়ির দিকে তাকাল। 'পাথর দিয়ে মন্দির হচ্ছে এ খবরটা শেখকে দিতে হবে। আজ আসি তবে—'

'গভরমেন্টের কাজ, পারমিশন ছাড়া ওরা বিদেশিদের দেখতে দেবে কিনা তাও জানি না। একটা দিন যদি সময় দ্যান তবে আমি লোক লাগিয়ে...সন্দেশের প্যাকেটটা ভুল করে নিয়ে যাচ্ছেন—' কালাচাঁদ বলল।

'ওঃ হ্যাঁ, এই নাও।'

কালাচাঁদ ধাড়াকে এগিয়ে দিতে গিয়ে উঠোন পর্যন্ত এগিয়ে এসে বলল, 'শেখ সাহেবের কাছ থেকে তিন কোটি চাইব কোন মুখে স্যার? দু'লাখ টাকা অ্যাডভানস নিয়ে এসেছি যে।'

'সে চিন্তা কোরো না। শুধু শেখের সঙ্গে কথা হলে তোমরা বলবে ওই হাতুড়ি বাড়ির—'

'ভাতুড়িয়া—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যাই হোক, ওই কুলাঙ্গারটা তিন কোটির নীচে পঞ্চাননমঙ্গল বেচবে না।'

BanglaBook.org

'ঠিক আছে স্যার। মন্দিরের পাথর বিদেশীদের দেখাবার জন্য কিছু দক্ষিণা—' কালাচাঁদ বলল।

কোটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দু'টো একশো টাকার নোটের বান্ডিল বের করে ধাড়া বলল, 'বিশ হাজার। আজ আর সঙ্গে কিছু নেই।'

'কোনো ব্যাপার না, আমি ম্যানেজ করে নেব।' কালাচাঁদ সদর দরজা বন্ধ করে গাড়িটা চলে যাওয়ার আওয়াজ শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করল তারপর ঘরে ফিরে মিষ্টির বাক্স থেকে একটা মিষ্টি তুলে কামড় লাগাল আর সঙ্গে সঙ্গে সদানন্দ খেঁকিয়ে উঠল—'মন্দির বানানো কি মুখের কথা? এ কি আলাদিনের প্রদীপ নাকি যে ঘষলেই রাজপ্রাসাদ।'

'কি করব? পাথর চাইতে এসেছিল যে? গল্প কি মুখে মুখে বানানো সম্ভব? যা মুখে এসেছে তাই বললাম।' কালাচাঁদ ইতস্ততভাবে বলল।

'মন্দির বানাতে পয়সা লাগে। পয়সা কি চয়নবিল থেকে উঠে আসবে? হুঁ বুদ্ধির ঢেঁকি।' সদানন্দ আরেকটা জলভরায় কামড় বসিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, 'তাছাড়া আরও একটা ফ্যাচাং আছে।'

'কী ফ্যাচাং?'

'পাঁচমুড়োর প্রতিটি মানুষ পঞ্চাননমঙ্গলে বিশ্বাস করে আর তাই তারা কখনো এগাঁয়ে পঞ্চাননবাবার মন্দির বানায় নি।'

'মানেটা বুঝলাম না—' কালাচাঁদ সন্দেশের খোলা প্যাকেটটা বন্ধ করল। এ দিকে বুড়োর মুখ দেখে মনে হচ্ছে আরেকটা খাব কি খাব না ভাবছে।

'এ গাঁয়ের লোকেরা পুরোনো প্রবাদে বিশ্বাস করে পঞ্চাননবাবা নাকি নিজেই একদিন মাটির নীচ থেকে উঠে আসবে।'

'যাঃ, তাই আবার হয় নাকি?'

'বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে শিবলিঙ্গ নাকি মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছে। বাজিতপুরে—'

'আরে থামুন তো কর্তা,' কালাচাঁদ এবার রাগী রাগী গলায় বলল। 'কোন্ ভরসায় বাবা পঞ্চানন এখানে মাটির নীচ থেকে উঠবেন বলুন তো? এখানে এসে কোথায় থাকবেন বাবা? পলাশডাঙার মাঠে? একটা মন্দির বানানো থাকলে তবেই না বাবা ভরসা পেয়ে উঠবেন। যেমন আপনি তেমন আপনার পাঁচমুড়োর লোক। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে গ্রামে পঞ্চায়েত ডেকে বলুন আপনার স্বপ্নের কথা।'

'আমি আবার কোন্ স্বপ্ন দেখলাম?'

'দেখেন নি, রাত্তিরে দেখবেন—' কালাচাঁদ বলল। 'বাবা পঞ্চানন আপনার শিয়রে এসে বলছেন যে, সদানন্দ আমার একটা মন্দির বানিয়ে দে, আমার আসার সময় হয়েছে। আপনি তখন বাবাকে প্রণাম করে স্বপ্নে বললেন—বাবা

BanglaBook.org

আমার জমিদারি পড়তির দিকে, আমার কি সে সামর্থ্য আছে যে আমি তোমার মন্দির বানাই। তখন বাবা বললেন, ওরে সদা, পলাশডাঙার মাঠে অত পাথর পড়ে আছে তাই দিয়ে আমার মন্দির বানাস। আর গ্রামে আমার যে ভক্ত আমার এই মন্দির বানাতে ঘাম ঝরাবে তার প্রচুর কল্যাণ হবে।'

'আমি মিথ্যা কথা বলতে পারব না—' সদানন্দ সোজা-সাপ্টা উত্তর দিল।

'আপনাকে বলতে হবে না, আমি বলব—' কালাচাঁদ বলল, 'আপনি আপনার এই কাঁঠাল কাঠের সিংহাসনে চোখ বন্ধ করে বসে থাকবেন। আমি আপনার হয়ে ঝুড়িঝুড়ি মিথ্যা কথা বলব। আমাকে শুধু এইটুকু বলুন যে, এ-গাঁয়ে ভালো রাজমিস্ত্রি কে আছে, যে একটা মন্দির একদিনে বানিয়ে দেবে?'

'আফজল, স্টেশনের পিছনেই ওর লাল দোতলা বাড়ি। বিশ্বস্ত লোক, হাতের কাজ পাকা—' সদানন্দ বললেন। 'কিন্তু পঞ্চাননবাবা জল থেকে উঠবে কী ভাবে?'

'সে দায়িত্ব আমার—' কালাচাঁদ আশ্বাস দিল। 'কলকাতা থেকে পাথরের পঞ্চানন মূর্তি বানিয়ে নিয়ে এসে রাতের বেলা চয়নবিলের ঘাটে এনে অর্ধেক ডুবিয়ে রাখব। সকালে কেউ না কেউ তো ওটা দেখতে পাবেই।'

'কী ভাবে বানাবি এক দিনে কষ্টিপাথরের পঞ্চানন? কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ তাতে ধাতব পঞ্চমুখ। ইয়ার্কি নাকি?'

'চেষ্টা তো করতে হবেই কর্তামশাই। প্রাণ বাঁচানোর লড়াই লড়ছি এখন, কাল সকালে যাব কুমোরটুলিতে—টাকা যা লাগে লাগুক, বলব এক্সপ্রেস ডেলিভারি, কাল রাতে পঞ্চানন মূর্তি চয়নবিলে ডুবিয়ে দেব। তার পরের দিন সকালে বাবা পঞ্চানন পুকুরপাড়ে দর্শন দেবেন, একটা স্থাপনা পুজোর আয়োজন করবেন, আর দুপুরে আরবের শেখ মন্দির দেখে যাক। তারপর এক হাতে তিন কোটি অন্য হাতে পঞ্চাননমঙ্গল।'

পিছনের দরজায় ধাক্কার আওয়াজে কালাচাঁদ গিয়ে দরজা খুলল—বদন দাঁড়িয়ে আছে, বৃষ্টিতে ভিজে চুবুচুবু। বদন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, 'মামাকে দেখেছ?'

'হরু ঠাকুর! সে তো তোর সঙ্গেই বেরল?'

'আমরা কী করব ভেবে না পেয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বসলাম। একটু ঝিমুনি ঝিমুনি লাগছিল, হঠাৎ চোখ খুলে দেখি পাশে মামা নেই। ভাবলাম মাঠে পেচ্ছাপ করতে গেছে বোধহয়। আবার একটু ঘুম লাগালাম। কিছুক্ষণ পর সারা প্ল্যাটফর্ম ঝাঁকিয়ে একটা মেলট্রেন আমার ঘুমটা ভাঙিয়ে বেরিয়ে গেল। তাকিয়ে দেখি পাশে মামা নেই। তাই ছুটতে ছুটতে এখানে এলাম, পথে তেড়ে বৃষ্টি নামল।'

কালাচাঁদ বলল, 'সব্বোনাশ আবার হরু ঠাকুরের সমনামবুলিজম হল না তো?'

BanglaBook.org

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? ঘুমোচ্ছিলাম আমি আর সমনামবুলিজম হবে মামার?'

কালাচাঁদ তাক থেকে টর্চ লাইটটা নিয়ে বলল শিগগিরি চল। হরু ঠাকুরকে শিয়াল তুলে নিয়ে যাওয়ার আগে।'

দু'জনে বৃষ্টির মধ্যে পড়িমরি করে দৌড় লাগাল।

।। উনত্রিশ ।।

টর্চ হাতে এক দৌড়ে অন্ধকার রাস্তায় উঠেই কালাচাঁদ দেখল উলটো দিক থেকে কে যেন আসছে। কালাচাঁদ চিৎকার করে ডাকল—হরু ঠাকুর, বদন ডাকল—মামা।

উলটোদিকের মানুষটা টর্চের আলো থেকে দু'হাত দিয়ে চোখ ঢেকে বলল, 'চিল্লাচ্ছিস কেন?'

কালাচাঁদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আর তারপর খুব রাগ হল—'একটু বলে যেতে পারো না, রাতবিরেতে একা একা কোথায় গেছ? তোমাদের কথা না হয় নাই বললাম, গোখরোগুলো এ সময়ে মাঠে ধেড়ে ইঁদুর ধড়তে বেরয়. একটা ছোবল লাগালে—'

'আরে আমার কিছু হবে না?'

'খোঁড়াচ্ছ কেন? আরে পায়ে ওটা কী বাঁধা?'

'পিছলে পড়ে পা-টা একটু মচকে গেছিল, তার ওপর শামুকে লেগে কেটে গেল। বেশ রক্ত পড়তে লাগল তাই পকেট থেকে রুমালটা খুলে ছিঁড়ে পায়ের রক্ত বন্ধ করলাম। এখন ঠিক আছি। চল চল, খিদে পেয়ে গেছে।'

'তোমরা বাড়ি যাও, আমাকে একটু আফজল মিস্ত্রির বাড়ি যেতে হবে?'

'আফজল মিস্ত্রি? এই বৃষ্টি বাদলের রাতে? কাল যাস।'

'কাল সক্কাল সক্কাল কলকাতা যাব, ঠাকুরের অর্ডার দিতে। তোমরা যাও, আমি এক্ষুনি আসছি।'

হরু ঠাকুর থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'দ্যাখ কালা, তোর মতলব কী সেটা ভেঙে না বললে আমি এখান থেকে এক পাও নড়ব না। নিশ্চয়ই ধাড়া হতচ্ছাড়াটা আবার কোনো ঝামেলা পাকিয়ে গেছে।'

কালাচাঁদ বুঝল হরু ঠাকুর নাছোড়বান্দা। সে বলল, 'আচ্ছা চলো, রাস্তায় যেতে যেতে বলছি।'

BanglaBook.org

সংক্ষেপে ধাড়ার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলার কথোপকথনের বৃত্তান্ত শুনে হরু ঠাকুর বলল, 'সব কাজ ভালয় ভালয় মিটে গেলে ধাড়াটাকে ন্যাংটো করে—'

'—সারা গায়ে দুর্গন্ধে ভরা মহামাঁষ তেল মাখিয়ে দেব,' কালাচাঁদ বাক্য সমাপ্ত করল।

'ঠিক বলেছিস—' হরু ঠাকুর খুশি হল।

কথা বলতে বলতে কালাচাঁদ স্টেশনের কাছে পৌঁছে গেল। দোতলা লাল বাড়িটা দেখে দরজা ধাক্কাল। যে লোকটা লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে দরজা খুলল তার মুখ দিয়ে ভকভক করছে মদের গন্ধ।

'আফজল ঠিকাদারকে খুঁজছি?'

লোকটা এক নজর কালাচাঁদদের দেখে বলল, 'এখন একটু মাল টানছি ভাই, আজ বড় ধকল গেছে। কাল সকালে এসো।'

কালাচাঁদ বলল, 'আমরা জমিদার সদানন্দ ভটচাজের কাছ থেকে আসছি।'

'কী দরকার?'

কালাচাঁদ বলল, 'আজ সন্ধেয় ঘুম থেকে উঠে জমিদারবাবু বললেন যে, উনি পঞ্চানন দেবতার স্বপ্ন পেয়েছেন, বাবা পুজো চান।'

লোকটার নেশায় যেন কালাচাঁদ এক বালতি জল ঢেলে দিল। লোকটা বলল, 'বলেন কি? আমিই আফজল।'

কালাচাঁদ বলল, 'বাবা নাকি কর্তামশাইকে স্বপ্নে বলেছেন আমার আর জলের তলায় থাকতে ইচ্ছে করছে না, আমি উপরে আসব। মন্দির বানিয়ে আমার পুজো করবি।'

আফজল বলল, 'ইনসাআল্লা, জমিদারবাবু মরে গেলেও ঝুট কক্ষনো বলবেন না। চলুন ওনার সঙ্গে কথা বলে আসি।'

কালাচাঁদ বলল, 'ওনার শরীরটা খারাপ হয়েছে, তাই আমাকে পাঠালেন, নতুবা নিজেই আসতেন।'

আফজল বলল, 'আমাকে কী করতে হবে বলেন।'

কালাচাঁদ বলল, 'বাবা পরশু সকালে পুজো চান। জমিদারবাবু বললেন একদিনে মন্দির বানানো অসম্ভব। বললেন যে আপনাকে খবরটা দিতে।'

আফজল আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আল্লা, মেহেরবানি।' তারপর কালাচাঁদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আল্লার ঋণ শোধ করার মতো গোস্তাকি যেন না হয় কখনও। বাবা পঞ্চাননের পানি আমার পূর্বপুরুষকে কালাজ্বরে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল, আমার বাবা আমাকে বলে গেছে এই মন্দির বানাবার সুযোগ যদি আল্লা দ্যায়, সব কাজ ছেড়ে এই কাজটা করবি। কিন্তু বাবা

BanglaBook.org

পঞ্চানন নিজে জল থেকে না উঠলে তো মূর্তি বসানো যাবে না।'

কালাচাঁদ বলল, 'সব বাবার ইচ্ছা, তিনি যা চান তাই হবে। এখন ওনার মন্দির বানাবার আদেশ হয়েছে।' কালাচাঁদ পকেট থেকে দশ হাজার টাকার একটা বান্ডিল বের করে বলল—'এটা অ্যাডভানস। এই বৃষ্টির রাতে বাড়িতে—'

'আরে ছি ছি, লজ্জা দেবেন না। আফজল মিস্ত্রিকে কর্তা ইয়াদ করেছেন বাবা পঞ্চানন মন্দিরের কাজে, এর চেয়ে আল্লার আর কী করুণা হতে পারে। কোথায় হবে মন্দির?'

কালাচাঁদ বলল, 'কাল সকালে বলে দেব।'

আফজল বলল, 'কাল সকালের মধ্যে ভিত কেটে ইট বসে যাবে। আজ সারারাত ধরে কাজ না হলে পরশু সকালের মধ্যে মন্দির ফিনিশ হবে না। ইনসাআল্লা, আফজল সময়ের মধ্যে মন্দির বানিয়ে দেবে। মন্দিরের ডিজাইন এনেছেন?'

হরু ঠাকুর বলল, 'আমি জানি মন্দিরটা কেমন দেখতে। চারদিক থেকে পাথরের সিঁড়ি দালানে উঠে যাবে। মন্দিরের চার দিকে চারটে দরজা। মন্দিরের দেওয়াল কালো, মন্দিরের গায়ে সেলেট পাথরে কবিতা লেখা।

'সেলেট পাথরে কবিতা?' আফজলের নেশাগ্রস্ত চোখে ধোঁয়াশা।

কালাচাঁদ বলল, 'কবিতা লেখা পাথরগুলো পলাশডাঙার মাঠে আছে। তুমি ভাই এই দশ হাজার টাকা রাখো। এসব এক আরবের ভক্তের টাকা।' কালাচাঁদ জোর করে আফজলের হাতে টাকা গুঁজে দিল। আফজল টাকা রাখতে ঘরে গিয়ে গেঞ্জির ওপর একটা ফতুয়া চাপিয়ে এক হাতে একটা ঝুলে নারকোল, অন্য হাতে একটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ নিয়ে বেরিয়ে এসে বলল, 'চলুন, কনস্ট্রাকশন সাইটটা একবার দেখে আসি।'

চারজনে মিলে হেঁটে হেঁটে পলাশডাঙার মাঠে এসে নামল। কালাচাঁদ পাথরগুলো দেখিয়ে বলল, 'এই পাথরগুলো মন্দিরের দেওয়ালে লাগাতে হবে। আর মন্দিরটা যেন প্রাচীনকালের মতো পুরানো দেখতে হয়।'

'পুরোনো কেন?'

'সেরকমই আদেশ আছে।'

'কোই বাত নেহি,' আফজল বলল। 'পুরোনো কাঠের বিম আছে কিছু, ফিরিঙ্গিদের গির্জা ডিমোলিশ কন্ট্রাক্ট থেকে পাওয়া। ওগুলো লাগিয়ে দেব।'

'ছোটো বটগাছ পাওয়া যাবে?' কালাচাঁদ বলল।

'বটগাছ! কেন?'

'অশ্বত্থ হলেও চলবে, পাথরের দেওয়ালের ফাঁকে যদি বটগাছ ওঠে তাহলে বেশ পুরোনো পুরোনো লাগবে।'

BanglaBook.org

আফজল বলল, 'আমার ওপর ছেড়ে দিন, দেখি কী করতে পারি।' আফজল মাঠে একটু ঘোরাঘুরি করে বলল, 'সারা মাঠের নীচে পাথুরে জমি। এ খুঁড়তে অনেক মেহনত লাগবে। এই জায়গাটাতে একটু নরম জমি আছে। এখানে মন্দির বানিয়ে দিই?'

কালাচাঁদ বলল—'হ্যাঁ হ্যাঁ তাই দাও।'

হরু ঠাকুর গম্ভীর গলায় বলল, 'মন্দির মোটেই এখানে ছিল না।'

আফজল ভাবল সে ঠিক মতো শোনে নি। সে বলল, 'জী?'

কালাচাঁদ বলল, 'হরু ঠাকুর, তবে কোথায় ছিল মন্দির?'

হরু ঠাকুর বলল, 'আমার মনে নেই। তবে এটা মনে আছে যে এখানে শ্মশান ছিল। মন্দির ভাঙার পর কালাজ্বরে গ্রামের কত কত লোক-বৌ-বাচ্চা মরে গেল, সকলকে এখানে এনে দাহ করা হত। আমার কানে এখনও কান্না বাজছে।'

কালাচাঁদ ভাবল এ আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেল। রাতবিরেতে এ এক নতুন রোগে ধরেছে এই বুড়োকে। হঠাৎ হরু ঠাকুর বিড়বিড় করে বলল, 'শামুক লেগে পা কেটে রক্ত আর বন্ধই হয় না। আমি বাবা পঞ্চাননের মন্দিরের সিঁড়িতে বসে লাল রুমালটা বের করে ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে পায়ে ব্যান্ডেজ করে বাঁধলাম, বাকিটা মন্দিরের সিঁড়ির নীচে ফেলে রেখে এলাম।' হরু ঠাকুর পায়ের রুমাল ছেঁড়া ব্যান্ডেজটা দেখাল।

আফজলের মুখ দেখে মনে হল যে সে ভাবছে যে আজ সে বেশি টেনে ফেলেছে আর তাই তার মাথায় কিছু ঢুকছে না। সে বলল, 'তাহলে রুমালের পিসটাই খোঁজা যাক।' কথাটা হরু ঠাকুরের মনঃপুত হল। আফজল প্রস্তাব দিল চারজন চারদিকে খুঁজুক—তাড়াতাড়ি হবে, সময় বেশি নেই হাতে। শ্মশান-টশান শুনে কালাচাঁদ সে প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ নাকচ করে বলল, সে আর বদন একসঙ্গে যাবে। কালাচাঁদ আর বদন একদলে, আর হরু ঠাকুর ও আফজল আরেক দলে, এ ভাবে সারা মাঠে গোরু খোঁজা করেও লাল রুমালের টুকরো পাওয়া গেল না। তখন আফজল বলল, 'নিশিজলায় যান নি তো?'

হরু ঠাকুর বলল, 'মনে পড়ছে না।'

অতএব নিশিজলা।

অন্ধকারে ব্যাঙের ডাকে নিশিজলা ভরে গেছে।

আফজল বিরক্ত হয়ে অশ্লীল গালাগাল করল, 'বৃষ্টির জল গায়ে পড়তেই শালাদের সেক্স জেগে উঠেছে।'

কালাচাঁদ মনে মনে হিসেব কষছে—পদ্মগোখরো, তেঁতুলে, খরিশ এরা নিশ্চয়ই শিকার খোঁজাখুঁজি শুরু করেছে। ভগবান এদের গায়ে যেন পা না পড়ে।'

BanglaBook.org

সারা নিশিজলা তন্নতন্ন করে খুঁজে রুমালের টুকরো না পেয়ে কালাচাঁদ ক্লান্ত বোধ করতে লাগল। পলাশডাঙার মাঠে চলাফেরা করা অনেক সোজা। নিশিজলা এবড়োখেবড়ো নীচু জমি—কোথাও কোথাও কাদায় পা ডুবে যাচ্ছে, কোথাও এঁটেল মাটিতে পা পিছলে পিছলে যাচ্ছে। একটা নিচু খাদ মতো দেখে হরু ঠাকুর বলল, 'মনে পড়েছে, এখানে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম।'

'উপরে?' কালাচাঁদ বিস্ময়ে বলল, 'এখানে জমি তো নীচে নেমে গেছে। ওখানে ওই গর্তে নেমেছিলে?'

হরু ঠাকুর বলল, 'তখন গর্ত ছিল না।'

কালাচাঁদ গর্তে টর্চ মারল, একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো লাল রুমালের একটা টুকরো দেখা গেল, বৃষ্টিতে ভিজে ন্যাতা হয়ে গেছে। হরু ঠাকুর বলল, 'ঠিক ওই জায়গাটা ঈশান কোণ।'

আফজল বলল, 'তাহলে লোকেশনটা পাকা হয়ে গেল। নারিয়েল ফেড়ে দিচ্ছি।' আফজল হাতের ঝুনো নারকেলটা দড়াম করে একটা পাথরে মারল—নারকেল খণ্ড ছিটকে গেল চারদিকে, ও নেশার চোটে নিজেই হাততালি দিয়ে বলল—ভিত-পুজোটা হয়ে গেল, এবার আমার লোকেরা মাটি কাটবে। আপনারা চিন্তা করবেন না, কাল যাব জমিদারবাবুর কাছে। সারা রাত কাজ হবে।

হরু ঠাকুর আর বদনকে নিয়ে জমিদারবাড়িতে ফিরে কালাচাঁদ দেখল দুশ্চিন্তা ও উত্তেজনায় সদানন্দ আরেকখানা জলভরা সন্দেশ সাবাড় করে দিয়েছেন। কালাচাঁদদের দেখে মনে হল তিনি স্বস্তি পেলেন। সদানন্দ বললেন, 'একা একা বসে কী করি, তাই হরু ঠাকুর তোমার কাব্যের ছোটোখাটো ভুলগুলোকে একটু এডিটিং করছিলাম। আমার তো মনে হয় না কালকের মধ্যে তোমরা ঐ কাব্য রেডি করতে পারবে। এখনো লেখাই শেষ হল না, তারপর ওগুলোকে তালপাতায় টোকা, শুকোনো—'

হরু ঠাকুর বলল, 'বাবা পঞ্চানন যদি চান তবে সব হবে। মন্দিরটা বাবা কেমন নিজে বানিয়ে নিচ্ছেন সেটা লক্ষ করেছেন?'

'মন্দির?' সদানন্দ বললেন।

'আমার আর গপ্পো করার সময় নেই, কালা তুই বল কর্তামশাইকে, আমি লিখতে ঢুকছি।' হরু ঠাকুর ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

BanglaBook.org

।। ত্রিশ ।।

মধ্যরাত পার হতে চলল, হরু ঠাকুরের ঘরের দরজা তখনও বন্ধ। ফাটা শ্বেতপাথরের টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল কালাচাঁদ, হঠাৎ তীব্র হুঙ্কারে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে দেখল কর্তামশাই দেওয়ালে পিতৃপুরুষদের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছেন, পাশে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে বদন।

'কী হল?' কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করল।

'নিজে এসে দ্যাখ, হারামজাদাগুলোকে আমি খুন করে ফেলব। ঠাকুর্দার মুখে বদমাশগুলো হেগে গেছে।'

কালাচাঁদ ছবির কাছে এল। পায়রার বৃষ্ঠায় ছবির মুখ একদম ঢেকে গেছে।

বদন বলল, 'পায়রা এতটা পায়খানা করতে পারে এটা আমার জানা ছিল না।'

কালাচাঁদ বলল, 'কাল সবকটা ঘুলঘুলি আমি সাফ করে দেব। ছি ছি।' মনে মনে বলল, 'আমার বাবাকে হাড়িকাঠে বলি দিতে গেছিলি।'

হরু ঠাকুর যখন ঘরের দরজা খুলল তখন মধ্যরাত অতিক্রান্ত।

'কালা, কড়া করে এক কাপ চা খাওয়া, ভাই—' হরু ঠাকুর বলল।

কালাচাঁদ তাড়াতাড়ি চা বানিয়ে হরু ঠাকুরের সামনে পাড়ার জলভরা সন্দেশের বাক্সটা রাখল। হরু ঠাকুর নিমেষের মধ্যে একটা জলভরা খেয়ে দ্বিতীয়টাতে থাবা মারল তখন সদানন্দের অসহায় করুণ দৃষ্টি কালাচাঁদের নজর এড়াল না।

'একটু ভাত বেড়ে দিই, খেয়ে নাও হরু ঠাকুর?'

'না না, তার সময় নেই—' হরু ঠাকুর সন্দেশে একটা কামড় বসিয়ে চায়ের কাপে চুমুক লাগাল। 'এবার পড়া শুরু করি, কর্তামশাই?'

সদানন্দের অনুমতি পেয়ে হরু ঠাকুর দুই হাত কপালে জোড় করে ঠেকিয়ে পড়া শুরু করল—

কালাজ্বর।

আজী বিহাণে শয়ানেঁ জাগে বলরাম।
হাতাইড়া টঙ্কী লৈআঁ শুরু কৈলেঁ কাম॥
হাথে আজী কিমনে নাহি মোটে জোর।
মারিআঁ মারিআঁ আজী না ভাঙ্গে পাথর॥
নিকুপেঁ বসিলান্ত রাম নিচল মনে।
পিয়াসত পাণী পিআ জীআউক খনে॥
চাহিলান্ত বাট পানে দীঠিত আন্ধার।
আগুন তাপে পোড়েক শরীর আন্তর॥

BanglaBook.org

নিশাসে দহন জালা দহিলা উদর।
বলরাম ভাবিল কিমনে নিবারিব জর॥
দুপহরত আন পাণী লৈআঁ ভানুমতী।
দেখিলা বলরামেঁ আচেতন মূরতি॥
আকুল হিয়াত কণ্যা আগুছিআঁ ঝাঁটে।
ওড়নী ভিজিআঁ ওহাড়ি জর ললাটে॥
শরীরে আগুন নাচএ আচরিজ জর।
বলরামে সারা অঙ্গ কাম্পে থর থর॥
দেখিআঁ এই খন মন্দ দেহগতি।
গেহ বাটে সত্বর ধাইলী ভানুমতী॥
শুনীআঁ বাটে কণ্যার আকুল কান্দন।
উটঠানে বাহিরিলা বাপ নন্দীধন॥
বুয়িল বাখান কণ্যা চিন্তিআঁ মনে।
আশোআশ দিলা বাপেঁ আভয় বচনে॥
পঞ্চানন পাণী কত ঝাঁটে লৈলেঁ সাথে।
বেজরাজ জড়িবুটি আদি লৈলেঁ হাথে॥
দুইহো ধাইআঁ আইলে বুদ্ধের দেউলে।
বেজরাজ নন্দীধন বলরামে দেখিলেঁ॥
নাভিমুলে হাথ থুইয়াঁ রাখিল শেকড়।
শ্বেত আখিঁ পান্ডু গণ্ড ইহ কালাজর॥
পঞ্চানন পাণী তারেঁ করায়িল পান।
জিআঁ উয়িল বলরাম জুড়াআঁ পরাণ॥
দুঈ দিনে ণাম্বে জর কম ভৈল বেথা।
কবিরাজ ভণে শুন পঞ্চানন কথা॥

হরু ঠাকুর থামল। কালাচাঁদ কেমন যেন কথাগুলো বুঝতে না পারলেও, মানেটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। কালাচাঁদ বলল, 'তারপর কী হল হরু ঠাকুর?'

হরু ঠাকুর এক চুমুক চা শেষ করে বলল, 'গ্রামে গ্রামে তখন কালাজ্বর ছড়িয়ে পড়েছে—

আদিবস আইলা খসাইআঁ ভাগ।
কৌন পাপ করমের দেবতার রাগ॥
গোঠ হৈতে গোঠে ছাড়ায়িল জর।

বেগবতী বান যথা বেগ খরতর॥
মরণ দংশিল জেন নাগ বিষহরি।
পোড়াআঁ পোএ গোঠে গোঠে কান্দতি তিরি॥
মরণ ঘুসসি জয় গোঠে হাটে মাঠে।
ফুটিআঁ হিদয় যাএ মাএ কান্দে বাটে॥
পাটাবুক নন্দীধন রোধে কালাজর।
পঞ্চানন দেউল আজী হৈল বেজঘর॥
পঞ্চানন ধুআঁ পাণী পীঅ শতবার।
কালাজর হৈতে জিআইল সংসার॥
দূর দূরান্ত সবে ডরায়িলী মরণ।
পঞ্চানন দেবেঁ সবে লৈল সরণ॥
রাজা প্রজা ধাআঁ ধাআঁ আসে বারে বারে।
লোটাআঁ পড়িলা সবে পঞ্চানন দ্বারে॥
ভকতি ছুয়িল আকাশ নেহালী পরমাণে।
পঞ্চানন কথা শুন কবিরাজ ভণে॥

হরু ঠাকুর থামল, 'মাঝে কয়েকটা লাইনে পয়ার কেটে গেছে, পনেরো বা ষোলো অক্ষর হয়ে গেছে, ওগুলো আমি ঠিক করে দেব—'

'না না, একদম না। ওগুলো ওরকমই থাক।' সদানন্দ বললেন। 'ওসময়ে চৌপাই থেকে সবে পয়ার জন্ম নিয়েছে, তখন পয়ার অত খাঁটি হত না, মাঝে মাঝে একটা দুটো অক্ষর বেশি-কম হত। একদম মাপে মাপে ৮ আর ৬ পয়ার হলে সন্দেহ হবে। তারপর কী হল, বলো।'

হরু ঠাকুর বলল, 'খবরটা চারদিকে রটে গেল। জালালুদ্দিনের কানে গেল যে মুসলমানরা হিন্দু দেবতার পানি খাচ্ছে। জালালুদ্দিন বলল মন্দির ভাঙতে হবে। জালালুদ্দিন প্রথমে খবর পাঠাল জমিদার জটামদনের কাছে—যাও গিয়ে মন্দির ধুলায় মিলিয়ে দাও। মন্দির ভাঙতে এসে জটামদন নন্দীধনের কন্যা ভানুমতীকে দেখল—

জালালের সেনাগণে ভাঙ্গিবেঁ পঞ্চাননে।
সঙ্গে আইলা দুঠ জটামদন॥
দগ্ধকপালী ভানুমতী কৈলেঁ আকুল মিনতী।
কাঢ়ে রাএ আরতিল কান্দন॥
বুয়িল জটামদন ভিখারী গেহে রতন।
কোঁয়লী উন্নত যৌবন॥

BanglaBook.org

মোহিল মন মোর চাঁদ জেন পুনমীর।
নেহালী আউলাইলোঁ মন॥
চিআয়িলী পিরিতী তুহ্মি ভাগ্যমতী।
শুন মোর সরস বচন॥
অন্তরে অনল বরষে নিবারিবে তোহ্মা পরসে।
রাজগেহে তোহ্মা হৈবেঁ থান॥
ভরছিলেঁ নন্দীধন চলি যাও এই খন।
এ মোর ঘোর আপমান॥
কহিলেক ধিক বাণী পঞ্চানন লীলা জানি।
নিবারি কালাজর লভিলেঁ যশ॥
পীতরি ভাগে পুনে কহিলাঙ গ্রহ গুণে।
দেউল ভাঙিলে তোহ্মার আদিবস॥
কোপ দেখি জটামদন এড়িলেহেঁ দেব থান।
কাঠদাপে ডরে চারি পাশ॥
পাটাবুক পন্ডিআঁ রাজ আমাণ লঙ্ঘিআঁ।
শিয়রে আণিলেঁ বিনাস॥

হরু ঠাকুর পৃষ্ঠা উল্টে বলল—'জটামদনের মনে দোটানা চলছে'—হরু ঠাকুর পড়ে চলল—

পাঠায়িল পহরী রাতিঞ আন্ধারে।
জটামদন ডাক দিলা রাজদুআরে॥
নন্দীধন দেখিল পসিআঁ নিধুবনে।
তীন বেশ্যা বৈশে বেঢ়িআঁ জটামদনে॥
ভাল মতে বেজএ জটা লৈলে ভিতরে।
বোলএ মতিমোষেঁ ভৈল ঘাঅ শরীরে॥
হৈল নগ্ন গাম্বায়িআ নিচোল ওহাড়ন।
দেহ জেন পাট তাহে সহস্রেক সুন॥
বেআকুল জটামদন বাদিআঁ সাপ।
আরতী বচন মুখত নাহি তাহে দাপ॥
দেহবিষ নিবারোঁ দিআঁ পঞ্চানন পাণী।
নেহালী নন্দীধন কহিলেঁ ধিক বাণী॥
বুয়িলেঁ আলপাউ তোহ্মা আয়িলা মরণ।
শরণ সাম্বাহ তুহ্মি ভজি নিরঞ্জন॥

banglabook.org

ইহ শুনী অসুর জেন রোষিল অতি।
বিহা করিবেহেঁ মোরেঁ তোহ্মা ভানুমতী॥
পাঠায়িআঁ লাঠিআল কালি বিহাণে।
দেখিহ আনিব তোহ্মার কণ্যা এই থানে॥
সিন্দুর আঁকিব তোহ্মার কণ্যার শিশে।
পাছেত মারিবোঁ তোহ্মায় সাপের বীষে॥
ভাঁগিব পঞ্চানন থান পূজার দেউলে।
রোমথাঁ এক জাণি আছে চড়ায়িবোঁ শূলে॥
ইহা শুনী গেহে ফিরে আসি নন্দীধন।
বিমরষ তেকারণে থীর নহে মন॥

সদানন্দ বললেন, 'তুমি কবি কবিরাজের ভণিতা ঢুকিয়েছ বটে কিন্তু কবিরাজকে কেউ চেনে না। তুমি যে রাজা গণেশের পুত্র জালালুদ্দিনের নাম ঢুকিয়ে দিয়েছ এতে প্রমাণ করা সুবিধে হবে যে, পঞ্চাননমঙ্গল ঘটনা চোদ্দশো সালের শুরুর সময়কার।'

হরু ঠাকুর বলল, 'আমি কেন ঢোকাতে যাব? যা সত্যি তাই তো লিখতে হবে।'

সদানন্দ হরু ঠাকুরের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে কথাটার মানে বোঝার চেষ্টা করল।

কালাচাঁদ বলল, 'হরু ঠাকুর, তারপর কী হল?'

হরু ঠাকুর চোখ বুজল এখনো যেন দেখতে পাচ্ছে—রাতের অন্ধকারে এক বারাঙ্গনা এসে দাঁড়াল নন্দীধনের সম্মুখে—গলায় সাতেশরী মুক্তমালা, স্বচ্ছ রেশমের আভরণের নীচে শ্বেত-কর্পূর চূর্ণ মাখা উদ্ভিন্ন বক্ষদ্বয়, স্তনদ্বয়ে শরীর শীতল রাখার জন্যে চন্দনের প্রলেপ আঁধারে সুগন্ধ ছড়াচ্ছে, কঞ্চুলী দৃঢ়বদ্ধ, কবজিতে পদ্মনাল—এই নিকষ কালো প্রবল বর্ষারাতেও যেন চন্দ্রালোকমাখা এক পরী। বারাঙ্গনা বলল—জটামদন আপনার ফুলের মতো কন্যাকে গ্রাস করবে, তারপর তাকে পঞ্চনগরীর রাজকর্মচারীকে উপঢৌকন হিসাবে দেবে। আমি তার মদ্যে নিদ্রাদ্রব্য মিশিয়ে তার প্রস্তুতিতে বিলম্ব ঘটিয়ে এসেছি।

নন্দীধন বললেন—জটামদন জানতে পারলে তোমার শিরচ্ছেদ করবে, তুমি এই ঝুঁকি কেন নিলে?

বারাঙ্গনা বলল—পঞ্চাননের জল খেয়ে আমার শিশুকন্যা কালাজ্বরের নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়েছে। আমি আপনার ওপর কৃতজ্ঞ। বিপ্রবর, আপনি সপরিবারে পলায়ন করুন। জমিদার গুপ্তচর মারফত জানতে পেরেছে যে রোমথা বৌদ্ধ-বিহারে লুকিয়ে আছে। জমিদার তাকেও শূলে চড়াবে।

BanglaBook.org

নন্দীধন বললেন—বাবা পঞ্চাননকে নিয়ে পলায়ন করা অসম্ভব। বাবার মূর্তির এত ওজন, এই মূর্তিসহ কোনো অশ্ব তেজ ধাবমান হতে পারবে না। আমরা সকলেই ধরা পড়ে যাব। আর বাবাকে এখানে একলা রেখে আমি পলায়ন করতে পারব না। কিন্তু আমার কন্যাকে অবশ্যই এখান থেকে সরিয়ে দেব। তোমাকে ধন্যবাদ। এখানে বেশিক্ষণ থাকলে তোমার জীবনহানি হবার সম্ভাবনা আছে। তুমি এখনি প্রস্থান কর, শুধু আমাকে শেষ একটা উপকার কর।

বারাঙ্গনা মাথা ঝুঁকিয়ে বলল—আদেশ করুন।

নন্দীধন বললেন সঙ্ঘারাম-বিহারে গিয়ে মঠাধ্যক্ষ জ্ঞানদত্তকে খবর দাও মঠের সকলে যেন শেষ প্রহরে মন্দিরের চাতালে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। আর বলরাম নামে এক ভিক্ষু আছে তাকে খবর দাও সে যেন আমার সঙ্গে এসে এক্ষুনি দেখা করে। এই খবর যেন কোনো মতেই অন্য কেউ না জানে।

'বাবা পঞ্চাননের শপথ,'—বারাঙ্গনা নন্দীধনকে প্রণাম করে ত্বরিতপদে প্রস্থান করলে, নন্দীধন গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। ভানুমতী দরজার অপর প্রান্তে দণ্ডায়মান। নন্দীধনকে ভানুমতী বলল যে, সে সব কথা শুনেছে, নন্দীধনকে এখানে রেখে সে একচুলও নড়বে না। নন্দীধন বললেন যে, পঞ্চমুণ্ড থেকে পালাবার দু'টো রাস্তা। প্রধান পথ বেগবতী, বেগবতী এই ঝড়বাদলে কালীনাগের মতো ফুঁসছে। এ সময় বেগবতীতে নাও ভাসালে বেগবতী আছাড় মেরে নাও ছিন্নভিন্ন করে দেবে। বাকি পথ দুর্গম। বন পার হয়ে স্থলপথে শাল্মলীগ্রাম। বনের পথে অশ্ব একপাও এগোবে না। বাবা পঞ্চাননের এত ভারী মূর্তি নিয়ে শ্লথগতিতে গমন করলে জটামদনের পাইক শীঘ্রই তাদের ধরে ফেলবে। এখন কী করণীয়? নন্দীধন বললেন যে, জটামদন ভানুমতীর ক্ষতি করবে, কিন্তু গ্রামের লোকের ভয়ে নন্দীধনের ক্ষতি করার হয়তো সাহস পাবে না। ভানুমতীর এই মুহূর্তে পঞ্চমুণ্ড ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু কীভাবে? কে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তার সঙ্গে যাবে?

কিছুক্ষণের মধ্যে বলরাম এসে উপস্থিত হল। বলরাম সব শুনে বলল যে, সে একবার মৃত্যুদণ্ড অতিক্রম করে এসেছে। সে আর মৃত্যুকে ভয় পায় না। সে ভানুমতীকে প্রাণ দিয়েও রক্ষা করবে।

নন্দীধন বললেন—অনূঢ়া কন্যাকে তিনি কী ভাবে অনিশ্চিতের পথে এগিয়ে দেবেন? ভবিষ্যৎ মানুষের মন ও বুদ্ধিকে কী ভাবে প্রভাবিত করে তাহা কেউ জানে না।

বলরাম বলল—বেশ, তবে ভানুমতীকে বিবাহ করার অনুমতি দিন।

ঘরের আবছা আঁধারে প্রদীপের উন্মুক্ত শিখায় একটা পোকা উড়ে এসে তাহার মরণ উড়ান শেষ করে পুড়ল। প্রদীপের আলো যেন এই সংকটময় পরিস্থিতিতেও

আনন্দে নেচে উঠল। মাটির দেওয়ালে সেই আনন্দের আলো চকিতে ছড়িয়ে জেগে উঠে আঁধারে হারিয়ে গেল। নন্দীধন ভানুমতীর দিকে তাকালেন। ভানুমতীর গায়ের রঙ যেন স্বর্ণচাঁপা ফুল। হাতের প্রতিটি লোমে সদ্যোপ্রাপ্ত যৌবনের সৌন্দর্য। চাঁদপানা মুখে যেন রাহু গ্রাসের অজানা আশঙ্কার ছায়া। পাতলা কোমরের ঊর্ধ্বে এবং নিম্নে ওজন বৃদ্ধি পেয়ে নারীত্ব আরোপণের কাজ শুরু করেছে প্রকৃতি। মাথা নীচে ঝুঁকিয়ে ভানুমতী স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে, তার শাড়ির আঁচলে তর্জনী থেকে অনামিকা পর্যন্ত তিনটি আঙুল পেঁচানো, সে যেন নন্দীধনের সম্মতির অপেক্ষা করছে। নন্দীধন বুঝলেন ভানুমতীর মন ও কায় বলরামকে বিবাহের জন্য প্রস্তুত। তিনি বললেন উত্তম, তবে শীঘ্র বিবাহের আয়োজন করা যাক।

'কী হল মামা, চোখ বন্ধ করে কী ভাবছ?' বদন জিজ্ঞাসা করল।

হরু ঠাকুরের সম্বিত ফিরে এলো। হরু ঠাকুর পড়তে লাগল।

ভানুমতীর বিহা॥

নিশি ভৈল গহন নিঝুম চৌদিশে চাহি।
উপাএ চিন্তিআঁ নন্দীধনর চখুত নিন্দ নাহি॥
জটামদন আয়িবে হের কালি প্রভাতে।
কলিআঁ লেপিবেক ভানুমতীর মাথাতে॥
মন্দিরে গো-মাঁস ছাড়ায়িবেঁ জটামদন।
পেলাইআঁ ভাঙ্গিবে মুরতী পঞ্চানন॥
একলা আন্তরে কান্দন্তি নন্দীধন।
পঞ্চাননে জাণায়িল কাকুতীবচন॥
নন্দীধন কহিলান্ত দেব করহ অবধান।
নন্দীধন সহিবেঁ না তোহ্মার আপমান॥
আয়িল গেহে নন্দীধন চিন্তনে গহন রাতে।
ভানুমতী বলরামে বুয়িলেঁ পাতেঁ পাঁতে॥
তীন পরাণী বধিবারেঁ চাহে জটামদন।
ভাঙিবে দেউল আর মূরতী পঞ্চানন॥
উদগমতী ভানুমতী বুয়িল নিছড়িআঁ।
আহ্মে সহ্মে পালাহা চলহ পন্ডিআঁ॥
আবিচল কণ্ঠত কহিলান্ত নন্দীধন।
কমনে যাইবোঁ কণ্যা তেজিআঁ পঞ্চানন॥
কহিলেঁ পন্ডিআঁ ইচ্ছা মোর ইহা।

BanglaBook.org

বলরাম মোর কণ্যা করহঁ তুম্মি বিহা ॥
ভানুমতীকে সঙ্গে লৈহ তুম্মি বলরাম।
চলি জাহা দোহেঁ মিলি জগন্নাথ ধাম ॥
দেখায়িবেঁ রাজায় মোর তাম্রপত্র খান।
রাজদরবারে তুম্মি পাইবেক থান ॥
বলরাম কহিল আদেশ তোহ্মা মাথে।
বিহা করিবেহেঁ দাস আজি ইহ রাতএ ॥
বর বহু নেত পাটোল পহ্নীল সত্বরে।
পাছত নন্দী আবগাহী দহএ আন্ধারে ॥
থাহা হৈতে কলস উঠায়িলা চার।
কাঁচ কনয়া আঙ্গদ সাতেশরী হার ॥
সজাইলেঁ কণ্যাএ কনক কঙ্কনে।
কণআঁ প্রতিমা জেন কনক বসনে ॥
কাপাসি আসনে বৈশে বর বলরামে।
উদগমতী আয়িলী পঞ্চানন ধামে ॥
চখুতে চমকী চমকী বরিষে আঝোর।
কেসে গন্ধফুল বহু কুন্দ নাগেশ্বর ॥
শিথে সিন্দুর দিল হাথে সঙ্খ বালা।
নেত আঞ্চল কণ্ঠে সাতেশরী মালা ॥
লাজ-ভঞেঁ মিলী মুখ ললাটে চন্দন।
কণ্যা বহু আভাগিনী ভাবএ নন্দীধন ॥
শীতল বাএ বহে সুগন্ধ রাতে।
কণ্যা সমর্পিলা নন্দী বলরাম হাথে ॥
নাহি দুন্দুহি মাদলা নাহি গায় গান।
নিকুপেঁ বিবাহত নাহি সমাজ সজন ॥
বর বহু করিলেঁ পঞ্চানন পাণী পান।
পঞ্চাননের সমুখে হৈল কণ্যাদান ॥
নন্দীধন কহিলেক আছে শেষ কাম।
পাথরত ঝাঁট ইহা লিখহ বলরাম ॥
পড়িআঁ আখর খানি কাম্পিল হিআঁ।
বলরাম লিখিল পাথরত কাটিআঁ ॥
ছান্দে অঙ্কে পক্ষী পঙ্খ বান্ধে নন্দীধন।

পঞ্চমুন্ডে পঙ্কে গুপ্ত কাব্য পঞ্চানন ॥
বলরাম বুইল পিতা দিলেঁ আনুমতি।
সামীর গেহে যাইবে তোহ্মা ভানুমতী ॥
বর-বহু দুহেঁ মিলি প্রণমিলা পাএ।
কান্দএ কুলআ ঘাটে কণ্যা চঢ়িলেঁ নাএ ॥
খেআইলেঁ নাঅ চন্ডবাত বাএ।
তলবলাএ নাঅ বরিষা সমএ ॥
চন্ডবাতে আকাস আখি বারিষা ঝরে।
ধারেঁ ঝরেঁ তাহে ঘনঘন বাজ পড়ে ॥
খরসোঁত ঢেউ ফুকরে বোলায়িল রাগ।
বেগবতী রোষিল যেন কালীয় নাগ ॥
বলরাম নেহালিআঁ দুরুযোগ শিরে।
ণাম্বিল নাঅ হৈতে বেগবতী তীরে ॥
জটামদনের রোষ মনত জাগে তরাস।
পাঠাআঁ সেনা তারে করিবেক গ্রাস ॥
পসিলা আনবাটে আন্ধার গহন বনে।
পঞ্চানন কথা সুনহ কবিরাজ ভণে ॥

হরু ঠাকুর থামল।

'তারপর কী হল? ওরা কি পালাতে পারল?' কালাচাঁদ বলল।

'আকাশে দুর্যোগ যেন ধরায় অভিশাপ ঝরাচ্ছে। বর্ষণে, হাওয়ার তাণ্ডবে নীচে বেগবতীতে ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডেকেছে। এই সময়ে বেগবতীতে নৌকা ভাসালে চোরা ঘূর্ণিতে মুহূর্তের মধ্যে যমের দুয়ার দেখিয়ে দেবে। তাছাড়া জালালুদ্দিনের আদেশ লঙ্ঘন করার মতো বুকের পাটা কোনো মাঝির নেই। তাই একমাত্র পথ হল বিপদসঙ্কুল জঙ্গল।'

'আর পুরোহিত নন্দীধনের কী হল?' কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করল।

আবার বাইরে একটা গাড়ি থামার আওয়াজ হল। বাইরে কয়েকটা গলার আওয়াজ। উত্তেজিত হয়ে কী যেন বলাবলি করছে।

'সব্বোনাশ।' হরু ঠাকুর টেবিলে ছড়িয়ে রাখা কাগজগুলো গুছোতে গুছোতে বলল—'ধাড়া আবার। সঙ্গে কিছু লোকের গলা পাচ্ছি। ওই আরবি খুনেগুলোকে সঙ্গে আনে নি তো? শিগগির চল বদন পিছনের দরজায়।'

কালাচাঁদ সদানন্দ ভটচাজের বাঁ পায়ের নীচে মোড়াটা রেখে সদানন্দের পা তুলে দিতেই সদানন্দ চোখ বন্ধ করে ফেললেন।

BanglaBook.org

কালাচাঁদ বলল, 'চোখ পরে বন্ধ করলেও চলবে। হরু ঠাকুর তোমরা তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গুটিয়ে ভাগ। 'পঞ্চাননমঙ্গল' এখানে ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে এটা ধাড়ার শেখের কানে গেলে শেখ আমাদের কিমা বানিয়ে বাঘকে খাওয়াবে।'

'সব্বোনাশ! পিছনের দরজায় কড়া নাড়ছে!' হরু ঠাকুরের আতঙ্কিত চোখ।

'আমি দেখছি,' কালাচাঁদ ফিসফিস করে বলল। 'হরু ঠাকুর তোমরা ভিতরে গিয়ে লুকোও।'

পিছনের দরজায় কেউ অধৈর্যভাবে কড়া নেড়েই চলেছে। কালাচাঁদ পিছনের উঠোন পার হয়ে দরজার কাছে এসে দেখল দরজা খোলা। আধো অন্ধকারে দুই ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে।

।। একত্রিশ ।।

'কে ওখানে?' কালাচাঁদ কড়া গলায় বলল।

'আমি আফজল,' আফজল সামনে এল।

কালাচাঁদের বুকের ধুকপুকানি শান্ত হল।

'মন্দিরের জন্য লেবার নিয়ে ফিরছিলাম। দেখলাম এতো রাতে জমিদার বাড়িতে আলো জ্বলছে। তারপর দেখলাম পিছনের দরজা খোলা—জমিদারবাবুর শরীর ভালো না বলেছিলেন, তাই—'

কালাচাঁদের খেয়াল হল বদনকে নিয়ে হরু ঠাকুরকে খুঁজতে সে এদিক দিয়ে বেরিয়েছিল, তারপর আর দরজা বন্ধ করা হয় নি। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, শরীরটা ঝামেলা করছে, কিন্তু মন্দিরের চিন্তায় ওনার ঘুম আসছে না, তাই আমরাও জেগে বসে আছি, ভিতরে এস।'

আফজলকে নিয়ে ভিতরে এসে কালাচাঁদ দেখল কর্তামশাই মোড়ায় পা তুলে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। কালাচাঁদ বলল, 'কর্তামশাই আফজল কথা দিয়েছে মন্দির খাড়া করে দেবে।'

সদানন্দ আশীর্বাদের ভঙ্গিতে ডান হাতটা একবার উপরে তুললেন। আফজল বলল, 'জী জমিদারবাবু, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে যান। একরাতে যদি পঞ্চাননবাবার এই মন্দির বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে, তবে একরাতেই এই মন্দির আবার এই জমিতে ফিরে এসে দাঁড়াবে। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি। এক মুসলমানের জন্য একদিন এই মন্দিরের বিনাশ হয়েছিল, আজ আরেক মুসলমান এই মন্দির দাঁড় করাবে।' আফজল

BanglaBook.org

সদানন্দ ভটচাজের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে সদানন্দ ভটচাজের হাঁটুতে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করল। সদানন্দ ভটচাজ আফজলের হাতের ওপর হাত রাখলেন। কালাচাঁদের মনে হল এই অজ পাঁচমুড়োতে শেষ প্রহরে লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লা আর ঈশ্বর হাতে হাত রাখলেন। কালাচাঁদের চোখের কোনা চিকচিক করে উঠল।

আফজল লোকজন নিয়ে চলে গেল। বাইরে জিপ স্টার্ট করার শব্দ হল। হরু ঠাকুর আবার তার খাতা খুলে বসল।

'কর্তামশাই পড়ি?' হরু ঠাকুর অনুমতি চাইল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ পড়।'

হরু ঠাকুর পড়তে লাগল—

নন্দীধন॥

মন্দিরত নন্দীধন আইলেঁ ধির ধির।
উতাপঠ মন তার বুক মেলে চীর॥
আসহন বেথা সহনে নারে নন্দীধন।
মুরুছা গেলা নন্দী হৈল আচেতন॥
সরূপ দেখাইলেঁ আপুণী পঞ্চানন সামী।
নন্দীধন নন্দী তুহ্মি দেব শিব আহ্মি॥
তোহ্মা কণ্যা লক্ষ্মীদেবী পতি নারায়ণ।
আনিবেঁ সুখ ধরায় ধাম হৈবেঁ পালন॥
তোহ্মা কাম সমাপন—প্রভু আর দাসে।
তোহ্মে আহ্মে এই খনে ফিরিব কৈলাসে॥
নন্দীধনে তবেঁ সকলি হৈল স্মরণ।
লুটাইআঁ ধরিল প্রভু শিবের চরণ॥
সংপুটে নন্দীধন মন্তর পড়ি ধিরে।
পঞ্চানন মূরতী উঠাইলেঁ শিরে॥
পঞ্চাননে সরোঅরে দিলেঁ বিসর্জন।
সরোঅর থাহে গুহাত করিলেঁ গোপন॥
একেঁ একেঁ শিলাপাট করাইলেঁ নিমজ্জন।
শিলাখন্ডে নিজ বক্ষ করিলেঁ বন্ধন॥

হরু ঠাকুর থামল। রাতে দেওয়াল ঘড়িটা ফাটা কাঁসরের মতো ঢং ঢং করে দু'বার বেজে সময় জানিয়ে দিল।

কালাচাঁদ বলল, 'তারপর নন্দীধন আত্মহত্যা করল?'

BanglaBook.org

হরু ঠাকুর বলল, 'সেটা আমি দেখিনি, তবে কঙ্কাল যখন পাওয়া গেছে তখন ধরেই নেওয়া যায়—'

'আর ভানুমতী? তার কী হল?' বদন বলল।

হরু ঠাকুর আবার পড়া শুরু করল—

বাবা পঞ্চাননের দয়া ॥

পসিলেঁ গাহন আরণে রাতী আন্ধারে।
শিয়রে বারিষা পাণী আঝর ঝরে॥
ধায়িআঁ তড়পথে দুহেঁ পিচ্ছিল বাটে।
আগুত চলে বলরাম সচকিত কাঁটে॥
ভিজিআঁ আলক আর বিহার সাজ।
চমকী চমকী উঠে পড়িলাহা বাজ॥
থর থর কাম্পে পা বিঁধে কাঙ্কড়ী।
ভানুমতী চলে ধাআঁ সামী হাথ ধরি॥
শিয়রে তরাস বসী জটামদন নাম।
ভানুমতী ভাবে আজী বুঝি বিধি বাম॥
বারিষী ধুয়িলাঁ শিশের সিন্দুর তার।
দুবল চরণ নাহি সহে দেহভার॥
বলরাম হারাঞেছে বাট-থান গতী।
কাম্পিতে কাম্পিতে কান্দে ভীত ভানুমতী॥
আচম্বিত আঁধারত দেখিল মানুষ হাজার।
আগপাছ ঘিরি পহরী জটামদন রাজার॥
ডরায়িলী দেখিলা নাহি বাট তথা।
বলরাম করএ জুদ্ধ অভিমন্যু যথা॥
দুরুবার সেনা মাথে হাণিল আঘাত।
পাড়িলে বলরামে জেন ছিন্ড পাত॥
পড়িলাহা ধরণীতে বলরাম বীর।
কান্দে ভানুমতী তার বুক মেলে চীর॥
পাপিআ জটামদন দাণ্ডায়িআঁ কাম্পে রাগে।
গরল বচন নাচএ তার জীহের আগে॥
ভানুমতীর আঁধারত আকুল কান্দন।
রাখোঁ মোর লাজ তুহ্মি বাবা পঞ্চানন॥
দুঠ বুয়িল মোকে কৈলি অপমান।

BanglaBook.org

রাখুক দেখি পঞ্চানন রোমথার প্রাণ॥
আন্ধার বাদলে ঘুরে আকুল কাকুতী।
পঞ্চানন নাম শুধু জপে ভানুমতী॥
আচম্বিত আঁধার ভেদি দুলিল সংসার।
ধায়িআঁ আইলা এক বিশাল পাহাড়॥
মত্ত হাথী আইলাহাঁ জেন মহাকাল।
দান্ডায়িলা বলরামে করিলা আড়াল॥
সুন্ড তুলি কাঢ়ে রাএ হাথী ভীষণ।
কর্দ্দম মাখিআঁ গাএ ঘোর দরসন॥
সুন্ডে চাপি কথো সেনা পেলাইল দূরে।
পাঠাইলে শতেকেরে হাথী জম ঘরে॥
পৈসী সেনা মাঝত মায়িলেঁ ছারখার।
হাথী খঙ্গ বেগবতী খরতর ধার॥
পালাএ সাথী সহ দূঠ জটামদন।
কর্দ্দম রক্ত পানি সিনিয়া বদন॥
খানেকেঁ চিআয়িঞাঁ উইল বলরাম।
কান্দে ভানুমতী মুখে পঞ্চানন নাম॥
দান্ডায়িআঁ কাড়ে রাএ হাথী জেন বাজ।
পঞ্চানন কথা শুন ভণে কবিরাজ॥

হরু ঠাকুর পড়া বন্ধ করে সকলের মুখের দিকে তাকাল।

'তারপর কী হল?' সদানন্দ জিজ্ঞাসা করল।

'রাখে পঞ্চানন মারে কে—' হরু ঠাকুর বলল। 'পাগলা হাতির তাণ্ডবের সামনে জটামদনের পাইক বরকন্দাজ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল যেন ঘটোৎকচের সামনে কৌরবসেনা। অন্ধকারে কে মরল আর কে প্রাণ বাঁচিয়ে আহত হয়ে পালাল তা ঠাহর করা মুস্কিল। ক্ষণকালের মধ্যে বনের মধ্যে দাপাদাপি শান্ত হলে, হাতি সংজ্ঞাহীন বলরামের পাশে এসে দাঁড়িয়ে শুঁড় দিয়ে বলরামের সারা গায়ে স্পর্শ করল, যেন সে তার বাচ্চাকে আদর করছে। তারপর সে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ভানুমতী কাঁদতে কাঁদতে বলরামের দেহের ওপর ঝুঁকে পাশের কাদাজল আঁজলা ভরে বলরামের মুখে-চোখে ছিটোতে ছিটোতে বাবা পঞ্চাননকে ব্যাকুল ভাবে ডাকতে লাগল। বলরামের সংজ্ঞা ফিরে এল, সে উঠে বসে অন্ধকারে চারদিকে তাকিয়ে কী খুঁজতে লাগল। ভানুমতী জিজ্ঞাসা করল সে কী খুঁজছে। বলরাম বলল যে বাবা পঞ্চানন—দেখলাম তিনি অঘোরা রূপে এলেন ধ্বংস করতে, তারপর রুদ্ররূপে

BanglaBook.org

তিনি অরণ্যে তাণ্ডব লাগিয়ে দিলেন, যারা আমাকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিল বাবা তাদের ধ্বংস করতে লাগলেন। সংহার শেষ হতে তিনি লাবণ্যময় বামদেবরূপে আমার সারা শরীরে ক্ষতে আরোগ্যের জন্য তার করুণা হস্ত বুলিয়ে দিলেন, 'আমি দেখলাম দ্যাবা পৃথিবীতে বাবার ঈশানরূপ ছড়িয়ে পড়ে তাঁর সৃষ্টিকে অভয় দিয়ে তারপর বাবা পঞ্চানন তার তৎপুরুষরূপে তিনি আবার ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। ভানুমতীর চোখে বাইরের প্রকৃতির বর্ষণধারা। শুঁড় উঁচিয়ে অন্ধকারে গজরাজ অপেক্ষা করছিল বলরামের। এবার সে বৃংহণে অরণ্য কাঁপিয়ে আঁধার রাতে পথ দেখিয়ে চলতে লাগল। আর পিছে পিছে চলতে লাগল বলরাম আর ভানুমতী আর মুখে তাদের বাবা পঞ্চাননের নাম। তারপর এক সময় আকাশের বাদল মেঘের খাজানা শেষ হল, চন্দ্রালোক মহীরুহের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে বনপথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল, পথচলা কিছুটা সহজ হল। তারপর বনের আবছা আলো-আঁধার একসময় আঁধারমুক্ত হল, আকাশে কে যেন অগোচরে হালকা নীল রঙের চাদর মেলে দিল, ছাতিম গাছের ফাঁকে দিনের প্রথম কাকলি ধ্বনিত হল। বনপ্রান্তে এসে বলরাম ভানুমতীর শরীরের অবশিষ্ট গয়না খুলে গেঁজেতে ঢুকিয়ে নিজ শরীরে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধল। এবার শেষ পরিচ্ছদ—' হরু ঠাকুর বলল। 'পড়ছি।

শূর উচাইয়া রাতে ধাএ গজমোতি।
খঙ্গে কাঢ়ে রাএ উমত বেগবতী॥
বলরাম ভানুমতী সহ দেব সাথে।
বোলকলা ভাগএ এহি চাঁদহীন রাতে॥
প্রভাত আদিত সঙ্গে আয়াসিলী দেহে।
আইলা আনপারে এক সাধুর গেহে॥
মন হৈতে বাহিরিলা মরনের তরাস।
সাধুজনা সঙ্গে দিলেঁ শুখা বাস॥
পসিলা নগরে দুহেঁ লৈআঁ কলস ভার।
ওহাড়িআঁ রোনথা আখর কপালে তাহার॥
কলসীত নাহি দুধ দধি পসার।
কনক সুবগ্ন ভরে ধনকলস চার॥
তেঁহু ধনে হৈল গাঁএ রাজা বলরাম।
ধিরে ধিরে দেশে তাঁর বাঢ়ি গেল নাম॥
ভানুমতী লক্ষ্মী রাণী রাজা নারায়ণ।
পঞ্চানন কথা এবেঁ ভৈল সমাপন॥
পঞ্চাননমঙ্গল যা কবিরাজ ভণে।

BanglaBook.org

পঞ্চানন নামে দৈবে শতেক সুখ মনে॥
বাড়িবে মান-কুল লভিবে সগর্গধাম।
যোড় হাথে বোলহ সঙ্গে পঞ্চানন নাম॥

হরু ঠাকুর কপালে জোড় হাত করে প্রণাম করল। দেখাদেখি বদন, কালাচাঁদ আর সদানন্দ কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করল। এ মুহূর্ত ক্ষণজন্মা।

হরু ঠাকুর বলল, 'গোটা কাব্যটাকে আজ রাতে লিখে ফেলব পুরোনো তালপাতায়। তারপর দ্যাখা দেখি কালা তোর মার্কেটিং।'

সদানন্দ বললেন, 'এই পুঁথির একটা বিশ্বাসযোগ্য মালিক চাই।'

'ভাতুড়িয়ার রেসুড়ে বংশধর—' কালাচাঁদ বলল।

'কিন্তু তাকে পাবো কোথায়?' বদন বলল।

কালাচাঁদ ভুরু কুঁচকে বদনকে দেখতে লাগল।

বদন অবাক হয়ে বলল, 'আমার দিকে তাকিয়ে কী দেখছ?'

কালাচাঁদের মুখে মৃদু হাসি। হরু ঠাকুর বলল, 'আমি জানি কালা কী দেখছে। কালা তার ভাতুড়িয়ার বখাটে বংশধর পেয়ে গেছে। কি রে বদন, বোলেবি না তো?'

'আমি!' বদন আঁতকে উঠল। 'ইমপসিবল, তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

'তুমি না হলে ওদের অত অঙ্ক কে বোঝাবে বাপু? জ্যামিতি, আর্যভট্ট, স্থানাৎ-স্থানম্। শুধু আমাদের বোঝালে তো আর চলবে না—' হরু ঠাকুর বলল।

'আমি মিথ্যে কথা বলতে পারব না। তাছাড়া ধাড়া টাইপের ফ্রড দেখলেই আমার মাথা গরম হয়ে যায়, হাত-ফাত চালিয়ে দেব, তোমরা পড়বে বিপদে।'

'বদন, তুই না থাকলে আমরা আরও বিপদে পড়ব। বোঝার চেষ্টা কর, এই পুঁথির আসল ব্যাপার হল অঙ্ক।'

'হার্টের রোগীকে শাঁখ বাজাতে দিও না, আমার দ্বারা হবে না,' বদন মরিয়া হয়ে বলল—'ধরা পড়লে জেল হয়ে যাবে। আমার কম্পিউটারের বিজনেস—'

'কার বাপের সাধ্যি আছে তোমায় ধরায়—' কালাচাঁদ বলল। 'ধাড়া ভুলেও ওই কাজটি করবে না। ওর নিজের নামেই পুলিশের খাতায় অনেক গপ্পো লেখা আছে। আর আমি তোমার সঙ্গে থাকব। ভয় পাও কেন? আমিই সব মিথ্যে কথাগুলো বলব। তুমি খালি মুখে এমন একটা ভাব দেখাবে যেন তোমার পুঁথিটা বেচার একটুও ইচ্ছা নেই। সবসময় একটা রাজসিক অবহেলা যেন তোমার মুখে লেগে থাকে। তারপর দেখ পুঁথি বেচি কী ভাবে। তবে তোমার চেহারাটা একটু পাল্টাতে হবে।'

হরু ঠাকুর বলল, 'আমি তাড়াতাড়ি লিখতে বসে যাই। অনেক পাতা লিখতে হবে।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, এত তাড়াহুড়ো কোরো না,' সদানন্দ বললেন। 'চিদে হারামজাদাটার জন্যে কয়েকটা ফাঁদ পেতে রাখতে হবে। কয়েকটা লাইন যোগ করো তো হরু ঠাকুর, যেখানে যেখানে বলি।' সদানন্দ পুঁথির মধ্যে মধ্যে লাইন ঢোকাতে লাগল আর হরু ঠাকুর সেটা লিখতে লাগল। তারপর এক জায়গায় এসে সদানন্দ বললেন, 'বাঙালিরা যে কামান চালানোয় দারুণ পারদর্শী ছিল তা কি তুমি জানো চন্দ্রবদন?'

বদন বলল, 'না।'

।। বত্রিশ ।।

বাকি রাতটা যেন দুরন্ত বাছুরের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে দিগন্তে মুছে গেল। হরু ঠাকুর পাতার পর পাতা সন্তর্পণে পেন্সিল দিয়ে তালপাতার ওপর লিখে গেল, সদানন্দ জেগে বসে একটা একটা করে পাতা দেখতে লাগল। মাঝে মধ্যে সদানন্দ 'এটা হয় নি—খ এর মাথাটা এগিয়ে থাকবে' গোছের মন্তব্য করতে লাগল আর হরু ঠাকুর সেটা আবার ঠিক করে লিখতে লাগল। তারপর হরু ঠাকুর তালপাতার মাঝামাঝি একটা উলের কাঁটা ঢুকিয়ে দিল, প্রতিটি তালপাতায় একটা গর্ত হয়ে গেল। হরু ঠাকুর একটা মরচে ধরা লোহার তার ঢুকিয়ে সেগুলো বাঁধল। এভাবেই নাকি প্রাচীনকালে বই বাঁধাই হত। লেখা হয়ে গেলে হরু ঠাকুর একটা মোমবাতি জ্বেলে পুঁথির পাতাগুলো আগুনের ওপর এক এক করে ধরল। কালির কাঁচা ভাবটা কেটে গেল আর পুঁথিটা পোড়া পোড়া রঙে একদম পুরোনো লাগল। তারপর দুটো ঘুণ ধরা ছোটো কাঠের মধ্যে তালপাতার পুঁথি রেখে, তার দিয়ে বেঁধে একটা পুরোনো লাল শালু দিয়ে মুড়িয়ে কালাচাঁদকে বলল, 'দেখি চিদানন্দকে ধোঁকা দিতে পারি কিনা।'

বদন বলল, 'খুব একটা মোটা পুঁথি হল না।'

সদানন্দ বললেন, 'এ প্রশ্নটার জন্য তৈরি থেকো, চিদে কিন্তু এ প্রশ্ন করবে।'

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে তিনজনে পটাপট তৈরি হয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। নিশিজলায় এসে কালাচাঁদের চোখ ট্যারা—সেখানে যেন দক্ষযজ্ঞ চলছে। একদল মজুর মাটি কোপাচ্ছে, আরেকদল আলপথে পলাশডাঙার মাঠ থেকে ভারী ভারী পাথরগুলো মাথায় করে করে আনছে। একদিকে কাঠের বিম, সুরকি ইত্যাদি ফেলা হয়েছে। রাস্তার ধারে একটা টেন্ট খাটানো হয়েছে, সেখানে একটা খাটিয়ায় বসে নিমডাল চিবোচ্ছিল আফজল। কালাচাঁদদের দেখে উঠে দাঁড়াল,

BanglaBook.org

'তিন শিফটে কাজ না হলে এত কম সময়ে মন্দির বানানো সম্ভব না। পঞ্চানন বাবার নামে এক ডাকে পাঁচমুড়োর সবাই বেরিয়ে এসেছে।'

'কাল এই মাঠে একটা মেলা লাগাবার ব্যবস্থা করতে পার?' কালাচাঁদ বলল।

'আলবাৎ পারি,' আফজল বলল। 'বাবা পঞ্চাননের মেলা। বাবার নামে নিশ্চয়ই দূর দূর থেকে লোকজন আসতে থাকবে, এখানে বাঁশের মাচা লাগিয়ে ছোটো ছোটো দোকান ঘর করে দেব। গাঁয়ের লোকেরা সিঁদুর, আলতা, বাবার ফটো, প্রসাদ, ফুল এসব বেচবে। পাঁচমুড়োর লোকেরা দু-পয়সা কামাতে পারবে। এ গাঁয়ের চেহারা পালটে দেব। তখন শালারা আঙুল কামড়ে ভাববে আমাকে ইলেকশনের টিকিট না দিয়ে কী ভুলটাই না করেছে।'

কালাচাঁদের হাতে সময় নেই, ফার্স্ট ট্রেনটা ধরতে হবে। আফজলকে বলল, 'আমরা একটু শহরে যাচ্ছি। ফিরতে ফিরতে রাত হবে, আমরা যখন ফিরব তখন আপনাকে কর্তামশাইয়ের কাছে নিয়ে একসঙ্গেই ওনার সাথে দেখা করব। মন্দিরটা যেন একদম পুরোনো মন্দির বলে মনে হয়। ভিতরে শুধু প্রদীপ জ্বলবে, ইলেকট্রিকের লাইন যেন ধারেকাছে না থাকে।'

আফজল বলল 'জী।'

'পেমেন্টটাও তখন করে দেব,' কালাচাঁদ বলল।

'লজ্জা দেবেন না,' আফজল দু'কান মুলল। 'জমিদারবাবু মাথায় হাত রাখলে আমার পঞ্চায়েতের ইলেকশনের ভোটে জেতা কোন্ শালা আটকায়। বাবা পঞ্চাননের মন্দির করছি, এর মধ্যে পয়সা-টয়সা আনবেন না। এই নিন আপনার টাকাটা। আসলে আপনাদের তো চিনি না, তাই একটু সিকিউরিটির জন্য টাকাটা নিয়েছিলাম।' আফজল কালাচাঁদের টাকার বান্ডিলটা কালাচাঁদের হাতে গুঁজে দিল। 'কোনো চিন্তা করবেন না, আপনারা শহরের কাজ সেরে ফিরে আসুন, মন্দির হয়ে যাবে, এ আফজলের গ্যারান্টি। শুধু জমিদার বাবুকে বলবেন, কাল উদ্বোধনের মঞ্চে যেন আমাকে একটু লেকচার দিতে দেন। হিন্দু ভোটটা টানতে পারলে কোনো হরিদাস পাল নেই আমাকে আটকায়।'

কালাচাঁদ ইতস্তত করে টাকাটা পকেটে গুঁজল। টাকাটা তার দরকার, পঞ্চাননের মূর্তি একটা জোগাড় করতে হবে। তখন ধাড়ার বিশ হাজার টাকাটা কাজে লাগবে। বদন এর মধ্যে মাঠে নেমে গেছে, সে একটা মজুরকে আলাদা করে ডেকে কথা বলছে। কালাচাঁদ বুড়োটাকে চিনল, চয়নবিলের পাশে এই বুড়োটা সেদিন পায়ের হাজা চুলকাচ্ছিল। দেরি হয়ে যাচ্ছে, হরু ঠাকুর চেঁচিয়ে বদনকে ডাকল, বদনও চেঁচিয়ে বলল তোমরা এগোও স্টেশনের দিকে, আমি তোমাদের ধরে নেব।'

হরু ঠাকুর বলল, 'মেলা-টেলার ব্যবস্থা আবার কেন রে কালা?'

BanglaBook.org

কালাচাঁদ বলল, 'ভিড় থাকলে ওই শেখ মন্দিরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার সাহস করবে না। আর লোকজন বেশি থাকলে ব্যাপারটা বেশ বিশ্বাসযোগ্য হবে।'

শিয়ালদা স্টেশনে নেমে হরু ঠাকুর বলল—'কালা, তুই বাড়িতে থাকিস। দু'টো নাগাদ বদন ট্যাক্সি নিয়ে যাবে তোর ওখানে, তোকে তুলে নেবে, দু'জনে আমার পুঁথি নিয়ে যাবি ধাড়ার হোটেলে।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?' কালাচাঁদ বলল। 'আমার বাড়ির ধারেকাছে তোমরা কেউ যাবে না,' কালাচাঁদ সাবধান করে দিল। 'ওই আরবের বদমাশগুলোকে কোনো বিশ্বাস নেই। আমি যাব বদনের ওখানে, বেশি দেরি হবে না, বারোটার মধ্যে পৌঁছে যাব।'

কালাচাঁদ সোজা রওনা দিল কুমোরটুলিতে। এই সাতসকালে কুমোরটুলিতে কোনো দোকান খুলবে না, কালাচাঁদের চেনাশোনা সিধু পুরুত কুমোরটুলিতে বস্তিতে থাকে। সিধু পুরুত পেশায় পকেটমার, দেহাতি কথায় গাঁটকাটা। তার চোদ্দ পুরুষের কেউ পুরুত ছিল না, কী ভাবে যে তার পদবি পুরুত হল কালাচাঁদ জানে না। সিধু পুরুত কালাচাঁদের গুরুস্থানীয়। জেলে আলাপ, কালাচাঁদের চৌর্যকালায় যেসব ফাইন টাচের অভাব ছিল সিধু পুরুত কালাচাঁদকে শিখিয়ে দিয়েছিল। কালাচাঁদের মুখে সমস্ত কাহিনি শুনে সিধু পুরুত বলল—'পঞ্চাননের মূর্তি রেগুলার অর্ডারের মধ্যে পড়ে না। নচেৎ কারুর অর্ডার দেরি করিয়ে মূর্তি তোকে দিয়ে দিতাম, আর কষ্টিপাথরের পঞ্চানন মূর্তি একদিনে স্বয়ং বিশ্বকর্মাও বানাতে পারবে না।'

'তবে উপায়?' কালাচাঁদ হতাশ হয়ে বলল। 'আরবের শেখ মন্দির দেখতে আসছে কাল, মূর্তি ছাড়া মন্দির?'

'উপায় একটা আছে। তবে একটু রিস্ক আছে—' সিধু পুরুত বলল। 'তোর হাতেও তো সময় বেশি নেই। নারকেলডাঙায় কাদাপাড়ায় কয়েকটা অনেক পুরোনো দিনের শিবের মন্দির আছে যেগুলো ভগ্নদশায়, পুজোটুজো তো হয়ই না, বরং সাপখোপের বাসা। ওর মধ্যে একটা মন্দিরে পঞ্চানন মূর্তি দেখেছিলাম। ওই মূর্তিটা তুলে এনে এখানে কারিগরদের কাছে ফেলতে হবে, এরা পালিশ টালিশ করে সন্ধ্যাবেলার মধ্যে তোকে দিয়ে দেবে। কিছু টাকা সঙ্গে আছে?'

'বিশ হাজার—' কালাচাঁদ বলল।

'চল তাহলে—' সিধু পুরুত উঠে দাঁড়াল।

সিধু পুরুত কালাচাঁদকে নিয়ে গেল এক কারিগরের কাছে। কারিগর ভালো ভাবে সব শুনে বলল—আপনি ভাববেন না, মূর্তিটা তাড়াতাড়ি আনুন আমার কাছে। আমার মাথায় একটা এমন প্ল্যান আছে যে মন খুশি হয়ে যাবে।'

'কী প্ল্যান?'

'ওসব ভাববেন না, শুধু ডেলিভারি নিতে এসে দেখবেন।'

তারপর সিধু পুরুত কালাচাঁদকে নিয়ে একটা এঁদো গলির ভিতর থেকে একটা লোককে ডেকে তার ম্যাটাডোরটা ভাড়া করল চার ঘণ্টার জন্য আর দু'টো লেবার জোগাড় করে বলল—চল নারকেলডাঙা।

কাদাপাড়ায় জোড়াশিববাগানের কাছে এসে একটা ভগ্নপ্রায় মন্দির দেখিয়ে কালাচাঁদকে বলল—যা কালা, এটার তালাটা খোল। মন্দিরটা আগাছায় ভরা, ইটের দেওয়াল ভেঙে বটগাছ উঠে গেছে। তালা খোলা কালাচাঁদের কাছে কিছু আহামরি ব্যাপার না। আগাছা, কাঁটা-ঝোপ পেরিয়ে মন্দিরের চাতালে এসে কালাচাঁদ মরচে ধরা তালা খুলে দরজাটা খুলল। মাকড়শার ঘন জালের ভিতর দিয়ে কালাচাঁদ বাবা পঞ্চাননকে দেখল। প্রায় তিন ফুট লম্বা বাবা পঞ্চাননের মূর্তি—বাবার গায়ে ধুলোর আস্তরণ দেখে বোঝাই যায় বেশ কয়েক বছর পুজো হয় না, কিন্তু মূর্তিটা কষ্টিপাথরের। কালাচাঁদ হাত জোড় করে বলল—বাবা অপরাধ নিও না। পাঁচমুড়োয় চল, ওখানে তোমার পুজো রোজ হবে।

সিধু পুরুত লেবার নিয়ে মাকড়শার জাল-টাল সরিয়ে বলল, 'নীচের মূর্তিটা বেশ বড়ো আর ভারী রে কালা, তাকের ওপর পাশে আরেকটা ছোটো প্রায় ফুট দেড়েক লম্বা পঞ্চানন মূর্তি দেখা যাচ্ছে, ওটাও নিবি তো বল।'

কালাচাঁদ বলল, 'না না, একটা মূর্তিই ঠিক আছে।'

সিধু পুরুত ইঙ্গিত করতে লেবাররা মূর্তির চারপাশে পাথরের মেঝে ভেঙে মূর্তি বের করতে লাগল। ভাঙাভাঙির আওয়াজে কয়েকটা কৌতূহলী মুখ দেখা গেল। একজন দাদা গোছের লোক পান চিবোতে চিবোতে এসে প্রশ্ন করল ব্যাপারটা কী? সিধু পুরুত বলল—বাবার মূর্তি কুমোরটুলি যাচ্ছে, পালিশ টালিশ করে আবার আনা হবে। একজন বৃদ্ধ বলল—যাক শরিকদের মোকদ্দমা মিটল অ্যাদ্দিনে তাহলে।

কালাচাঁদের ধারণা ছিল না যে বাবা পঞ্চাননের মূর্তিটা এত ভারী। সিধু পুরুত নিজে কালাচাঁদের সঙ্গে হাত লাগাল মজুরদের সাহায্য করতে, দু'জন পাড়ার লোকও জয় বাবা পঞ্চানন বলে হাত লাগাল মূর্তি ম্যাটাডোরে তুলতে। কিছুক্ষণের মধ্যে ম্যাটাডোর কুমোরটুলির পথে।

কারিগরের কাছে গিয়ে সিধু পুরুত ঢাকঢাক গুড়গুড় না করে সোজাসুজিই বলল—চুরির মাল, একটু গোপনে কাজ করতে হবে। পুলিশ খোঁজ করতে আসতে পারে, তাড়াতাড়ি এটাকে ফিনিশ করে হ্যান্ডওভার করে দেবেন।'

কারিগর বলল—চিন্তা করবেন না, পালিশ-টালিশ করে এমন বানিয়ে দেব যে

বাবা নিজেকে আয়নায় দেখলে চিনতে পারবে না। তাছাড়া বলেছি আমার একটা প্ল্যান আছে, সেটা ডেলিভারির সময় দেখতে পাবেন।'

সিধু পুরুত বলল—কত লাগবে?

'বিশ হাজার টাকা,' কারিগর বলল। 'দশ হাজার অ্যাডভানস। সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে সাতটার সময় বাকি টাকা নিয়ে আসবেন।'

সিধু পুরুত কারিগরকে একটা বান্ডিল দিল।

'এই ম্যাটাডোরটাই ঠাকুর নিয়ে তোকে রাতে পাঁচমুড়োতে নামিয়ে আসবে। আমাকে দুর্গাপুর যেতে হবে, বিকালে থাকতে পারব না,' সিধু পুরুত বলল।

'সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে সাতটার সময় আসবেন—' কারিগর বলল।

গুরু চ্যালা পথে নামল। কালাচাঁদ ঘড়ি দেখল, সময় যেন চিতাবাঘের তাড়া খাওয়া হরিণ। সকাল থেকে পেটে দানাপানি পড়েনি। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে—বদন আর হরু ঠাকুর অপেক্ষা করে করে বিরক্ত হয়ে নিশ্চয়ই গালমন্দ করছে। কিন্তু আগে একবার পাড়ায় যাওয়া খুবই দরকার। কালাচাঁদ একটা ট্যাক্সি ধরল।

।। তেত্রিশ ।।

পাড়ার লন্ড্রির দোকানে ঢুঁ মারল কালাচাঁদ—'একটা নতুন মাল একবেলার জন্য হবে?'

'তুমি বড্ড ঘামো, গতবার কাস্টমার জামায় ঘামের গন্ধ পেয়েছিল,' দোকানের ছেলেটা বিরক্ত স্বরে বলল।

কালাচাঁদ একটা একশো টাকার নোট কাউন্টারে ফেলল।

'মালিক জানতে পারলে লাথি মেরে বের করে দেবে।' ছেলেটা তাড়াতাড়ি টাকাটা পকেটে পুরে একটা ঝকঝকে সার্ট-প্যান্ট কাচের আলমারি থেকে বের করে ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে কালাচাঁদকে দিল।

কালাচাঁদ ভিতরে ঢুকে ফটাফট সার্ট-প্যান্ট বদলে বলল, 'কেমন লাগছে?'

'তাড়াতাড়ি কেটে পড়ো। কাল সকাল সকাল ফেরত চাই।'

কালাচাঁদ বেরিয়ে আসছিল। দোকানের ছেলেটা পিছন থেকে বলল, 'এই জামা-প্যান্টের সঙ্গে ওই খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি মানায় না, আর জুতোটা পালিশ করে নিও, নাহলে লোকে বলবে চুরির মাল।'

'জ্যাঠামো করিস না—' কালাচাঁদ গালে হাত বোলাতে বোলাতে বলল।

দূর থেকে ভালো ভাবে নিজের বাড়ির গলিটা জরিপ করে নিল কালাচাঁদ, আজ গলির মুখে ময়ূরপঙ্খি নেই। নিজের বাড়ির ধারেকাছে যাবার ইচ্ছে বা

BanglaBook.org

সাহস কালাচাঁদের নেই। একটা ট্যাক্সি ধরল কালাচাঁদ, বদনের বাড়ির সামনে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেলা দু'টো।

বদনের বাড়ির সামনে দুধসাদা মারুতি 'জেন' গাড়িটার ভিতর থেকে কোট-টাই, কালো সান-গ্লাস পরা যে লোকটা তাকে ডাকল তাকে বদন বলে চেনাই যায় না। 'উঠে এসো, অনেক দেরি করলে আসতে—' বদন তাড়া লাগাল।

'তোমাকে তো সত্যি সত্যি রাজপুত্তুর লাগছে,' কালাচাঁদ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল। 'অত সাধের চুল কেটে ফেললে? তোমাকে চিনতেই পারি নি। গায়ে ভুর-ভুর করছে সেন্টের গন্ধ!'

'এই গাড়িটা একদিনের জন্য ভাড়া করলাম। ধাড়া ব্যাটা খুব ধুরন্ধর। ট্যাক্সি থেকে যদি নামতে দেখে তবে সন্দেহ করবে,' বদন বলল। 'মামা কোথায়?'

'হরু ঠাকুর? সে তো তোমার সঙ্গে তোমার বাড়িতে এসেছিল।'

'মামাকে নিয়ে আর পারা যায় না। মামার সকাল থেকে ডান চোখ নাচছিল, বলল এটা নাকি অলক্ষুণে, দু'ঘন্টায় এক প্যাকেট চারমিনার উড়িয়ে দিল। তোমার আসার কথা বারোটায়, তুমি আসছ না দেখে খুব টেনশন করছিল, তারপর দুশ্চিন্তায় অধৈর্য হয়ে আর থাকতে না পেরে একটা নাগাদ তোমার বাড়ি গেল—'

'আমার বাড়ি!' কালাচাঁদ আর্তনাদ করে উঠল—'হাঁহপই করে বারণ করে গেলাম তোমাদের—'

'আমিও অনেক বারণ করেছিলাম—' বদন বলল—'তোমার বাড়িটা একবার দেখে আসি?'

'লাভ হবে না—' কালাচাঁদ বলল। 'শেখের লোক হরু ঠাকুরকে নিয়ে আমার বাড়িতে নিশ্চয়ই বসে থাকবে না। ভগবান জানেন কপালে কী লেখা আছে। এখন চল পুঁথিটা দেখিয়ে শেখের মন ভজিয়ে যদি হরু ঠাকুরকে ছাড়িয়ে আনতে পারি।'

ঠিক তিনটের সময় বদনকে নিয়ে কালাচাঁদ হোটেলে ঢুকল। লন্ড্রির নতুন জামা কাপড় সত্ত্বেও বড়ো হোটেলের রাজসিক আভিজাত্য দেখে কালাচাঁদ প্রথমে ঝুঁকড়ে গেল। লাউঞ্জে এক নজরে দেখতে পেল ধাড়াকে, সোফায় বসে চিদানন্দের সঙ্গে কথা বলছিল। 'তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি এগোচ্ছি—' কালাচাঁদ বদনকে দাঁড় করিয়ে রেখে এগিয়ে গেল। কালাচাঁদকে দেখে ধাড়ার চোখ যেন ঝলসে উঠল।

'পার্টিকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি—' কালাচাঁদ বিনীতভাবে বলল। 'আপনারা যদি একটু উঠে আসেন, বোঝেনই তো রাজা-রাজড়ার বিগড়ে যাওয়া পুত্র—'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—' ধাড়া উঠে দাঁড়াল। কালাচাঁদ পিছন ফিরে বদনকে দেখাল—চোখে সানগ্লাস, ঝকঝক করছে নতুন স্যুট, পায়ের কালো জুতো চকচক

BanglaBook.org

করছে, হাতে একটা বাদামি চামড়ার ব্রিফকেস। কালাচাঁদ পরিচয় করিয়ে দিল। বদন চিদানন্দকে একদম পাত্তা না দিয়ে ধাড়ার সঙ্গে ইংরেজিতে সৌজন্য বিনিময় করে বলল—'চলুন, কোথায় যেতে হবে?'

ধাড়া হোটেলের একটা ছোটো কনফারেন্স রুম বুক করে রেখেছিল। ভিতরে হাল্কা রুম ফ্রেশনারের গন্ধ। বদন ব্রিফকেসটা টেবিলে রেখে বলল, 'আমি আপনাকে চিনি না। এত বড়ো একটা ডিল এই কালাধনের ভরসায় করতে পারি না।'

'কালাচাঁদ,' কালাচাঁদ বলল।

ধাড়া বলল, 'আপনাকে আমার পাসপোর্ট—'

'আজকাল সব জাল হয়,' বদন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল। 'এক কাজ করা যেতে পারে, আপনি আমার পুলিশ রেকর্ড চেক করুন আর আমি আপনার পুলিশ রেকর্ড চেক করি, তারপর আমরা কেনাবেচা করব।'

'ন্—না, আপনার কথা বিশ্বাস করছি। পুঁথি চেক করে সন্তুষ্ট হলেই হল। আর আপনি এত বড়ো বংশের ছেলে আপনি কি মিথ্যে কথা বলবেন?' ধাড়া বলল।

'এত মূল্যবান পুঁথি আপনার কাছে কী ভাবে এল?' চিদানন্দের গলায় সন্দেহ।

বদন বলল, 'ডক্টর ধাড়া, আপনার এই কর্মচারীটাকে ছাড়া কি কাজ চলতে পারে না?'

'ইনি আমার কর্মচারী নন। ইনি পুরোনো পুঁথির ব্যাপারে এদেশের এক্সপার্টদের মধ্যে একজন। কোনো ভুল এর মাইক্রোস্কোপিক দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না।' ধাড়া বলল।

বদন কাঁধ ঝাঁকিয়ে কোটের পকেট থেকে পাসপোর্ট বের করে দেখাল—'চন্দ্রবদন ভাদুড়ি। ভাতুড়িয়া থেকে এই ভাদুড়ি বংশের নাম সৃষ্টি হয়েছে। একটাকিয়ার ভাতুড়িয়ার জমিদার ছিলেন গণেশ, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। গণেশ নরসিংহ নাড়িয়াল নামে এক মন্ত্রীর সাহায্যে গৌড়ের বাদশাকে হত্যা করে ১৪১৪ সালে বাংলার রাজা হয়েছিলেন। সেই গণেশের পুত্র যদু মুসলমান হয়ে জালালুদ্দিন নাম নিলেন। জালালুদ্দিন বাংলায় প্রচুর মন্দির ভেঙেছিলেন এবং হিন্দু পুঁথি পুড়িয়েছিলেন—'

'আমার প্রশ্নটা সরল। আপনার কাছে এই পুঁথি এল কী করে? অত গল্পের দরকার নেই।' চিদানন্দ দুঁদে উকিলের স্টাইলে জেরা করল।

বদন চিদানন্দের কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না। সে বলে চলল, 'জালালুদ্দিন আসমানতারা নামে এক মুসলমান মহিলার প্রেমে পড়েন। তার হিন্দু স্ত্রী "নবকিশোরী" এবং মাকে পাণ্ডুয়ায় রেখে জালালুদ্দিন গৌড়ে তার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং সেখানে তিনি আসমানতারার সঙ্গে থাকতেন। জালালুদ্দিন তার মা ও হিন্দু স্ত্রীর প্রতি যে নির্মমতা করেছিলেন তার জন্য অনুতপ্ত ছিলেন। তাই জালালুদ্দিন হিন্দুদের পুঁথি

BanglaBook.org

পুড়িয়ে দিলেও তার প্রজ্জ্বলিত মশাল একটা জায়গায় অপরাধবশত আগুন জ্বালাতে পারেনি, সেটা হল তার হিন্দু স্ত্রী নবকিশোরীর নিত্য ব্যবহৃত পুঁথিপত্র। পঞ্চাননমঙ্গলের একটা পুঁথি সেভাবেই টিকে গেছিল যেটা বংশানুক্রমে আমার হাতে এসে ঠেকেছে।' বদন এবার চিদানন্দের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাপি?'

চিদানন্দ কোনো কথা বলল না। তবে ধাড়া বলল, 'ইন্টারেস্টিং।'

বদন বলল, 'ওকে, এবার পুঁথি দেখা যাক।' বদন ব্রিফকেসের কম্বিনেশন লক ঘুরিয়ে বলল। 'সকলেই বলে পঞ্চাননমঙ্গলে অসাধারণ সব অঙ্ক লুকিয়ে আছে, কিন্তু কী যে সেই অঙ্ক তা কেউ জানে না, তবে হয়তো আপনার এই এক্সপার্ট জানতে পারেন।'আপনি কি জানেন এর মধ্যে কী অঙ্ক আছে?'

'না—' চিদানন্দ গম্ভীর গলায় বলল।

কালাচাঁদ বলল, 'হাসি ঠাট্টার একটা কথা বলি? চিদানন্দ কর্তামশাই, আপনি নাকি ক্লাস টেনে অঙ্ক পরীক্ষায় টুকতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন, এক্ষেত্রে ইশকুল থেকে বের করে দেওয়ারই নিয়ম, কিন্তু আপনার জমিদার-দাদুর বদান্যতায় ইশকুল চলত তাই আপনাকে বিনা শাস্তিতেই ছেড়ে দেওয়া হয়। না না রাগ করবেন না, আপনি অঙ্কে এক্সপার্ট শুনে সদানন্দ কর্তার এই গল্পটা মনে পড়ে হাসি পেল—'

বদন বলল, 'এই পুঁথির এত দাম তার কারণ হল এর অঙ্ক। এখানে এমন সব অঙ্ক লুকিয়ে আছে যেগুলো জানতে পারলে সারা পৃথিবীতে হৈ চৈ পড়ে যাবে। আমি সেই অঙ্কগুলো আপনাদের কাছে দেখাব। সেজন্য প্রথমে পুঁথির ফটোকপি ইউজ করব।'

'ফটোকপি?' চিদানন্দ সন্দেহের সুরে বলল।

'ওরিজিনালটা তালপাতার ওপর লেখা। রেয়ার পিস, পাতার পর পাতা উলটে দেখতে গেলে মুড়মুড় করে ভেঙে যেতে পারে।' বদন চিদানন্দকে অবজ্ঞা করে বলল, 'তারপর যদি আপনি মিস্টার ধাড়া, আই মিন, ডক্টর ধাড়া, যদি চান তবে ওরিজিনাল পুঁথিটা দেখাব। আপনারা দু'টো পুঁথি মিলিয়ে তারপর যে কোনো একটা পাতা পছন্দ করবেন, আমি সেখান থেকে এক স্কোয়ার ইঞ্চ কেটে দেব, আপনারা ল্যাবরেটরিতে কার্বন ডেটিং করাবেন। যদি ল্যাবরেটরি রিপোর্ট পজিটিভ হয়, তবে ডিল হবে। চোদ্দশো সালের পুঁথি বেচাকেনা করছি, আপনি আমি দু'জনেই জানি গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া জানতে পারলে আমাদের জামাই আদর করবে। তাই ডিল হবে হাতে হাতে। এক হাতে পুঁথি নেবেন আর অন্য হাতে ক্যাশ দেবেন। টু ক্রোরস। সেল একবার হবার পর মেটিরিয়্যাল ইজ নন রিটার্নেবল। পুঁথি একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে ফ্রড হওয়ার চান্স থাকে, এক্সপার্টের ছদ্মবেশে এদেশে অনেক ফ্রড ঘুরছে।' বদন চিদানন্দের দিকে তাকাল।

BanglaBook.org

'এগ্রিড,' ধাড়া বলল।

বদন ব্রিফকেস থেকে একটা ফাইল বের করে টেবিলে রাখল, চিদানন্দ আর ধাড়া দু'জনে ফাইলে ঝুঁকে পড়ল। ঘরে নীরবতা নেমে এল, শুধু পাতা উল্টাবার খসখস আওয়াজ হচ্ছে। এবার চিদানন্দ নীরবতা ভাঙল—

'পুঁথিটা জাল!'

কালাচাঁদের বুকের ভিতর থেকে কে যেন হৃদপিণ্ডটা চাকু দিয়ে কেটে নিল।

'হোয়াট?' বদনের মুখে বিস্ময়। 'ইমপসিবল—'

'ওয়েট ওয়েট—' ধাড়া বদনকে থামিয়ে দিল। 'কোনো গোলমাল নজরে এসেছে কি চিদানন্দ বাবু?'

চিদানন্দ একটা জায়গা পড়ে শোনাল, 'এই যে এখানে লেখা—"পহরী আয়িল কামান লৈআঁ"। কামান কথাটা ফারসি, এই শব্দটা চোদ্দশো সালের পুঁথিতে কী ভাবে এল? এদেশে বাবর প্রথম কামান নিয়ে আসে, পনেরশো ছাব্বিশ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে কামান ব্যবহার করে হারায়। তার আগে কেউ কামান দেখে নি—'

'রিডিকিউলাস,' বদনের গলায় তীব্র হতাশা ঝরে পড়ল। 'কামান ফারসি শব্দ এটা যে কোনো বাচ্চা জানে। আর কামান শব্দের ব্যবহার এর থেকেও পুরোনো পূর্বভারতীয় পুঁথিতে আছে। ফারসিতে কামান শব্দের মানে হল ধনুক। বিদ্যাপতি লিখেছেন—

লৌহ কমান ধএল তসু আগু।
তীখ কটাখ মদনসর লাগু॥

তাহলে বলুন বিদ্যাপতির লেখাও জাল?'

চিদানন্দ আমতা আমতা করতে লাগল।

'এই জন্যে আমি হাতুড়ে এক্সপার্টদের সঙ্গে ডিল করি না। নাঃ, আমি আপনাদের সঙ্গে ডিল করব না। কার্টেসি বলে একটা কথা আছে। মুখের ওপর দুম করে বলে দিল—পুঁথিটা জাল। আমি লোক ঠকাবার ব্যবসা করি না।' বদন উঠে দাঁড়াল। কালাচাঁদ লক্ষ করল রাগে বদনের চোখ লাল হতে শুরু করেছে।

'আরে বসুন বসুন,' ধাড়া ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বদনকে হাত ধরে বসাল। 'মাই সিনসিয়ার অ্যাপোলজি। কথাটা রুড হয়ে গেছে। ঠিক এ ভাবে বলা উচিত হয় নি। বোঝেনই তো বয়স্ক লোকের—'

সদানন্দের এক নম্বর টোপে চিদানন্দ বড়শি গেলা মাছের মতো খাবি খাচ্ছে, কালাচাঁদ মনে মনে হাসল।

বদন চেয়ারে বসে রাগত কণ্ঠে বলল, 'অনেকের ভুল ধারণা আছে যে

BanglaBook.org

ভারতবর্ষে প্রথম কামান ব্যবহৃত হয় পানিপথের প্রথম যুদ্ধে। কিন্তু এ ধারণা পুরোপুরি ভুল, চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ভারতে নানা যুদ্ধে কামান ব্যবহৃত হয়। বাঙালিরা দু'টো ব্যাপারে ভারতের সকলকে টেক্কা দিয়ে এসেছে—প্রথমটা হল কামান চালানো আর দ্বিতীয়টা হল নৌ-বিদ্যা। বাবরের আত্মকাহিনী বাবুরনামা পড়েছেন?' বদন চিদানন্দের উত্তরের অপেক্ষা না করে বলে চলল, 'বাবর তার আত্মজীবনীতে বাঙালিদের কামান চালানোর প্রশংসা করেছেন। বাবরের সমসাময়িক বাংলার সুলতান নসরৎ শাহের তোপখানা ছিল। শের শাহ পরে ওই তোপখানা দখল করেছিলেন। বাংলাদেশে পানিপথের প্রথম যুদ্ধের অন্তত নয় বছর আগে পর্তুগিজ শাসনকর্তার প্রতিনিধি জোআঁ-ডি-সিলভেরা চট্টগ্রামের উপকূলের কাছে একটা চালে-বোঝাই নৌকা দখল করে নিয়েছিল, তখন চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ডাঙা থেকে সিলভেরার জাহাজকে উদ্দেশ্য করে কামান দেগেছিলেন। বাঙালির গৌরবময় ইতিহাসটা ভালো করে জানুন, নাহলে আপনার নাতি-নাতনিরা যে না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে বাংলা আর ইংরেজের মধ্যে দোলনার মতো দুলতে থাকবে।'

চিদানন্দ গুম হয়ে বসে রইল। ওর চোখ দেখে কালাচাঁদের মনে হচ্ছিল যে ও এমন অপদস্থ জীবনে কক্ষনো হয় নি। পারলে যেন এক্ষুনি এই ঘর ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু টাকার লোভ বড়ো লোভ, কালাচাঁদ জানে চিদানন্দ যাবে না।

বদন এবার ধাড়াকে বলল, 'বাঙালি নৌসেনা যে বাবরের নৌবহরকে নদীর একটা সঙ্কীর্ণ বাঁকে পরাজিত করে আটকে রেখেছিল একথাও বাবুরনামা-তে আছে। তখন বাঙালির সঙ্গে নৌযুদ্ধে পেরে ওঠা প্রায় অসম্ভব ছিল। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের নৌবহরে পিয়ারা, মহলগিরি, ঘুরাব, পাল, মাচোয়া, পশত, ডিঙি, গছাড়ি, বালাম, পলওয়ার, কোচা—শত শত বিভিন্ন ধরনের তরী ছিল। যশোরের কারিগররা জাহাজ নির্মাণে এত দক্ষ ছিল যে সায়েস্থা খাঁ অনেক জাহাজ যশোর থেকে নির্মাণ করিয়েছিলেন।'

চিদানন্দ গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল, তারপর পকেট থেকে একটা লেন্স বের করল। বদন বলল, 'মাইক্রোস্কোপেরও তাহলে লেন্স লাগে?' বদন তাড়াতাড়ি ব্রিফকেস খুলে সদানন্দের ঘড়ি সারাবার লেন্সটা বের করে বলল, 'আমি বরং আপনাকে একটু হেল্প করে দিচ্ছি। এটা নিন আর ভালো করে দেখুন "চ" টা উলটো কিনা, "ক" এর পিঠটা ত্রিভুজের মতো না গোলাকৃতি, "উ" এর মাথায় আঁকড়া আছে কিনা, "ছ" এর নীচটা ফুলের মতো হয়ে গেছে কিনা—যদি একটাতেও এদিক ওদিক হয় তবে কিন্তু পুঁথিটা জাল।'

ধাড়ার ভুরুযুগল সমকোণে মিলল। বদন বলল, 'আরও আছে "জ" এর

মাঝখানের শিরদাঁড়াটা বাঁকা কিনা সেগুলোও ভালো ভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে, "ট" টা লিকলিক করছে কিনা, "ঘ" টা—'

ধাড়া তারিফ করে বলল, 'আপনি তো মশাই পুঁথির সম্বন্ধে প্রচুর কিছু জানেন দেখছি।'

বদন বলল, 'আরে এগুলোই তো বেসিক জিনিস মশাই। চোদ্দশো সালের "ধ" যখন দেখবেন তখন লক্ষ করবেন মাথায় আঁকড়াটা যেন না থাকে। এসব দেখার জন্য এক্সপার্টের মাইক্রোস্কোপ লাগে না।'

হতভম্ব চিদানন্দ লেন্সটা আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখল।

দুনম্বর ধাক্কা—কালাচাঁদ মনে মনে হাসল।

আবার সবাই কিছুক্ষণ চুপ। পড়তে পড়তে চিদানন্দ এবার থামল, রুমাল বের করে মুখ মুছল, তারপর টেবিল থেকে একটা জলের গ্লাস উঠিয়ে ঢকঢক করে জল খেয়ে উসখুস করতে লাগল।

কালাচাঁদের মনে হল যে ও কিছু একটা প্রশ্ন করতে চাইছে অথচ বদনের হাতে হেনস্থা হবার ভয়ে প্রশ্ন করতে পারছে না। বদন বলল, 'কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান তো করে ফেলুন। মনে খচখচানি নিয়ে দু'কোটি টাকা আমি কক্ষনো খরচ করব না।'

'না ঠিক আছে, তবে—' চিদানন্দ একটু ইতস্তত করে বলল। 'পঞ্চানন দেবতার পুজো মনে তো হয় না বেশি দিন শুরু হয়েছে। আমার ধারণা ছিল মেরে কেটে দু'তিনশো বছর আগে হবে। একেবারে চোদ্দশো সালে—এটা বিশ্বাস করা শক্ত।'

'সময়টা তো আর আমার বাপের জমিদারি না—' বদন ফুল ফর্মে '—যে আমি টাইম বলে দেব আর সেই সময় মেনে ঠাকুর দেবতা সগ্‌গো থেকে মাটিতে নেমে আসবে। কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের নাম শুনেছেন?'

'হ্যাঁ, চণ্ডীমঙ্গল লিখেছিলেন,' চিদানন্দ গম্ভীরভাবে বলল।

'লিখেছিলেন ত অনেক কিছুই, আচ্ছা চণ্ডীমঙ্গল যখন বললেন তখন চণ্ডীমঙ্গল থেকেই এক্সাম্পল দিচ্ছি। চণ্ডীমঙ্গলের শেষ চারটে লাইনে মুকুন্দরাম লিখেছেন—

এই গীত যেই জন করিবে শ্রবণ
বিপদে রাখিবে দুর্গা আর পঞ্চানন
সমাপত হইল এই ষোল পালা গান
অভয়া চরণে ভণে শ্রীকবিকঙ্কণ।

তার মানে পঞ্চানন বাবার পুজো চণ্ডীমঙ্গলের সময় ছিল, রাইট?'

ধাড়া বলল, 'রাইট।'

'মুকুন্দরাম চক্কোত্তি কবে কবিকঙ্কণ চণ্ডী বা অভয়ামঙ্গল লিখেছিল?' বদন জিজ্ঞাসা করল।

BanglaBook.org

চিদানন্দ চুপ।

'ফিফটিন ফর্টি ফোর—' বদন বলল। 'মানে আজ থেকে সাড়ে চারশো বছর আগে। এটা জানতে মশাই পুঁথির এক্সপার্ট হতে হয় না, যে কোনো পাড়ার পাতি লাইব্রেরিতে গেলেই পড়তে পারবেন। ফিফটিন ফর্টি ফোরের পুঁথিতে যদি পঞ্চাননের কথা বলা থাকে তবে তার একশো পঁচিশ তিরিশ বছর আগে পঞ্চাননমঙ্গল লেখা হতে আপত্তিটা কোথায়?'

চিদানন্দ রুমাল দিয়ে এই ঠাণ্ডাঘরেও টাকের ঘাম মুছল।

ধাড়া বলল, 'ইফ ইউ অ্যালাউ মি, একটা কোয়েশ্চেন করতে পারি?'

'সার্টেনলি, একটা কেন একশোটা কোয়েশ্চেন করতে পারেন। ভদ্রভাবে ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্যেই তো এসেছি। অভদ্রভাবে ইনি দুম করে বলে বসলেন পুঁথিটা জাল, মাথাটা গরম হয়ে গেল।'

ধাড়া বলল, 'ওয়েল, আপনাকে খোলাখুলি বলি, কালাচাঁদ আপনাকে বলেছে কিনা জানিনা আমি এই পুঁথিটা একজন আরবের শেখকে বিক্রি করার জন্য কিনছি। শেখ পুঁথিটা কেনার জন্য এত মরিয়া যে নাম শুনেই আরব সাগর পার হয়ে ছুটে এসেছে। আমি শুধু বুঝতে পারছি না, আরবের একজন শেখ কেন পুঁথিটা কেনার জন্য এত মরিয়া হয়ে উঠেছে? এতে আছেটা কী?'

বদন বলল, 'আরবের পণ্ডিতসমাজ এই পুঁথিটার কথা বহু বছর ধরে জানে। এই শেখ কী এমনি এমনি এতদূর থেকে ছুটে এসেছে? ও এই পুঁথিটা পেলেই ওটাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে। এই পুঁথিটাকে ওরা বলে "শয়তানের পুঁথি"।'

'কেন?'

'এতে এমন জিনিস আছে যে আরবের অনেক পণ্ডিত চায় না ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে জানাজানি হয়ে যায়।'

'রিয়্যালি? কী সেটা?' ধাড়া কৌতূহলে ফেটে পড়ছে।

'অঙ্কের দুটো আবিষ্কারের ব্যাপারে আরবরা সারা পৃথিবীর কাছে কৃতিত্ব দাবি করে এসেছে। প্রথমটা হল অ্যালজেবরা আর দ্বিতীয়টা হল অ্যালগরিদম—' বদন বলল। 'অ্যালজেবরা কথাটা এসেছে আরবি "আল জেবর" থেকে আর অ্যালগরিদম শব্দটা এসেছে "আল গরিসম" থেকে।'

'অ্যালজেবরা তো জানি, মানে বীজগণিত, অ্যালগরিদমটা কখনো শুনিনি, সেটা কী জিনিস?' ধাড়া বলল।

বদন বলল, 'অঙ্কের কচকচিতে না গিয়ে একটা সোজা উদাহরণ দিই। কম্পিউটারে দুটো ব্যাপার থাকে। হার্ডওয়্যার মানে কম্পিউটারের শরীর আর সফটওয়্যার মানে কম্পিউটারের ব্রেন। কম্পিউটারের তো আর সত্যি সত্যি মানুষের

BanglaBook.org

মতো ব্রেন বলে কিছু নেই, মানুষ যে বুদ্ধিতে কম্পিউটারের ব্রেনকে চালায় সেটা অ্যালগরিদম। অ্যালগরিদম কম্পিউটারকে বলে দেয় কী ভাবে অঙ্ক করতে হয়।'

চিদানন্দ আর ধাড়ার শূন্য দৃষ্টি দেখে কালাচাঁদ বুঝল যে সে একা নয়।

বদন বলল, 'কম্পিউটার ছেড়ে ইতিহাস শোনা যাক। ৭৭৩ সালে একজন ভারতীয় পণ্ডিত বাগদাদের অল-মনসুরের রাজসভায় ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার কয়েকটা পুঁথি নিয়ে দেখা করেন, পুঁথিগুলো আর্যভটের আর্যভটীয় এবং ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত। খলিফা আদেশ দেন বইগুলোকে আরবি ভাষায় অনুবাদ করার। সেই বই থেকে আরবের পণ্ডিতেরা বুঝতে পারে প্রাচীন ভারতের অঙ্কশাস্ত্র কত উন্নত। তখন মহম্মদ ইবন জুবাইর অল বাত্তানি নামে আরবের এক পণ্ডিত ভারতের প্রাচীন গণিত নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন এবং অল-খোয়ারিজমি, অয়াসিয়া, আবে মাসার ইত্যাদি আরব পণ্ডিতদের ভারতের এই গণিতবিদ্যা শেখান। ইতিহাস বলে ভারতের এই অঙ্ক শিখে অল-খোয়ারিজমির এই অ্যালগরিদমের গণনা বারশো শতাব্দীতে ব্রিটেনের 'অ্যাদেলার্ড' নামে এক গণিতবিদ অনুবাদ করে পশ্চিমের দেশগুলোকে শেখান। অল খোয়ারিজমি যে ভারতীয় গণিতবিদের কাছ থেকে এটা শিখেছিলেন তার নামটা বাদ দিয়ে 'ডি নিউমারো ইন্ডিকো' বা 'ভারতের সংখ্যা দিয়ে গণনাপদ্ধতি' বলে নিজেকে এর আবিষ্কারক বলে চালান। অল-খোয়ারিজমির নামে এই গণনা পদ্ধতির নাম হয় "অল-খোয়ারিসম" বা "অল-গরিসম" যা পরে উচ্চারণ হয় "অ্যালগরিদম" এবং তখন থেকে "অল-খোয়ারিজমি"কে "অ্যালগরিদম" এর জনক হিসাবে ভাবা হয়। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় এই অল-খোয়ারিজমি ৮২০ সালে অ্যালগরিদম ব্যবহার করেছিলেন লিনিয়ার ইকুয়েশন এবং কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের অঙ্কের সমাধান করার জন্য। পঞ্চাননমঙ্গলে কম করে এমন দু'টো ভারতীয় অ্যালগরিদমের বর্ণনা শিবমন্ত্রের মধ্যে আছে যেটা স্পষ্ট প্রমাণ করে দেয় যে প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞরা অল-খোয়ারিজমির অন্তত তিনশো বছর আগে এই অ্যালগরিদম ব্যবহার করে অঙ্কের সমাধান কষতেন।'

'ইন্টারেস্টিং—' ধাড়া দু'হাতের তালু ঘষল উত্তেজনায়।

'আপনি আরব হলে নিশ্চয়ই চাইতেন না এসব জানাজানি হোক—' বদন বলল।

'এই পঞ্চাননমঙ্গলে সেই ডিনামাইটটা রয়েছে?' ধাড়া হাতের পুঁথিটা দেখিয়ে বলল।

'হ্যাঁ, এই এখানে,' বদন মাঝে একা পাতা খুলে দেখাল—

কুবেরবন্ধু পঞ্চাননে দিলেঁ সাত সাগরের ফুল।
তহি পাঁচ মাথাত দিলেঁ সম সম বউল॥

তবেঁ সে প্রতি সাগর হৈতে ফুল আনিলেঁ সম।
করযোড়ী চারি ফুলে চারি বেদ নম॥

কুবেরবন্ধু হল শিবের আরেক নাম। সাত সাগর থেকে সমান সমান ফুল এনে পঞ্চানন দেবতার পাঁচমাথায় শ্রদ্ধাঞ্জলি দেব আর তার থেকে চারটে ফুল বাঁচবে সেটা আমরা চার বেদ-এ উৎসর্গ করব। এখন প্রশ্ন হল প্রতি সাগর থেকে কটা ফুল এসেছে এবং বাবা পঞ্চাননের প্রতি মাথায় সমান সংখ্যক কটা করে ফুল দিলে চারটে ফুল অবশিষ্ট থাকবে। এর উত্তরে বাবা তার প্রিয় সন্তানকে দিয়ে লেখালেন—

অধিকাগ্রভাগহারং ছিন্দ্যাদূনাগ্রভাগহারেণ।
শেষপরস্পরভক্তং মতিগুণমগ্রান্তরে ক্ষিপ্তং॥
অধতপরিগুণিতমন্ত্যযুগুনায়চ্ছেদভাগিতে শেষং।
অধিকাগ্রচ্ছেদগুণং দ্বিচ্ছেদাগ্রমধিকাগ্রযুতং॥

এটা হল এক মহান ভারতীয় প্রাচীন গণিত বিশারদের মাত্র তেইশ বছর বয়সে লেখা দু'টো যুগান্তকারী অ্যালগরিদমের শ্লোক—' বদন থামল।

'এর মধ্যে ঝামেলাটা কোথায়?' ধাড়া বলল। 'এটা তো অঙ্কের ধাঁধা।'

'দুটো আননোন সলভ করতে লাগে দু'টো ইকুয়েশন। এখানে আমাদের দু'টো আননোন পঞ্চাননের পাঁচ মাথার প্রতি মাথায় কটা করে ফুল গেল আর সাত সাগরের প্রতি সাগর থেকে কটা করে ফুল এল আর আমাদের হাতে মাত্র একটা ইকুয়েশন সেভেন এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইকুয়ালস টোয়ো। এর সমাধান হল প্রতি সাগর থেকে দুটো ফুল আনতে হবে আর প্রতি মাথায় দুটো ফুল দিতে হবে। এর আরও অনেক সমাধান হয়। সংস্কৃতে লেখাটা এর সমাধানের একটা অ্যালগরিদমের ফর্মুলা। মহান গণিতজ্ঞ আর্যভটের আর একটা মাস্টারপিস "কুত্তক অ্যালগরিদম"। 'আর্যভটীয়'র গণিতপাদের ৩২ এবং ৩৩ নম্বর শ্লোক। এই কুত্তক দিয়ে এই সমীকরণ ভাঙতে শিখিয়ে দিলেন। কুত্তক অ্যালগরিদম খোয়ারিজমির অন্তত তিনশো বছর আগে লেখা হয়েছিল। এখন আল খোয়ারিজমি যদি অ্যালগরিদমের জনক হয় তবে রাম জন্মানোর আগেই অ্যালগরিদমের রামায়ণ লেখা হয়ে গেছিল—' বদন বলল।

'কিংবা বলা যায় গৌরাঙ্গ জন্মাবার আগেই গৌরচন্দ্রিকা—' কালাচাঁদ বলল।

'কুত্তক ছাড়াও এখানে আর একটা মারাত্মক অ্যালগরিদমের উল্লেখ আছে—' বদন পাতা উলটে দেখাল—'চক্রবাল পদ্ধতি, এটা আরেক মহান গণিতজ্ঞ দ্বিতীয় ভাস্করের পদ্ধতি। ভাস্কর ১১১৪ সালে জন্মেছিলেন, আল খোয়ারিজমি ৮৫০ সালে মারা যাওয়ার আড়াইশো বছরের কিছু পরে। সুতরাং ভাস্করের অ্যালগরিদম নিয়ে আরবদের মাথা ব্যথা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু ভাস্কর চক্রবাল পদ্ধতির জন্য যে দ্বিমাত্রিক সমীকরণটা ব্যবহার করেছিলেন সেই এন এক্স স্কোয়ার প্লাস কে ইকুয়ালস

ওয়াই স্কোয়ার সমীকরণের কিছু সমাধান ব্রহ্মগুপ্ত তার পাঁচশো বছর আগে করে গেছিলেন অ্যালগরিদম ব্যবহার করে। এই সমীকরণের নাম ভারতীয় গণিতজ্ঞরা দিয়েছিলেন "বর্গপ্রকৃতি" আর সেই পদ্ধতির ব্রহ্মগুপ্তের সমাধানের উল্লেখ আছে এই পঞ্চাননমঙ্গলে আর তার কিছু উল্লেখ আছে চয়নবিলের নীচের ভাঙা পাথরে—

মূলং দ্বিধেষ্ট বর্গাৎ গুণক গুণাদিষ্টযুক্ত বিহীনাঞ্চ।
আদ্যবধো গুণকগুণঃ সহানয়ধাতেন কৃতমন্ত্যম ॥ ৬৪ ॥

আর এইটা—

বর্গে গুণকে ক্ষেপঃ কেনচিদুৎধৃতয়ুতোনিতো দলিতঃ
প্রথমোহনয়মূলমন্ত্যো গুণকারপদৎধৃতঃ প্রথমঃ ॥

এটা আল খোয়ারিজমির অন্তত দুশো বছর আগে ৬২৮ সালে লেখা—'

'তার মানে ৭৭৩ সালে যে ভারতীয় পণ্ডিত বাগদাদে গেছিলেন তার কাছ থেকে আরবরা এই অ্যালগরিদমের ব্যাপারটা শেখেন।'

'আরবদের একটা কৃতিত্ব যে তারা পশ্চিম দুনিয়ার কাছে অ্যালগরিদমের প্রচারটা করেছিলন,' বদন বলল। 'তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই ভারতীয় পুঁথি যা থেকে অল-খোয়ারিজমি শিখেছিলেন সেটার উল্লেখ তিনি করেন নি। লোকে বলে পারস্যের সম্রাটের সৈন্যরা ভারতীয়দের সমস্ত অঙ্কের পুঁথি জ্বালিয়ে দেন যাতে ভারতীয়রা গণিত আবিষ্কারের দাবি না করতে পারে। নাগার্জুন, আর্যভট, ধর্মপাল, শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত, কমলশীল, ধর্মকীর্তি এদের মহান সব কীর্তি এই সব জ্বলন্ত হিরে সব পুড়ে কয়লা হয়ে যায়। অ্যালগরিদমের পুঁথিগুলোও কয়লা হয়ে যাওয়া হিরে। ১২০৩ সালের আগে বক্তিয়ার খিলজি গোটা নালন্দা জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। নালন্দার তিনটে বিশাল লাইব্রেরি—রত্নসাগর, রত্ননিধি এবং রত্নরঞ্জনে তিন মাস ধরে শুধু আগুন জ্বলেছে, পাহাড়ের গায়ে যেমন বাদল মেঘ আটকে থাকে, ধোঁয়ার কুণ্ডলী নাকি আকাশে সে ভাবে আটকে ছিল। বক্তিয়ার খিলজি যখন নালন্দা জ্বালাচ্ছিল তখন নাকি বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা দুপুরের আহারে বসেছিলেন। পরবর্তীকালে পুরাতত্ত্বের খননে এটা আবিস্কৃত হয়। পাহাড়ের মতো গাদাগাদা বই পুড়ে ও তার সঙ্গে মৃত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর পোড়া গন্ধে চারদিক বসবাসের অযোগ্য হয়ে গেছিল। তবু কিছু বই নিয়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এদিক ওদিক পালিয়েছিল। তার মধ্যে আর্যভট ও ব্রহ্মগুপ্তের অনেক বই ছিল। পরে মুদিত ভদ্র নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নালন্দার লাইব্রেরির পুনর্গঠন করেন। কিন্তু অনেক বই আর নালন্দায় ফিরে আসেনি। দুশো বছর পর নালন্দায় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করতে গিয়ে নন্দীধন নামে এক অসাধারণ মেধাবী বাঙালি ছাত্র এই অ্যালগরিদমের সন্ধান পান, তিনি বাংলাতে এই অ্যালগরিদম অনুবাদ করে

BanglaBook.org

ফেলেন। নন্দীধনের ভয় ছিল যে এই অ্যালগরিদম হয়তো জানতে পারলে সুলতান শাসকেরা জ্বালিয়ে ফেলবে। তাই তিনি এগুলোকে ঈশ্বরের আরাধনার আড়ালে একটা পুঁথিতে লুকিয়ে ফেলেন। কুত্তকের অনেকগুলো ব্যাখ্যা নন্দীধনের নজরে এসেছিল—ভাস্কর, ব্রহ্মগুপ্তের মতন মহান গণিতজ্ঞরা এই জটিল গণিতের শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছিলেন বিভিন্ন ভাবে। তাই নন্দীধন এই শ্লোক দুটির বাংলা অনুবাদ করেননি। ভয় ছিল অনুবাদের পালিশের সময় যেন কুত্তক হীরকখণ্ডের কোনো বিকৃতি না হয়। তবে তিনি একটা কাজ করেছিলেন, বাংলায় সমস্যাটা লেখার সময় তিনি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটা সূত্র দিয়ে গেছিলেন। বাংলা প্রশ্নটার প্রথম অক্ষরগুলো শুধু দেখলে তা বোঝা যায়—

কুবেরবন্ধু পঞ্চাননে দিলেঁ সাত সাগরের ফুল।
তহি পাঁচ মাথাত দিলেঁ সম সম বউল॥
তবেঁ সে প্রতি সাগর হৈতে ফুল আনিলেঁ সম।
করযোড়ী চারি ফুলে চারি বেদ নম॥

'কু-ত-ত-ক,' ধাড়ার চোখে বিস্ময়ের সমুদ্র।

'দুর্ভাগ্যক্রমে সে খবর সুলতানের সুবেদারদের মারফত আরবে পৌঁছে যায়। এই পুঁথি প্রচলিত হলে কুত্তকের জনপ্রিয়তা পশ্চিম দুনিয়ায় পৌঁছে দেবে। এই পুঁথি যাতে জনপ্রিয় না হয় তাই আরবের পণ্ডিতরা এই পুঁথির নাম দেয় "শয়তানের পুঁথি"। এই পুঁথি যেন দেখলেই পুড়িয়ে ফেলা হয়।'

'ওঃ মাই গড—' ধাড়া বলল। 'আর সেই পুঁথি হল এই পঞ্চাননমঙ্গল!'

বদন বলল—'আরবের অঙ্কশাস্ত্রে হিন্দুদের প্রভাব এত বেশি ছিল যে আরবিতে অঙ্ককে বলে 'হিন্দসা'—'

'কিন্তু কোনো বাঙালি রাজার সঙ্গে পারস্যের সম্রাটদের এত হৃদ্যতা ছিল বলে তো শুনিনি—' চিদানন্দ মন্তব্য করল।

বদন বিরক্তির সঙ্গে তাচ্ছিল্য মিশিয়ে মুখ দিয়ে পুচ করে একটা শব্দ করে বলল, 'আপনি তো অনেক কিছুই শোনেন নি। যদি এটা না শুনে থাকেন তবে এখন বলি শুনুন।'

কালাচাঁদ ভাবল আজ চিদানন্দ কর্তা কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিল কে জানে, দিনটা মোটেই ভালো যাচ্ছে না।

বদন বলল, 'যে বাঙালি রাজা আরব দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছিল তার নাম এই পঞ্চাননমঙ্গলে আছে—রাজা জালালুদ্দিন।' বদন এক চুমুক জল খেয়ে গলা ভিজিয়ে নিল। 'হিন্দু রাজা গণেশের পুত্র যদু মুসলমান হয়ে জালালুদ্দিন নাম নিলেন এবং উনি চাইলেন যে তাঁকে সম্রাট মুসলমান হিসাবে ইসলাম ধর্মে

BanglaBook.org

স্বীকৃতি দেওয়া হোক। তার জন্যে তিনি অনেক কিছু করলেন—মক্কায় একটা ইসলাম কলেজ তৈরি করে দিলেন, অনেক ধন রত্ন দিয়ে তিনি মিশরের প্রভাবশালী ইসলাম মামলুক সুলতানকে অনুরোধ করলেন যে তাকে যেন একটা সম্মানের পোশাক ও একটা স্বীকৃতি পত্র দেওয়া হয়। আরবরা ততদিনে পঞ্চাননমঙ্গলের অঙ্কের স্তোত্রের কথা চারদিকে চাউর হয়ে গেছে। আরবদের মান বাঁচাতে সেই স্বীকৃতির বিনিময়ে যদি সমস্ত পঞ্চাননমঙ্গল জ্বালিয়ে দেওয়ার অনুরোধ আসে তবে কি জালালুদ্দিন সেই ছোট্ট অনুরোধটুকু রাখবে না? ১৪২৭ সালে জালালুদ্দিন মিশরের কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি পেল এবং নিজেকে আল সুলতান আল আজম আল মুজ্জামিন খালিফত আল্লাহ নামে প্রচার করল।'

ধাড়া বলল, 'জালালুদ্দিনের রৌপ্যমুদ্রা আমি দেখেছি, ওতে নিজেকে উনি খালিফত অল-আল্লাহ বা আল্লার খলিফা বলেছেন।'

বদন বলল, 'গুড, আপনি মশাই পুরোনো মুদ্রার কারবারও করেন নাকি?'

ধাড়া ঢোক গিলে বলল, 'না না।'

কালাচাঁদ মনে মনে হাসল। বদন যেন সার্কাসের রিং মাস্টার, সিংহকে ভেড়ার মতো খেলাচ্ছে।

বদন বলল, 'নন্দীধন শুধু অ্যালগরিদম-ই না, আরও অনেক হারিয়ে যাওয়া অঙ্কের সূত্রকে পঞ্চাননমঙ্গলের ভিতর বাঁধলেন যেমন আলোর গতিবেগ, অ্যালজেব্রার ফরমুলা, পিঙ্গলা, আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর, বরাহমিহির এদের সকলের বিখ্যাত কাজগুলো পঞ্চাননমঙ্গলের শিবের স্তোত্রের ভিতর গোপনে ঢুকিয়ে দিলেন এবং যাতে এই পুঁথির লেখা সহজে নষ্ট না হয়ে যায় তার জন্যে তিনি এগুলোকে পঞ্চমুণ্ড গ্রামের পঞ্চাননদেবতার মন্দিরের পাথরের দেওয়ালে খোদাই করে লিপিবদ্ধ করে রাখলেন।'

'সেই পাথর আমি স্বচক্ষে দেখেছি—' ধাড়া সম্মোহিতের মতো বলল।

'পাঁচমুড়োর পিছনে অনেক জলে ভরা পাহাড়ি খাদ আছে। সেই পাহাড়ে সে সময়ে অনেক গুহা ছিল, কিছু কিছু গুহা চয়নবিলের জলের নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেটা নন্দীধন জানতেন। নন্দীধন যখন জটামদনের বারাঙ্গনার থেকে শুনলেন যে পরদিন সকালে জালালুদ্দিনের সৈন্য এসে তার মন্দির ধুলোয় মিশিয়ে দেবে, তিনি অস্থির হলেন এই ভেবে যে সমস্ত অঙ্কের স্তোত্রগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। তাই নন্দীধন অধিক রাতে পঞ্চমুণ্ড গ্রামের সঙ্ঘারাম-বিহারের ছাত্র-অধ্যাপকদের ডেকে পাঠালেন পঞ্চানন মন্দিরের চত্বরে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি বাদলের মধ্যে কয়েকশো মানুষ জড়ো হলে, নন্দীধন বললেন—এই মন্দিরের শ্লোক লেখা প্রত্যেকটা পাথর সোনার চেয়েও দামি। এদের রক্ষা করার দায়িত্ব

BanglaBook.org

আপনাদের। মঠের ছাত্র-অধ্যাপকেরা বলল—কালাজ্বরে আমাদের প্রাণ আপনি রক্ষা করেছেন, আমরা প্রাণ দিয়েও আপনার অনুরোধ রক্ষা করব। তারপর এক আশ্চর্য কর্মযজ্ঞ শুরু হল। সঙ্ঘারাম-বিহারবাসীরা এক এক করে মন্দিরের প্রতিটি পাথর, ইট খুলে ফেলে ডুব দিয়ে জলের নীচের গুহায় পাথরগুলি যত্ন করে রেখে এল এবং সেই পাথরের ভিতরে রেখে এল বাবা পঞ্চাননকে। সকালের মধ্যে মন্দির এবং বাবা পঞ্চানন ভোজবাজির মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। অবশ্য এর জন্য প্রকৃতি সাথ দিয়েছিল। প্রবল বৃষ্টিতে চারদিক জলমগ্ন, মন্দিরের ভিত জলের নীচে থাকায় মনে হচ্ছিল যে মন্দির ভ্যানিশ—চারদিকে শুধু জল আর জল।'

'আর তারপর নন্দীধন রাজার অত্যাচার হতে বাঁচবার জন্যে নিজেকে একটা পাথরে বেঁধে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল, নন্দীধনের কংকালটাও দেখলাম,' ধাড়া বলল।

'পাথরে নিজেকে বেঁধে ঝাঁপ দেওয়ার যে তার অভিপ্রায় ছিল সেটা সত্যি, কিন্তু তিনি যে জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন সে কথা কিন্তু পঞ্চাননমঙ্গলে কোথাও লেখা নেই।'

'তাহলে ওই কংকাল?'

'জটামদন—' বদন বলল।

'জটামদন?'

'হ্যাঁ, যে ডোম পাঁচমুড়োতে কংকাল পুড়িয়েছিল তার সঙ্গে আমি কথা বলেছি, সে বলল কংকালের ডান হাতে ছটা আঙুল ছিল।'

'আপনি কীভাবে জানলেন ওনার ছ'টা আঙুল ছিল?' চিদানন্দ বলল।

'পাঁচমুড়োর জমিদারবাড়ির দেওয়ালে জটামদনের যে চাবুক মারার অয়েল-পেইন্টিং আছে, তাতে জটামদনের ডান হাতে ছ'টা আঙুল আঁকা।'

'কিন্তু জটামদন কীভাবে জলের নীচে আসবে?' ধাড়া বলল।

'নন্দীধনের মেয়েকে দেখে জটামদনের মনে ভোগ লালসা জেগে উঠল। রাতে জটামদন নন্দীধনকে জমিদার বাড়িতে ডাকল এবং বলল তার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিলে সে মন্দির বাঁচিয়ে দেবে। নন্দীধন রাজি হল না। সেই রাতে নন্দীধন তার মেয়েকে নিরাপদ জায়গায় পাঠাবার চেষ্টা করল। জটামদন টের পেল এবং নন্দীধনের মেয়েকে ধরতে জটামদন নাকি তার লেঠেল পাইকদের নিয়ে জঙ্গলে ঢোকে। কিন্তু জঙ্গলে পাগলা হাতির আক্রমণে জটামদন ও তার কিছু সৈন্যের মৃত্যু হয়। অবশ্য অন্য একটা গল্প আছে যে নন্দীধন তাঁর মেয়ে জামাইকে জঙ্গলে পাঠিয়ে তাদের রক্ষার্থে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সাহায্য চায়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা জঙ্গলে গিয়ে জটামদনের মৃতদেহ দেখতে পায়। জটামদনের মৃতদেহ যাতে নবাব জালালুদ্দিন দেখতে না পায় তাই তার দেহ পাথরে বেঁধে জলের নীচে পঞ্চাননের পাশে সলিল সমাধি করে দেয়।'

BanglaBook.org

'কিন্তু অত্তবড় পাথরের মন্দির, একরাতে? বিশ্বাস করা শক্ত।' চিদানন্দ খুঁতখুঁত করতে লাগল।

বদন বলল, 'অত্তবড় মানে কত্তবড়? প্রাচীন বাংলায় কাব্যে কবিরা অনেক সময় অতিরঞ্জন করত। কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গলে আছে চাঁদ সওদাগরের নৌকার একটা মাস্তুল নাকি এত উঁচু ছিল যে তার ওপরে উঠলে নাকি বাংলা থেকে রাবণের লঙ্কা দেখা যেত। বিজয়গুপ্ত চাঁদ সওদাগরের নৌবহর বর্ণনা করছেন—

তার পিছু বাওয়াইল ডিঙা নামে উদয়তারা
অনেক নায় ঝড় বৃষ্টি অনেক নায় খরা

তার মানে তার নৌবহরের এক দিকের নৌকোয় যখন বৃষ্টি হত তখন অন্য নৌকোয় খরা। পঞ্চাননমন্দির কত বড়ো ছিল সে বিষয়ে আমি কোনো অতিরঞ্জন এই পুঁথিতে পাই নি। পাথরের মন্দির হলেই যে বিশাল মন্দির হতে হবে তার কোনো মানে নেই।'

'কিন্তু হাতি এসে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে জঙ্গল পার করে ওদের উদ্ধার করল এটা বড়ো বাড়াবাড়ি ঠেকছে—' চিদানন্দ খুঁতখুঁত স্বরে বলল।

'প্রাচীন বাংলায় অনেক কাব্যে দু'রকম অর্থ হত—' বদন বলল। 'সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতের প্রতিটি শ্লোকের দু'রকম মানে ছিল। আর পঞ্চাননমঙ্গল হল দু'রকম অর্থের রাজা।'

'শিবের মন্ত্রের আড়ালে অঙ্ক—' ধাড়া বলল।

'শেষের দিকের এই লাইনগুলো একটু পড়ুন তো চিদানন্দবাবু—' বদন পুঁথির একটা পাতা খুলে দেখাল।

চিদানন্দ জোরে জোরে পড়ল—

'শূর উচাইয়া রাতে ধাএ গজমতি
খঙ্গে কাঢ়ে রাএ উমত বেগবতী
বলরাম ভানুমতী সহ দেব সাথে
ষোলকলা ভাগএ এহি চাঁদহীন রাতে।'

'ব্যাস, ব্যাস—' বদন বলল— 'এর মানেটা কি বলতে পারবেন?'

'এর মানে খুবই সহজ,' চিদানন্দ বলল। 'রাতের অন্ধকারে শুঁড় উচিয়ে হাতি ছুটল, দ্রুতবেগে ছুটতে ছুটতে উন্মত্ত হাতি ক্রোধে চিৎকার করতে লাগল। হাতির সঙ্গে সঙ্গে চলেছে বলরাম আর ভানুমতী আর তাদের সঙ্গে চলেছে দেবতা। পূর্ণিমা রাতে চাঁদের ষোলোকলা পূর্ণ হয়। এই রাত চাঁদহীন, তাই চাঁদের এককলাও দেখা যাচ্ছে না।'

বদন মৃদু হাসল, 'ভানুমতী বলরামের গল্পের অনেকরকম সংস্করণ আছে। পাঁচমুড়ো গ্রামে একটা গল্প চালু আছে যে বলরাম নাকি বৌদ্ধবিহারে লুকিয়ে ছিল ;

BanglaBook.org

সেখানে তার সহদেব নামে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী তীরবাসী এক বালামী উদ্বাস্তুর সঙ্গে সখ্যতা হয়। সেই বালামীদের কাছে একটা ক্ষিপ্রগামী বিশাল বালাম নৌকো ছিল। এই বালাম নৌকো শুঁড় উঁচানো হস্তিমুখো ছিল এবং এর নাম ছিল গজমতি। জটামদনের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে বলরাম ও ভানুমতী বুঝেছিল এই বাদলের মধ্যে দুর্গম বন পেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তখন বলরাম ও ভানুমতী বৌদ্ধ বিহারে ফিরে আসে। কিন্তু ততক্ষণে নন্দীধনের ডাকে সব বৌদ্ধ ভিক্ষু পঞ্চাননবাবার মন্দিরের দেওয়াল নিরাবরনে ব্যস্ত। তারপর শেষরাতে নন্দীধনকে সঙ্গে নিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সঙ্ঘারাম-বিহারে ফিরে আসে এবং তারা জানত যে সুলতানের সৈন্যরা তাদের মঠ জ্বালিয়ে দেবে এবং তাদের ওপর অত্যাচার করবে, তাই ওরা শেষরাতে প্রচণ্ড ঝড়-বাদলের তাণ্ডবের মধ্যে গজমতি বালাম ভাসায়। প্রথম দু'লাইনের মানে হচ্ছে উন্মত্ত বেগবতী নদীর ঢেউয়ের ক্রুদ্ধ গর্জনের মধ্যে শুঁড় উঁচিয়ে গজমতি ক্ষিপ্রবেগে চলেছে। তৃতীয় লাইনে "সহ" আর "দেব" জুড়ে দিলে হয় বলরাম আর ভানুমতীকে নিয়ে সহদেব চলেছে। বালামে ষোলোখানা দাঁড় থাকত। ষোলো জন কুশলী দাঁড়ি এই চাঁদহীন রাতে বালামকে ভাগিয়ে নিয়ে চলেছে।'

'চমৎকার—' ধাড়ার মুখ দিয়ে প্রশংসা বেরিয়ে এল। 'তারপর?'

'খুব সম্ভবত নদীপথে চলতে চলতে প্রভাতে ওরা অপর পারে দূর কোনো এক নগরে পরিচিত সওদাগরের গৃহে সাময়িক আশ্রয় নেয়। বণিক সকলকে শুকনো পোশাক ও খাদ্য দেয়। কাব্যে "সন্ধো" কথাটা মানে সকলে। শুধু দু'জনে এলে দোহেঁ লিখত। বদন আবার পড়ল,

প্রভাত আদিত সন্ধো আয়াসিলী দেহে।
আইলা আনপারে এক সাধুর গেহে॥
মন হৈতে বাহিরিলা মরনের তরাস।
সাধুজনা সন্ধো দিলেঁ শুখা বাস॥

নন্দীধন, বলরাম, ভানুমতী সহ ভিক্ষুরা মনে হয় বালামে সাগরপাড়ি দিয়ে দেশত্যাগ করে জাভাদ্বীপে চলে যায়। তারপর কয়েকশো বছর বাংলাদেশে মুসলমান শাসন চলে, সেই ভিক্ষুরা আর ফিরে আসেনি, তারা শ্যাম, কম্বোজ, মালয়, যবদ্বীপে থেকে যায়।'

বদন আবার জলের গ্লাসে চুমুক মেরে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর ধাড়াকে বলল, 'নন্দীধনের গল্প ছেড়ে এখন কাজের কথায় আসা যাক। আপনি বরং আপনার শেখকে একটু কুত্তক, চক্রবাল এই নাম দু'টো শোনান, আমার কথা সত্যি কিনা তবে বুঝতে পারবেন।'

ধাড়া পকেট ফোনে নম্বর লাগিয়ে আরবিতে কথা বলল যা কালাচাঁদের

BanglaBook.org

বোধগম্য না হলেও কুত্তক, চক্রবাল, আর্যভট্ট এসব শব্দগুলো কানে এল। কথা বলতে বলতে ধাড়া উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কালাচাঁদ বুঝল যে টেলিফোনের ওদিকে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়েছে।

ধাড়া ফোন বন্ধ করে উত্তেজিত হয়ে ঢকঢক করে এক গ্লাস জল এক নিশ্বাসে শেষ করে বলল, 'ওরিজিনাল পুঁথিটা দেখান, শেখ খুব উত্তেজিত। ইটস আ ডিল। পুঁথিটা একবার স্বচক্ষে দেখতে চাই।'

'কিন্তু একটা খটকা মনে থেকে যাচ্ছে—' চিদানন্দ বলল।

'বলুন, কী খটকা?' বদন ব্রিফকেস খুলতে গিয়ে থেমে বলল।

'পঞ্চানন লিঙ্গ ধোয়া জল খেয়ে কালাজ্বর সেরে গেল কী ভাবে?' চিদানন্দ আবার উকিলের মতো জেরা করল।

বদন বলল, 'শোনা যায় এই বিগ্রহের লিঙ্গ ছিল কষ্টিপাথরের কিন্তু মুখ নাকি এক বিশেষ ধাতু দিয়ে তৈরি হয়েছিল যা এই দেশে বেশি পাওয়া যেত না কিন্তু চিন দেশে পাওয়া যেত। সে সময় নালন্দায় তিব্বত-চিন থেকে অনেক ছাত্র পড়তে আসত। নন্দীধন যখন তেরোশো সালের শেষের দিকে নালন্দায় ছাত্র ছিলেন তখন নাকি চিনদেশ থেকে এক ছাত্র এই বড়ো ধাতব খণ্ডটি নিয়ে আসে এবং নন্দীধনকে বন্ধুত্বের উপহার দেয়। নালন্দায় পাঠ শেষ হলে নন্দীধন বাড়ি ফিরে আসেন এবং এই ধাতবখণ্ড দিয়ে পঞ্চানন ঠাকুরের মুখ বানান। এই ধাতু ধোওয়া জল—'

'এমন কোনো ধাতু আছে বলে শুনিনি যার জল কালাজ্বর সারিয়ে দেয়—' চিদানন্দ বলল।

বদন চিদানন্দকে বলল, 'ইউরিয়াস্টিবামিন কী জানেন?'

চিদানন্দ মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

বদন বলল, 'কালাজ্বরের প্রতিষেধক ঔষধ। বাঙালি ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী আবিষ্কার করেছিলেন। স্টিবিয়াম হল অ্যান্টিমনি নামে এক ধাতুর ল্যাটিন নাম। ডক্টর ব্রহ্মচারীর নাম দু'বার নোবেল প্রাইজের জন্য রেকমেন্ড করে পাঠানো হয় কিন্তু নোবেল প্রাইজ উনি পান নি। কিন্তু সব বাঙালির ওনার নাম গর্বের সঙ্গে জানা উচিত। আমার দাদু যখন কলকাতায় ডাক্তারি পড়তেন তখন ডাক্তার ব্রহ্মচারী কারমাইকেল হাসপাতালে ইউরিয়াস্টিবামিন নিয়ে রিসার্চ করছেন। ডাক্তার ব্রহ্মচারী বলেছিলেন আগে নাকি এই অ্যান্টিমনি এক সময় কালাজ্বরের ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হত। আর অ্যান্টিমনি চিনে খুব পরিমাণে পাওয়া যেত। যুক্তির কথা বলতে বললেন তাই বলি, শিবের মুখ অ্যান্টিমনি দিয়ে বানালে, তার গুঁড়ো জলে গুলে পেটে গেলে কালাজ্বর সেরে যাওয়া অসম্ভব তো নয়, আর ভক্তির কথা বললে বাবা পঞ্চাননের দয়ায় কালাজ্বর সাদাজ্বর সব জ্বর এক লহমায় সেরে যেতে পারে। শুধু চাই বাবার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস।'

BanglaBook.org

কালাচাঁদ কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে বলল, 'জয় বাবা পঞ্চানন।'

ধাড়া বলল, 'নিকুচি করেছে যুক্তি না ভক্তি, আমার পাত্তি পেলেই হল। দ্যাখান মশাই আপনার পুঁথি।'

বদন স্মিত হেসে ব্রিফকেসটা খুলতে বেরিয়ে এল হরু ঠাকুরের অসাধারণ সৃষ্টি। মনে হচ্ছে টেবিলের ওপর চোদ্দশো সালের এক জীর্ণ, কীটদষ্ট পুঁথি, এখানে ওখানে জলের দাগ, পাতার দু'ধারে উই ধরে গেছে, উজ্জ্বল কালি। খুব সন্তর্পণে পাতা উলটে উলটে বদন দেখাল যে ফটোকপির সঙ্গে হাতের লেখাগুলো মিলে যাচ্ছে।

'একবার হাতে নিয়ে দেখতে পারি?' চিদানন্দ বলল। 'এ তো দেখছি তালপাতার পুঁথি।'

'চোদ্দশো সালের প্রথম দিকের পুঁথি তালপাতার হবে না তো শেয়ালদার ফটোকপির বন্ড পেপারের হবে?' বদন বিরক্তি প্রকাশ করল। 'ওসব বস্তু আমার কাছে পাবেন না, দারভাঙার বাজিতপুরে যান ওরা আপনাকে বিদ্যাপতির পুঁথিও তুলট কাগজে লিখিয়ে এনে দেবে। কাগজ অবিশ্যি চোদ্দশো সালে বাংলায় চালু হব হব করছে, কিন্তু হিন্দু পণ্ডিতরা কিছুতেই তখন কাগজে পুঁথি লিখতে চাইত না, যেহেতু যবনরা কাগজ এনেছিল তাই।'

'আপনি তো মশাই জিনিয়াস!' ধাড়া বলল।

বদন বলল, 'সবাই তো আর ঢাক ঢোল পিটিয়ে এক্সপার্টের তকমা লাগায় না।'

'কালিটা যেন কেমন—,' চিদানন্দ খুঁতখুঁত করতে লাগল। 'ঠিক সেই কোয়ালিটির নয়—'

'কালির কোয়ালিটি?' বদন ভুরু কুঁচকে বলল। 'এরা বেচারা সেই কবেকার যুগের লোক, এদের কালির কোয়ালিটির দোষ দিয়ে কি হবে। আমাদের দেশ এখনও কালি শিল্পে অনুন্নতই রয়ে গেল—আজও আমাদের কারেন্সি নোট ছাপাবার কালি আর কাগজ বাইরের দেশ থেকে কিনে আনতে হয়। উন্নতমানের কালি—যাগ্যে এবার বলুন কোন্ কোনা থেকে কাটব? বদন একটা কাঁচি বের করল ব্রিফকেস থেকে।

'কাটবেন কেন?' ধাড়া বলল।

'বাঃ, সি ফোরটিন টেস্ট করাবেন না?' বদন বলল। 'আমার কথায় তো আর পুঁথির সতীত্ব প্রমাণ হয় না। দু'কোটি টাকা দেবেন এবার একটু টেকনোলজির সার্টিফিকেট না পেলে মনে শান্তি আসে না। করেই নিন রেডিওঅ্যাকটিভ কার্বন টেস্ট। বাপ-মায়ে বলা জন্মতারিখের তো আজকাল কোনো দাম নেই, বার্থ সার্টিফিকেটে যা লেখা থাকবে সেটাই হবে বেদের মতো সত্যি। আজকাল তো সার্টিফিকেটের যুগ। বাজিতপুরে এরকম ল্যাবরেটরির কার্বন টেস্টিং এর সার্টিফিকেট মুঠো মুঠো মুড়ি মুড়কির মতো বিক্রি হয়। কী বলেন কালাধনবাবু?'

BanglaBook.org

'কালাচাঁদ,' কালাচাঁদ বলল।

বাজিতপুর নামটা শুনে ধাড়ার মধ্যে একটা আগ্নেয়গিরি যেন ফেটে বেরল।

'নিকুচি করেছে কার্বন টেস্ট। আপনাকে তো বললাম আমি এই পুঁথি কিনছি। দামটা একটু কম করবেন না?'

'টু ক্রোরস। এক টাকাও কম না—' বদন দৃঢ়স্বরে বলল। 'পাঁচমুড়োতে জমিদার সদানন্দ ভটচাজ নামে একজন আমার এই পুঁথি অলরেডি যাচাই করেছেন। উনি লন্ডনের কোন্ একটা মিউজিয়ামের ক্লায়েন্টের জন্য এই পুঁথিটা কিনছেন। তবে ওনার একটা স্ট্রোক মতো হওয়ায় ডিলটা পিছিয়ে গেল, তাই এই কালাচাঁদ বাবুর কথায়—'

'ওটা উনি আমার জন্যেই কিনছিলেন,' ধাড়া বলল।

'আচ্ছা। আপনার লন্ডনে মিউজিয়াম আছে বুঝি?' বদন বলল।

'হ্যাঁ মানে—যাক ওসব কথা—' ধাড়া এড়াতে চাইল।

চিদানন্দ বিড়বিড় করে বদনকে শুনিয়ে বলল—'এই কটা মাত্র পাতা—দু'কোটি?'

'মিস্টার ধাড়া, আপনার এই কর্মচারীটাকে এবার প্লিজ এখান থেকে বের করে দিন, এটাকে আর নেওয়া যাচ্ছে না। ভ্যান গগের নাম শুনেছেন?'

'ছবি আঁকে তো?'

'হ্যাঁ, এই তো কয়েক বছর আগে ওর একটা ছবি 'পোর্ট্রেট অব ডক্টর গ্যাচেট' বিক্রি হল। পুঁচকে ছবি—লম্বা আর চওড়ায় দু'ফুটেরও কম। ওইটুকু ছবি বিক্রি হল তিনশো কোটি টাকায়।'

কালাচাঁদ আঙুল গুনতে লাগল। বদন জিজ্ঞাসা করল, 'কী গুনছেন?'

কালাচাঁদ বলল 'একক-দশক-শতক-সহস্র-অযুত-লক্ষ-নিযুত-কোটি—এই পর্যন্ত জানি। তারপরে কী গো?'

বদন বলল, 'কাগজের কটা পাতা, ছবি কত বড়ো এসব দিয়ে কি মূল্য তৈরি হয়?' বদন এবার ধাড়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই আপনাদের বিলেতেই নিউ ইয়র্কের রকোফেলার সেন্টারে ক্রিস্টিস-এ অকশনটা হল। আপনার পার্টনার তো মনে হচ্ছে যেন ডিটারমাইনড যে পুঁথিটা যেন আপনার হাতে না যায়।'

'কী উলটো পালটা কথা বলছেন?' চিদানন্দ ঝাঁঝিয়ে বলল। 'আমি কখনও এত পাতলা মঙ্গলকাব্য দেখিনি। অন্নদামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল—'

বদন বলল, 'মধুসূদন চক্রবর্তী কবীন্দ্রের কালিকামঙ্গলের নাম শুনেছেন? বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি, বর্ধমানের বিদ্যার সঙ্গে কাঁচীর সুন্দরের প্রণয়। মাত্র এক পাতা। ঠিক যেন ব্রতকথা।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। টু ক্রোরস, ডিল। বেচাকেনা হবে পাঁচমুড়োতে,'

BanglaBook.org

ধাড়া ব্যস্ত হয়ে বলল। 'শেখকে একটা মন্দির দেখাতে নিয়ে যাব, সেই মন্দিরের গায়ে এই পঞ্চাননমঙ্গলের অঙ্কের শ্লোকগুলো লেখা আছে। ওরা শুধু একবার মিলিয়ে দেখবে ব্যাস। ওটাই ওদের কাছে কার্বন টেস্ট—' ধাড়া বলল।

'সরি, হাজার লোকের সামনে এক্সপোজড হতে চাই না ; রিপোর্টররা জানতে পারলে খবরের কাগজে আমার নাম স্ক্যান্ডাল রটিয়ে দেবে—রাজা গণেশের বংশধর বিদেশে পুঁথি পাচার করছেন। আর আমি দালালি পছন্দ করি না। আমি আপনাকে বেচছি, আপনার হাত থেকে টাকা নিচ্ছি, আপনি আমার বায়ার। আপনি পুঁথি নিয়ে আপনার লন্ডনের মিউজিয়ামে রাখুন, অন্য কারুর কাছে বেচুন বা ফায়ার প্লেসে গুঁজুন সেটা আপনার ডিসিশন।'

'ওককে ওককে, আপনাকে সামনে আসতে হবে না। আর সত্যি কথা বলতে আমিও চাই না আমার আরবের ক্রেতারা আপনাকে দেখুক। আপনার এই একটা ফটোকপি রাখছি। আজ সন্ধ্যাবেলায় আরবের স্কলারকে এই অঙ্কগুলো দেখাব, বোঝাব। কাল ওদের নিয়ে আমি পাঁচমুড়োর মন্দির দেখাব। আপনি মন্দিরের কাছে আপনার গাড়ির ভিতর বসে থাকুন, আমি ওদের মন্দির দেখিয়ে ফেরার আগে আপনার গাড়িতে টাকা নিয়ে আসব, ওখানে কনসাইনমেন্ট হ্যান্ডওভার হবে।'

'ঠিক আছে, এটাও সঙ্গে রাখুন,' বদন আরও একটা কাগজ ধাড়াকে দিল। 'এটাতে অঙ্কের ব্যাখ্যা ইংলিশে লেখা আছে। আপনার বোঝাতে সুবিধে হবে।'

ধাড়া অত্যন্ত প্রীত হয়ে বলল, 'ডিল।' ধাড়া করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল।

'আর একটা কথা—' বদনের গলা এবার বেশ গম্ভীর। 'আজ সন্ধ্যাবেলার মধ্যে হরু ঠাকুর যদি বাড়ি না ফেরে, এই পুঁথি আপনি পাবেন না। আমি পুলিশে খবর দেব।'

ধাড়া বলল, 'চিদানন্দবাবু আপনি এখন আসুন, আপনার কাজ আপাতত শেষ, আপনার সঙ্গে আমি পরে দেখা করব।'

চিদানন্দ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ধাড়া বলল, 'একটু উপরে আসতে পারবেন?'

বদন বলল, 'আমি কোথাও যাব না।'

কালাচাঁদ ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ধাড়াকে বলল, 'আমি যাচ্ছি চলুন, রাজা রাজড়াদের কি মানায় দরজায় দরজায় ঘোরা?' তারপর বদনকে বলল—'আপনি বসুন, আমি এনার কথা শুনে এক্ষুনি আসছি।'

ধাড়া নিমরাজি মতো হয়ে কালাচাঁদকে বলল, 'ঠিক আছে চল।'

কালাচাঁদ ধাড়ার সঙ্গে কামরা থেকে বেরোবার সময় পিছন থেকে বদনের গলা ভেসে এল—'একটুও ঝামেলা মনে হলে পুঁথি আমি বেচব না।'

'না না, কোনো ঝামেলা হবে না—' ধাড়া ব্যস্ত হয়ে বলল। তারপর কালাচাঁদকে বলল, 'তুমি চল আমার সঙ্গে।'

BanglaBook.org

কালাচাঁদ ধাড়ার সঙ্গে কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে লিফটে উঠল। ধাড়াকে নার্ভাস দেখাচ্ছিল। কালাচাঁদ নিজেও নার্ভাস, কালাচাঁদের আঙুলের নখগুলো দাঁতের কাছাকাছি চলে গেল। এত বড়ো হোটেলে বাপের জন্মে সে ঢোকেনি, তার ওপর সব সময় পুলিশের ভয়। অনেক টাকার সওদা—তিন কোটি। ভাবলেই গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। কালাচাঁদ ভিতরে ভিতরে ঘামতে লাগল।

পাঁচতলায় লিফট থামল। লিফট থেকে বেরিয়ে ধাড়ার পিছনে পিছনে হেঁটে কালাচাঁদ নরম কার্পেট মোড়া হলওয়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছাল। ধাড়া বন্ধ দরজায় কলিং বেল বাজাল। একটু সময় কাটল, একটা লোক দরজাটা খুলে দিল। ধাড়ার পিছনে পিছনে ভিতরে ঢুকেই কালাচাঁদের বুক ধড়াস করে উঠল।

মেঝেতে হরু ঠাকুর।

হরু ঠাকুরের দু'হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, মুখে একটা কাপড় গোঁজা। হরু ঠাকুরের মাথায় খুনেটা একটা রিভলভার ঠেকিয়ে সোফায় বসে।

।। চৌত্রিশ ।।

কালাচাঁদকে দেখে খুনেটা হরু ঠাকুরের মাথায় রিভলভারটা ঠেসে ধরল, হরু ঠাকুরের দু'চোখে মৃত্যুভয়। বিছানায় ধবধবে সাদা টানটান চাদরের ওপর শেখ বসে আছে, যেন বিচারক। তার অঙ্গুলি হেলনে ঘাতক হরু ঠাকুরের ঘিলুতে গরম সিসা ঠুসে দেবে।

ধাড়া মাথা ঝুঁকিয়ে শেখকে সেলাম করল। কালাচাঁদও ধাড়াকে অনুসরণ করে সেলাম ঠুকল।

শেখ সেলাম-টেলাম গ্রাহ্য না করে জিজ্ঞাসা করল, 'পুঁথিটা আসল না নকল?'

ধাড়া বলল, 'আসল।'

শেখ ইশারা করল, খুনেটা রিভলভারটা হরু ঠাকুরের মাথা থেকে সরিয়ে কোমরে গুঁজল। শেখ বলল, 'একটা গুলি নষ্ট হওয়ার থেকে বেঁচে গেল। এ লোকটা আমার কাছে মর্টগেজ হিসেবে থাকবে। শয়তানের পুঁথি আমার হাতে এলে আমি একে ছেড়ে দেব।'

হরু ঠাকুরের যেন বাহুর মাংস ভেদ করে দড়ির দাগ, শয়তানটা এত টাইট করে বেঁধেছে। কালাচাঁদের মাথায় রক্ত ঝলকে ঝলকে উঠল। কিন্তু হরু ঠাকুরের কথা কালাচাঁদের মনে পড়ে গেল—আগুনে কেরোসিন ছিটাস নে। কালাচাঁদ নিজেকে সংযত করল। এ লোকটা নিজের বাপকে চিতাবাঘের পেটে পাঠিয়েছে, এর সঙ্গে

BanglaBook.org

ঔদ্ধত্য দেখানো চরম মূর্খামি। কেরোসিন কখনও আগুনের সঙ্গে লড়াই করে জিততে পারে না। কালাচাঁদ শেখের দিকে তাকিয়ে বাংলায় বলল, 'কথা দিয়েছিলাম সাত দিনের মধ্যে এনে দেব পঞ্চাননমঙ্গল, আমার কথা আমি রেখেছি। তুমি যদি আমাদের মারতে চাও তবে মার, কিন্তু তাতে পঞ্চাননমঙ্গল তোমার হাতে আসবে না। আর যদি পঞ্চাননমঙ্গল চাও তবে আমাকে বিশ্বাস করতেই হবে।'

ধাড়া দ্রুত শেখের কানের কাছে গিয়ে নীচু গলায় কী সব বলল আর শেখ বাধ্য ছেলের মতো মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে ধাড়ার কথা মন দিয়ে শুনতে লাগল। ধাড়ার কথা শেষ হলে শেখ আরবিতে খুনেটাকে কী আদেশ দিল, খুনেটা কোমরে গোঁজা ভোজালিটা খুলে বার করল। কালাচাঁদের ভয়ে মাথা ঘুরতে লাগল। এই লোকটাই সেদিন চোখের সামনে একটা খুন করেছিল। লোকটা হরু ঠাকুরের দুই কবজির মধ্যে দিয়ে ভোজালি চালিয়ে হরু ঠাকুরের হাতের মোটা দড়িটা কেটে দিল, তারপর হরু ঠাকুরের হাত-মুখের বাঁধন খুলে দিল।

কালাচাঁদ হরু ঠাকুরের দু'বাহুতে হাত বোলাল। হরু ঠাকুরের চোখে জল, কিন্তু এত ভয় পেয়েছে যে কাঁদতে পারছে না।

শেখ বলল, 'কাল সকালে পাঁচমুড়োর মন্দিরের পাথরের দেওয়ালে লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখব, যদি তোমার পুঁথির সঙ্গে মেলে, ধাড়া টাকা দিয়ে মাল কিনবে। আমি কথার খেলাপ করি না। আর যদি দেখি সব ভাঁওতা তবে তোমরা ভাবতেও পারবে না তোমাদের কপালে কী আছে। এখন তোমরা যেতে পার।'

ধাড়ার সঙ্গে হরু ঠাকুর আর কালাচাঁদ হোটেলের কামরার বাইরে বেরিয়ে এল। হরু ঠাকুর রাগে ফুঁসছে। লিফটে ঢুকে হরু ঠাকুর ধাড়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'পঞ্চাননমঙ্গল তাহলে সত্যি সত্যি এবার চিরতরে হারিয়ে যাবে। আপনার আরবের কাস্টমাররা পঞ্চাননমঙ্গলটা পেলেই পুড়িয়ে ফেলবে। আপনি এটা জেনেও আরবের বদমাশগুলোকে এই পুঁথি বেচবেন?'

ধাড়া তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, 'মুদি কাস্টমারের কাছে চাল বিক্রি করে পয়সা নেয়, ব্যাস। তারপর কাস্টমার সেই চাল দিয়ে পায়েস বানাবে না খিচুড়ি বানাবে সেটা কি দেখা মুদির কাজ?'

হরু ঠাকুর অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে বলল, 'টাকার জন্য আপনি বোধহয় আপনার মাকেও এই আরবদের কাছে বেচে দিতে পারেন। যখন ওই পঞ্চাননমঙ্গল আরবের লোকগুলো পোড়াবে, তখন মনে করবেন ওরা আপনার মায়ের সতীদাহ করছে। সেদিন কালা নাকি আপনার কোটে বমি করে দিয়েছিল, এখন আমার ইচ্ছা করছে আপনার মুখে বমি করি। আপনারা যা ইচ্ছা হয় করুন, আমি এর মধ্যে নেই।' গ্রাউন্ড ফ্লোরে লিফটের দরজা খুলে গেল, হরু

BanglaBook.org

ঠাকুর কালার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি হোটেলের বাইরে অপেক্ষা করছি, তোদের হলে আমায় তুলে নিস।' হরু ঠাকুর চলে যেতে ধাড়া বিড়বিড় করে বলল, 'বাঙালিরা এই সেন্টিমেন্টের জন্যই বিজনেস করতে পারল না।'

কালাচাঁদ ধাড়াকে বলল, 'জালালুদ্দিন শুনেছি নন্দীধনকে মারতে চেয়েছিল, যারা এইসব অঙ্কের কাহিনি জানে, আরবরা তাদেরও বিপজ্জনক বলে মনে করত, একটু সাবধানে এই শেখকে হ্যান্ডেল করবেন।'

ধাড়া ঢোক গিলল।

* * *

গাড়িতে হরু ঠাকুর গুম হয়ে বসে রইল। অস্বস্তি কাটাতে কালাচাঁদ বদনকে বলল, 'রাজা গণেশের কথাটা সত্যি?'

'কোন্ কথাটা?'

'ওই যে বললে, নারকেল মন্ত্রী?'

'নারকেল না নাড়িয়াল—' বদন বলল। 'সত্যি।'

'নাড়িয়াল। ভাতুড়িয়া থেকে ভাদুড়ি হলে নাড়িয়াল থেকে বোধ হয় নারকেল শব্দটা এসেছে।'

বদন গম্ভীর ভাবে বলল, 'চৈতন্যদেব মহাপ্রভুর সহচর প্রভু অদ্বৈতাচার্যের এই নাড়িয়াল বংশে জন্ম। চৈতন্যমহাপ্রভু তাই অদ্বৈতাচার্যকে নাড়াবুড়া বলে ডাকতেন।'

'জালালুদ্দিনের কথা কি সত্যি?'

'কোন্টা?'

'ওই যে আসমানতারার প্রেম, নর্মকিশোরী, মিশর টিশর স্বীকৃতি?'

'হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট সত্যি।'

'আর ওই আলুর-দম না কী বললে, সেটা?'

'অ্যালগরিদম—' বদন বলল। 'খাঁটি সত্যি। আমাদের অঙ্ক অনেকেই নিজেদের বলে চালিয়েছে।'

'আর ওই জালালুদ্দিন পঞ্চাননমঙ্গল জ্বালিয়েছিল সেটা?'

'মুসলমান রাজারা সে সময় প্রচুর হিন্দু পুঁথি জ্বালিয়েছিল।'

'জালালুদ্দিন পঞ্চাননমঙ্গল জ্বালিয়েছিল?'

বদন বিরক্তি মুখে বলল, 'বড্ড বেশি প্রশ্ন কর কেন কালাধন?'

কালাচাঁদ হেসে বলল, 'কালাচাঁদ।' তারপর কালাচাঁদ বলল, 'কালাজ্বর নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করে এসেছ দেখছি, কত কিছু বললে—'

বদন গম্ভীর গলায় বলল, 'যেগুলো বলিনি সেগুলো হল—কালাজ্বর বা ভিসেরাল লেইশ্ম্যানিয়াসিস লেইশ্ম্যানিয়া ডোনোভানি দ্বারা সৃষ্ট একটি পরাশ্রয়ী

BanglaBook.org

রোগ যা ফ্লেবোটোমাস অর্জেন্টাইপস নামক বেলে মাছি দ্বারা সংক্রামিত হয়। সত্তরের দশকের শুরুতে বিহার ও বাংলায় কালাজ্বর আবার বিরাট আকার ধারণ করে ফিরে এসেছিল।' বদন এবার চুপ হল।

এবার হরু ঠাকুর মুখ খুলে গম্ভীর গলায় বলল, 'সেই কালাজ্বরে বদনের বাবার মৃত্যু হয়। সেদিন বদনের প্রথম জন্মদিন। তারপর থেকে কখনও বদনের জন্মদিন পালন করা হয় নি।' কালাচাঁদ দু'চোখ বুঝে একটা বড়ো শ্বাস নিল। জীবনের কত যে ফাঁক-ফোকর জমাট কান্না দিয়ে ভরাট।

গাড়ি রাস্তায় দ্রুত ছুটে চলল।

।। পঁয়ত্রিশ ।।

ম্যাটাডোর নিয়ে কুমোরটুলিতে কারিগরের দোকানে যখন তিনজনে পৌঁছোল তখন রাত নটা বেজে গেছে। চারদিকে সব দোকানের ঝাঁপ বন্ধ, গলিতে একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে। ঘিয়েভাজা কুকুরগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল, তিনজন অপরিচিত মানুষকে দেখে চেঁচাতে আরম্ভ করল।

'কুত্তাগুলো চোরের গায়ের গন্ধ চিনতে পারে—' কালাচাঁদ বলল। কালাচাঁদ ঢিল ছুড়ে ছুড়ে আর মুখ দিয়ে হ্যাট হ্যাট শব্দ করে তাড়িয়ে আবার এগোল।

কারিগর উঠব উঠব করছিল। কালাচাঁদকে দেখে বলল, 'ভাবলাম আপনি আসবেন না হয়তো আজ। কিন্তু আপনি বলে গেছেন যে কাল ভোরে পুজো তাই দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে পারছিলাম না। পুজোআচ্চার ব্যাপার বলে কথা।'

'মূর্তি রেডি?' কালাচাঁদ বলল।

'হান্ড্রেড পার্সেন্ট। যা বানিয়েছি আপনার মন খুশি হয়ে যাবে, যদিও মেহনত খুব করতে হল। এদিকে আসুন, পুলিশের যাতে ঝামেলা না হয় তাই ভিতরে রেখেছি।' কারিগর ওদের ভিতরের একটা গুদামে ডাকল।

ভিতরের ঘরে একটা চকচকে পালিশ করা কালো কষ্টিপাথরের তিনফুট উঁচু শিবলিঙ্গ আর তাতে পাঁচটা ধাতব মুখ। হরু ঠাকুর মাটিতে শুয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

'অপূর্ব!' কালাচাঁদ বলল। 'বাবার পাঁচ মুখ যেন শরীর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।'

'বললাম না কাজ আগে, পয়সা কাজ দেখে তবে,' কারিগর গর্বিত মুখে বলল। 'বাবার লিঙ্গ শরীর কষ্টিপাথরের, কিন্তু মুখগুলো অ্যালুমিনিয়াম গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে বানিয়েছি, কেমন চকচক করছে দেখুন। আ-হা!'

BanglaBook.org

'ফা-টা-ফা-টি হয়েছে,' কালাচাঁদ বলল।

'বারোটা ছাপ্পান্ন বাজিয়ে দিলে—' বদন স্বগতোক্তি করল।

কারিগর ঘড়ি দেখে বলল, 'না না রাত এখন মোটে নটা কুড়ি—আমাদের অভ্যাস আছে। এ তো কিছুই না—দুর্গাপুজোর সময় সারারাত—'

'আমাদের বারোটা ছাপ্পান্ন বাজিয়ে দিলেন—' বদন বলল।

'মানে?'

'অ্যালুমিনিয়াম তো আবিষ্কার হল এই সেদিন—এইটটিন টোয়েনটি সেভেনে, ফিফটিস্থ সেঞ্চুরির মূর্তি তবে কী ভাবে অ্যালুমিনিয়ামের হবে?'

হরু ঠাকুর বিড়বিড় করে বলল, 'এ তো গৌরাঙ্গের আগেই গৌরচন্দ্রিকা।'

কালাচাঁদ ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে আর্তনাদ করে বলল, 'আপনাকে অ্যালুমিনিয়াম দিতে কে বলেছিল? লোহা ছিল না?'

কারিগর ঘাবড়ে গেল, সে মিনমিন করে বলল, 'বাবার লিঙ্গে মেয়েছেলেরা জল-দুধ ঢালে, দু-দিনেই মরচে পড়ে যাবে, তাই ভাবলাম অ্যালুমিনিয়াম দিই, দেখতেও ভালো লাগবে, আমি তো এর জন্যে আপনার কাছ থেকে এক্সট্রা পয়সা চার্জ করছি না, যা কথা হয়েছে তাই দেবেন।'

কালাচাঁদ মাথা চাপড়াতে লাগল। 'এ আপনি কী করলেন? এ মূর্তি আমি নিতে পারব না, আপনি আমার পাথরের মুখ লাগিয়ে দেন।'

হতবাক কারিগর বলল, 'বেশ লাগিয়ে দেব, দু-দিন পরে আসবেন।'

কালাচাঁদ আবার মাথা চাপড়াল—'হে বাবা পঞ্চানন, এ কি ফ্যাসাদে পড়লাম।'

বদনকে দেখে কারিগরের বোধহয় তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে সহানুভূতিশীল মানুষ বলে মনে হল, কারিগর বদনকে অনুনয় করে বলল, 'ভাই, আজকের মতো অ্যালুমিনিয়ামের মুখ দিয়ে কাজ চালিয়ে দিন না, এক সপ্তাহের মধ্যে—'

'ইমপসিবল,' বদন বলল। 'প্ল্যাটিনাম দিয়ে বানালে তাও কোনোরকমে ম্যানেজ করে নিতাম, ওটা সিক্সটিস্থ সেঞ্চুরিতে আবিষ্কার হয়েছিল।'

'প্ল্যাটিনাম!' কারিগর আর্তনাদ করে উঠল। 'দাদা কি ধেনো টেনে এসেছেন নাকি? প্ল্যাটিনামের দাম জানেন কত? সোনার চেয়েও বেশি।' এবার কালাচাঁদের দিকে তাকিয়ে কারিগর বলল, 'বানিয়ে দ্যান বললেই তো আর সঙ্গে সঙ্গে বানিয়ে দেওয়া যায় না। ছাঁচে লোহা গলিয়ে ঢেলে—দুটো দিন সময় লাগবে।' তারপর কারিগর গজগজ করতে লাগল, 'কী জমানা পড়েছে, লোকের ভালো করতে যাওয়াও পাপ। তিরিশ বছর ব্যবসা করছি, এরকম কাস্টমার কখনও দেখিনি।'

'এবার কী?' দোকান থেকে বেরিয়ে হরু ঠাকুর বলল।

BanglaBook.org

'কী আবার? বাড়ি গিয়ে সবাই নাকে তেল দিয়ে ঘুম লাগাও।' কালাচাঁদ গজগজ করতে করতে বলল। 'ধাড়া কাল দলবল নিয়ে পাঁচমুড়োয় গিয়ে দেখবে মন্দির ফাঁকা। ওর শেখ তখন আমায় খুঁজে আমার মুড়োটা মন্দিরে স্থাপনা করে তারপর দেশে ফিরবে।'

'এখন কী করতে চাস সেটা বল, কালা।'

'তোমরা দু'জনে এক কাজ কর, তোমরা আজ পাঁচমুড়ো চলে যাও। দেখা দরকার আফজল রাজমিস্ত্রি মন্দিরটা ঠিকমত বানিয়েছে কিনা। বলা যায় না গিয়ে হয়তো দেখবে আফজলও মন্দিরে অ্যালুমিনিয়াম-টিনিয়ামের চুড়ো পাকামো করে লাগিয়েছে। মন্দিরটা তোমরা ভালো ভাবে দেখ, যা যা কাজ করাতে হবে আজ রাতে করাও। আমাদের না দেখলে কর্তামশাই এর টেনশনে সত্যি সত্যি স্ট্রোক হয়ে যাবে।'

'আর তুই?'

'আমি একটা পঞ্চানন মূর্তি নিয়ে তবে আজ রাতে পাঁচমুড়ো ফিরব।'

'কালা, কে তোকে এত রাতে পঞ্চানন বাবার মূর্তি দেবে? হরু ঠাকুরের গলার স্বরে উদ্বেগ।

'চোরদের কেউ কখনও হাতে ধরে কিছু দেয় না, হরু ঠাকুর। কালাচাঁদ চোর আজ পঞ্চাননমঙ্গলের জন্যে জীবনের শেষ চুরিটা করবে—' কালাচাঁদ বলল। 'আমি মূর্তি নিয়ে এই ম্যাটাডোরে শেষরাতে পাঁচমুড়ো পৌঁছে চয়নবিলের জলে ডুবিয়ে দেব। তোমরা আর দেরি কোরো না, আমাকে সকালে চয়নবিলের ঘাটে পাবে।'

হরু ঠাকুর আর বদনের হতবাক দৃষ্টির সামনে ম্যাটাডোরে উঠে কালাচাঁদ ড্রাইভারকে বলল, 'নারকেলডাঙা চল।'

BanglaBook.org

।। ছত্রিশ ।।

কাদাপাড়ায় ভাঙা মন্দিরের সামনে এসে ম্যাটাডোরটা দাঁড়াল। রাস্তাটা একদম শুনশান। 'গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে দাঁড় করা, আর গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করিস না—' কালাচাঁদ ড্রাইভার ছোকরাটাকে বলল। 'যাব আর আসব।'

সকালের মন্দিরের দরজায় একটা নতুন তালা। ওটা খোলা কালাচাঁদের বাঁ হাতের খেল। ভিতরে ঢুকে অন্ধকারে টর্চ জ্বালিয়ে দেখল কালাচাঁদ। নীচে মেঝেটা খোবলানো, উপরে তাকের ওপর বাবা পঞ্চাননের মূর্তিটা ঠিক জায়গায়

আছে। কালাচাঁদ বাবার মূর্তিটা তাক থেকে নামাবার চেষ্টা করল। কালাচাঁদের মতো লিকলিকে লোকের পক্ষে এটা খুব ভারী, কালাচাঁদের মাথার ঘাম ঝড়তে লাগল। এদিক ওদিক ঠেলার চেষ্টা করেও মূর্তিটাকে একচুল নড়াতে পারল না কালাচাঁদ। মরিয়া হয়ে দাঁতে দাঁত চেপে 'জয় বাবা,' বলে হ্যাঁচকা টান লাগাল।

'কৌন?' কালাচাঁদের মুখে একটা জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল। 'হারামজাদা, ফির চুরানে আয়া?' এক বিশাল চেহারার দারোয়ান হাতে ছ'ফুট লাঠি নিয়ে দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে।

দারোয়ানটাকে এক ধাক্কা মেরে কালাচাঁদ বাইরে বেরাতে গেল, দারোয়ানটা কালাচাঁদের জামার কলারটা ধরে এক ঘুষি মারল মুখে। নাকে প্রচণ্ড ব্যথায় কালাচাঁদ বুঝল যে দরদর করে রক্ত বেড়াচ্ছে। কালাচাঁদ চোখে অন্ধকার দেখল, কিন্তু কানে শুনতে পেল ম্যাটাডোরটা জোর আওয়াজে ভেগে পড়ছে। এক ঝাঁকুনিতে কালাচাঁদ লোকটাকে টলিয়ে পাশ দিয়ে দৌড় লাগল কিন্তু পিছন থেকে এক বিশাল লাঠির ঘা ঘাড়ের পিছনে এসে আঘাত করল। কালাচাঁদ দড়াম করে মন্দিরের সিঁড়িতে উলটে পড়ে যাওয়ার সময় গুরুদেব সিধু পুরুতের উপদেশ মনে এল— চুরি করার পর চুরির স্থানে কক্ষনো সে দিন ফিরে যাবি না। কালাচাঁদ অজ্ঞান হয়ে গেল।

কালাচাঁদের যখন জ্ঞান এল, তখন জায়গাটা চিনতে ওর অসুবিধা হল না— থানার-লক-আপ। নাকে মুখে জামায় চাপ চাপ রক্ত জমে আছে। সারা গায়ে বিশেষ করে ঘাড়ে আর নাকে খুব ব্যথা, এত জোরে নাকে ঘুষিটা মেরেছে। তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। লক আপের ভিতর উঠে বসে কালাচাঁদ হিন্ডালিয়ামের গ্লাসে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেল। খুব খিদে পেয়েছে, কালাচাঁদ আবার এক গ্লাস জল খেল। মাথাটা ভার, শীত শীত করছে। কালাচাঁদ বুঝল গায়ে জ্বর এসেছে। কালাচাঁদ বেহুঁশের মতো আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

কতক্ষণ বেহুঁশের মতো সে ঘুমিয়েছিল তা জানে না কালাচাঁদ। লকআপের তালা খোলার আওয়াজে যখন ঘুমটা ভাঙল তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। লোহার দরজার ওপাশে হাবিলদারটা চেঁচিয়ে বলল, 'এ্যাই শুয়োরের বাচ্চা, বাইরে আয়!'

কালাচাঁদকে নিয়ে হাবিলদার দারোগার কামরায় এল।

'আমি নির্দোষ দারোগাবাবু—' কালাচাঁদ হাত জোড় করে বলল।

'এটাকে ভ্যানে তোল,' দারোগা পেন হাতে কাগজে শব্দ-জব্দ করতে করতে বলল।

'কোথায় যাব স্যার?' কালাচাঁদের মনে দুশ্চিন্তা হরু ঠাকুর আর বদনের কথা কি পুলিশ জানতে পেরে গেছে?

BanglaBook.org

'মর্গ।'

'মর্গ। মর্গ কেন?'

'তোর বাপের বিয়ে হবে ওখানে, তোকে বাপের বাসরে গান গাইতে হবে—' দারোগা টুপিটা মাথায় এঁটে কাগজটা ভাঁজ করে হাতের ডাণ্ডার সঙ্গে পাকিয়ে উঠে দাঁড়াল।

মর্গে কালাচাঁদ আগেও কয়েকবার এসেছে। সাদা কোট পরা একটা লোক ওদের ভিতরে নিয়ে গেল। ঠাণ্ডা ঘরের ভিতর সারি সারি সাদা চাদর ঢাকা শবদেহ, ওষুধের ঝাঁঝালো গন্ধ, কালাচাঁদের ভয়ভয় শিরশিরানি লাগে। দারোগার ইশারায় লোকটা একটা চাদর টেনে একটা লাশ বের করল। লাশের মুখের দিকে তাকিয়ে কালাচাঁদের মাথা ঘুরতে লাগল, চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। মুখটা আগুনে একদম পুড়ে কাঠকয়লা হয়ে গেছে, কিচ্ছু চেনা যায় না, অথচ মাথার চুল তেমন পোড়েনি। পোড়া মুখের করোটির ফাঁকে দাঁতের পাটি নজরে এল, নীচের পাটিতে সোনার দাঁত চকচক করছে। মুখটা জ্বলে গেলেও কালাচাঁদ শরীরটা চিনতে পারল। তার চোখ নীচে হাতের আঙুলের দিকে গেল—সোনার আংটিটা চিনতে পারল, কিন্তু টোপাকুল সাইজের হিরেটা নেই। কালাচাঁদ হড়হড় করে বমি করে দিল।

'ডিসগাস্টিং!' দারোগা বাইরে বেরিয়ে গেল।

কুলকুচি করে, চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে হাবিলদারের সঙ্গে বাইরে ডাক্তারের ঘরে এসে দেখল দারোগা বসে বসে ক্রস ওয়ার্ড পাজল করছে। কালাচাঁদকে দেখে বলল, 'লাশটাকে চিনিস?'

কালাচাঁদ বলল, 'না।'

'ঠিক আছে, ওর পাশে তোকে এক রাত শুইয়ে রাখছি তবে চিনতে পারবি—' দারোগা একটা চিরকুট টেবিলে রাখল। 'এটা চিনতে পারছিস?'

কালাচাঁদ দেখল চিরকুটটা—কৃষ্ণচন্দ্র পণ্ডিত, ২২ নম্বর গলি, রাজাবাজার ; তার নিজের হাতের লেখা, পাঁচমুড়োতে ধাড়াকে দিয়েছিল।

'লোকটার পেটে বারোটা চাকু মারা হয়েছে। লাশটা পাঁচমুড়ো গ্রামের কাছে হাইওয়ের ধারে একটা মাঠে পড়েছিল। এই পুঁথিতে আগুন জ্বালিয়ে কেউ ওর মুখটা সেই আগুনে ঠেসে ধরেছে।' দারোগা একটা বড়ো জিপলক ধরণের ব্যাগ বের করে পোড়া পুঁথিটা দেখাল, কালাচাঁদ দেখল প্রায় পুড়ে যাওয়া ছাই এর মধ্যে একটা লাইনের অর্ধেক দেখা যাচ্ছে—"পঞ্চানন থানে নন্দী হৈল আচেতন—"

'তোর এই নাম ঠিকানা লোকটার জামার বুক পকেটে পাওয়া গেছে। তোর পাড়ায় গিয়ে জানলাম তুই মাঝেমাঝেই আমাদের ঘরজামাই হয়ে থাকিস,

BanglaBook.org

তাই কষ্ট হল না, তোকে থানাতেই পেয়ে গেলাম। এবার বল ওর পাশে শুবি কিনা?'

'লোকটার আংটিতে কি একটা টোপাকুল সাইজের হীরে ছিল?' কালাচাঁদ বলল।

'গুড—' দারোগা উঠে দাঁড়াল, মর্গের সাদা কোট পরা লোকটাকে ধন্যবাদ দিয়ে গাড়িতে বসল, পিছনে হাবিলদারের সঙ্গে কালাচাঁদ। দারোগা বলল, 'হিরের কথা আর দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করলে জিভ কেটে পেছনে ঢুকিয়ে দেব।'

'এর নাম অংশুমান ধাড়া। মূর্তি স্মাগলার, আগে জেল খেটেছে। কী ভাবে আমার খোঁজ পেল জানি না। ওর হোটেলে দেখা করতে গেছিলাম। আমি বললাম আমার কাজ পুরোনো বইপত্তর বেচা, কিন্তু মূর্তি-টূর্তির মধ্যে আমি নেই। আমার ঠিকানা রেখে দিল। আরবের একটা শেখকে এর মধ্যে কোথা থেকে ও জোটাল কে জানে? সে আমার মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে বলল নারকেলডাঙার পঞ্চানন বাবার মূর্তিটা চাই-ই।'

'ঠিক আছে, আপাতত তোর কথা বিশ্বাস করলাম। মার্ডারটা হয়েছে আজ সকালে। তোর ভাগ্য খুব ভালো যে তুই কাল রাতে আর আজ সারাদিন আমাদের সঙ্গে লকআপে ছিলি, নাহলে কারোর বাপের সাধ্য ছিল না তোকে বাঁচায়। ওর সঙ্গে নাকি একটা শেখকে ঘুরতে দেখা গেছিল। যদি তোর কথার একটা শব্দও মিথ্যে হয়, তবে তোর মুখটাও ও ভাবে পুড়িয়ে দেব, শালা এত নৃশংস খুনি কখনও দেখিনি।'

কালাচাঁদ নাকের নীচে জমে থাকা রক্ত খুঁটতে খুঁটতে মনে মনে বলল, 'পঞ্চাননবাবা তুমি যা কর ভালোর জন্যেই কর। ভাগ্যিস আমায় পুলিশের জিম্মায় রেখেছিলে।'

দারোগা বলল, 'মালটা কোথায় রেখেছিস?'

কালাচাঁদ বলল, 'কুমোরটুলি।'

'চল, জায়গাটা দেখিয়ে দিবি।'

কালাচাঁদ মনে মনে চিন্তা করল—এরপর কী? পুলিশ তার কাজ শেষ করে তাকে ছেড়ে তো দেবে কিন্তু সেই ময়ূরপঙ্খি যদি আবার তাদের এঁদো খালে আসে, তার কী হবে? এরপর পুলিশের সাহায্য পাওয়া শক্ত হবে। কালাচাঁদ ভাবল যা থাকে কপালে সে একটা রিস্ক নেবে, কালাচাঁদ বলল, 'আমি জানি খুনিকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে? তবে দেরি করলে পাখি উড়ে যাবে।'

॥ সাঁইত্রিশ ॥

দুই ব্যাটালিয়ন পুলিশ ঠাকুরপুকুরে বিশাল বাড়িটার কাছে যখন পৌঁছোল, তখন

BanglaBook.org

ময়ূরপঙ্খি নোঙর তুলছে। অতর্কিত আক্রমণের জন্য শেখ ও তার খুনে সাঙ্গপাঙ্গোরা প্রস্তুত ছিল না। তবু বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী ছাড়ার পাত্র যে তারা নয় সেটা পুলিশ বুঝতে পারল যখন পুলিশভ্যানের কাঁচটা ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল আর ড্রাইভারের কাঁধে এসে গুলিটা লাগল। লড়াই শুরু হতে আত্মরক্ষার্থে পুলিশবাহিনী চারদিক থেকে শেখের গাড়িটাকে গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিল। লড়াই বেশিক্ষণ চলল না, পুলিশ চারটে লাশ গাড়ির দরজা খুলে মাটিতে এনে শুইয়ে দিল। কালাচাঁদ মৃতদেহদের সনাক্ত করল। দারোগা পাশ থেকে বলল—ডিপোর্ট-ফিপোর্ট করার ফ্যাচাং অনেক হতো। ফালতু ঝামেলা।

ঠাকুরপুকুর থেকে ফিরে কালাচাঁদকে পুলিশের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটাতে হল। শেখের ব্যাগে এমিরেটস-এর দুবাইয়ের টিকিট পাওয়া গেল। দমদম থেকে সন্ধ্যার ফ্লাইটে পাখি ডানা মেলত। কলকাতা পুলিশ সরকারি তরফে সৌদি আরবে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করল এবং সৌদি আরবের সরকার শেখকে সনাক্ত করল। পুলিশ জানালো শেখের আসল নাম সৈয়দ আজিজ। আশহার সাইকিয়াট্রিক হাসপাতাল থেকে পলাতক এক মানসিক রোগী। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় যে এই ব্যক্তি ভয়ানক বিপজ্জনক। এই পাগলের দৃঢ়বিশ্বাস যে ইনি বিখ্যাত আরব গণিতজ্ঞ আল খোয়ারিজমির পুনর্জন্ম। সারা পৃথিবীর অঙ্ক নিয়ে বিস্তর পড়াশোনা করেছেন এবং প্রাচীন অঙ্ক পাঠোদ্ধার করার জন্য অনেকগুলো ভাষা তিনি শিখেছিলেন। অনেক পড়াশোনা করে ইনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে পৃথিবীর সমস্ত অঙ্কের জন্ম আরবে এবং এর পাগলামি হল ইনি পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে অন্যান্য সভ্যতার পুরাতন, দুষ্প্রাপ্য সব অঙ্কের বই জোগাড় করে সেগুলো পোড়াতেন যাতে কেউ দাবি না করতে পারে গণিতের কোনো বিষয় আরবের বাইরে সৃষ্টি হয়েছে। তারপর ইনি তার থিসিস সৌদি আরবের একটি বিজ্ঞানের পত্রিকায় ছাপাবার জন্য জমা দেন। লেখা মনোনীত না হওয়ায় উনি সেই পত্রিকার সম্পাদককে তার অফিসে ঢুকে হালাল করেন ও জেলে যান। বিচারের সময় তার মাথার গোলমাল প্রকটভাবে লক্ষ করে তাকে মানসিক হাসপাতালে কড়া পাহারায় রাখা হয়। হেলথ অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র জানায় যে, এখনও পুলিশের তদন্ত চলছে কী ভাবে লোকটা অত কড়া পাহারার মধ্যে দিয়ে পালিয়ে গেছিল। শেখের দুই চেলাকেও ইন্টারপোল সনাক্ত করল। এরা আরবের দুই কুখ্যাত ভাড়াটে খুনি।

কালাচাঁদের সমস্ত বয়ান পুলিশ নোট করল। দালালটাকে বাড়ির পিছনের বাগানে কবর দেওয়া হয়েছিল সেটাও পুলিশের কুকুর শুঁকে বের করল। সেদিন ঠাকুরপুকুরে পুঁথি পোড়াবার সময় শেখের চোখে যে উন্মত্ততা কালাচাঁদ দেখেছিল তা তার মনে যেন গেঁথে গেছে। কালাচাঁদ ভাবল বক্তিয়ার খিলজি যখন নালন্দা

BanglaBook.org

পোড়াচ্ছিল তখনও কি তার চোখে এরকম নিষ্ঠুর উন্মত্ততা ছিল? আর বক্তিয়ার খিলজিরা কি নিছক আনন্দের জন্যে আমাদের দেশের দামি দামি পুঁথিগুলো পুড়িয়েছে নাকি সৈয়দ আজিজের মতো তাদেরও উদ্দেশ্য ছিল আমাদের দেশের বিশেষ বিশেষ বই জ্বালিয়ে দেওয়া যাতে তাদের দেশের লোকেরা সেই সব আবিস্কারের কৃতিত্ব দাবি করতে পারে? এর জবাব কালাচাঁদের কাছে নেই।

আর একটা কাজ বাকি ছিল। কুমোরটুলি থেকে অ্যালুমিনিয়ামের মুখওয়ালা পঞ্চানন বাবাকে উদ্ধার করে আবার কাদাপাড়ার মন্দিরে বসিয়ে দিয়ে কালাচাঁদ মনে স্বস্তি পেল। রাতে মন্দিরের চাতালে বসে স্ট্রীট লাইটের আবছায়ায় পাড়ার কয়েকটা ছেলে ছোকরা তাস পেটাচ্ছিল—চারপাশে মদের গন্ধ। দারোগাকে দেখে সসম্ভ্রমে-ভয়ে উঠে দাঁড়াল। দারোগা বলল, 'এই জায়গাটার সম্বন্ধে অনেক ব্যাড রিপোর্ট আছে। এই মূর্তি দিয়ে গেলাম। কাল থেকে এই মন্দিরের চাতালে যেন তাসের জুয়া না খেলা হয়। জায়গাটা ভালো ভাবে আগাছা ছেঁটে পঞ্চাননবাবার শিবলিঙ্গ যেন রোজ পুজো করা হয়। তাস হাতে যদি তোদের একটাকেও দেখি এখানে তবে তোদের লিঙ্গ কেটে হিজড়ে বানিয়ে দেব।' একটা ছোকরা নেশার চোটে জয় বাবা পঞ্চানন বলে চেঁচিয়ে উঠল, বাকিরা সম্ভবত হিজড়া না হওয়ার ভয়ে তার সঙ্গে বাবার জয়ধ্বনিতে গলা মেলাল।

থানা থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় এগারটা। ঘরের অবস্থা সেই যুদ্ধক্ষেত্রের মতো লন্ডভন্ড। আয়নায় নিজেকে দেখে আঁতকে উঠল কালাচাঁদ— চোখের নীচে রক্ত জমাট হয়ে নীল হয়ে গেছে, জামার পকেটটা ছিড়ে কর্তামশাইয়ের নুলো হাতের মতো ঝুলছে। লন্ড্রির মালিক এটা দেখলে কি হবে তা ভাবার মতো শক্তি কালাচাঁদের শরীর-মনে নেই। তাড়াতাড়ি নাকের রক্ত-টক্ত মুছে কালাচাঁদ একটা বাসি পাউরুটি ছিল তাই খেলো চিনি দিয়ে। চোখের পাতা দু'টোর যেন পঞ্চাননমূর্তির ওজন। এক গ্লাস জল খেয়ে কালাচাঁদ বিছানায় ঢলে পড়ল।

।। আটত্রিশ ।।

রাত থাকতে থাকতে কালাচাঁদের ঘুম ভেঙে গেল—উত্তেজনা আর ভয় সারা শরীরে চাদর মুড়ি দিয়ে রয়েছে। সকালের আলো ফুটতেই কালাচাঁদ চলল শিয়ালদহ স্টেশনে। সেখান থেকে ফার্স্ট ট্রেন ধরে পাঁচমুড়ো।

পাঁচমুড়োতে ট্রেন থামতেই পরিবর্তনটা নজরে এলো কালাচাঁদের। অনেক লোক

কাচ্চাবাচ্চা-পরিবার নিয়ে নামল আজ পাঁচমুড়ো স্টেশনে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কালাচাঁদ দেখল ঘুমন্ত গ্রামটা যেন কোন্ জাদুকাঠির ছোঁয়ায় জেগে উঠেছে। স্টেশনের রাস্তা দিয়ে পিলপিল করে লোক চলেছে কোথায়? রাস্তাটা মোড় নিয়ে পাথুরে ঢিপিটা পেরোতেই দূরের নিশিজলার মাঠের দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল কালাচাঁদ। জলা মাঠের ওপর একটা পুরোনো মন্দির দাঁড়িয়ে আছে, মাথায় পতপত করে উড়ছে পতাকা। সত্যি সত্যি যেন আলাদীনের প্রদীপের দৈত্যের ভোজবাজির ইমারত, একদিনে তৈরি। মন্দিরের সামনে মেলা বসে গেছে। নাগরদোলা, চরকি, সারি সারি দোকানপাট বসে গেছে। মন্দিরে ঢোকার জন্য মানুষের একটা লাইন সাপের মতো এঁকে-বেঁকে মাঠে নেমে গেছে ; ছেলে-বুড়ো-বুড়ি-মহিলা কাতারে কাতারে ভিড় করে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের চাতালে একটা সাদা ধুতি আর গেরুয়া চাদর জড়িয়ে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে সদানন্দ ভটচাজ।

'সব্বোনাশ।' কালাচাঁদ শিউরে উঠল। সকলে অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে যে সে পঞ্চাননঠাকুরের মূর্তি নিয়ে আসবে।

মন্দিরের বাইরে একটা মঞ্চ বানানো হয়েছে, সেখানে চেয়ার পাতছে দু'টো লেবার, একটা মেকানিক মাইক লাগাচ্ছে আর আফজল দাঁড়িয়ে তদারকি করছে। কালাচাঁদকে দেখে হাত নাড়ল আফজল। কালাচাঁদও হাত নাড়ল।

মন্দিরের সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে ছিল বদন, কালাচাঁদকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে এল—'কোথায় হাওয়া হয়ে গেছিলে বল তো? তোমার পঞ্চানন মূর্তি নিয়ে আসার কথা।' বদনের গলার স্বরে উদ্বেগ। 'আমি আর মামা বিকেলে তোমায় খুঁজতে যেতাম। আরে তোমার এ'দশা করল কে?' বদন শিউরে উঠল। 'মেরে মুখ বেঁকিয়ে দিয়েছে তোমার।'

'আমি ঠিক আছি—' তারপর কালাচাঁদ দু'দিক দেখে মুখ নামিয়ে বলল—'ধাড়া টাকা দিয়েছে?'

'এক সুটকেস ভর্তি টাকা দিয়ে পঞ্চাননমঙ্গল কিনে নিয়ে গেছে। তোমার খোঁজ করছিল।'

'দু'কোটি?' কালাচাঁদের চোখ চকচক করে উঠল।

'তিন, ধাড়া বলেছে এক কোটি পরে এসে নিয়ে যাবে।'

কালাচাঁদ আকাশের দিকে তাকাল, তারপর বদনকে বলল, 'কম্পিউটারের ফ্যাক্টরির জমিটা চটপট কিনে ফেল।'

মন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়ে সদানন্দ। সেদিকে তাকিয়ে বদন বিড়বিড় করে বলল, 'বুড়ো খেপে আছে—কাল সারাদিন যখন পেরেছে মামাকে আর আমাকে গালাগাল করেছে।'

BanglaBook.org

'কেন?'

'মঙ্গলকাব্যটার কোনো কপি রাখা হয় নি। বুড়ো নাকি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল ওটা ইউনিভার্সিটির বাংলা ডিপার্টমেন্টে জমা করবে।'

'হরু ঠাকুর আর একবার লিখে দিতে পারবে না?'

'মামাকে বলা হয়েছিল, মামা বলেছে তখন ঘোরের মধ্যে লিখেছে। আবার নতুন করে লেখা সম্ভব নয়। তাই শুনে বুড়ো প্রচণ্ড খেপে গেল। আমি ওই খেপচুরিয়াস বুড়োর ধারে কাছে যাচ্ছি না। তুমি যাও।'

রুমাল হাতে নাক চেপে মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে চাতালে উঠল কালাচাঁদ।

'তোর এত দেরি হল কেন কালা?' সদানন্দ বললেন। 'আমরা এদিকে চিন্তায় মরি! তোর কাল সকালে চয়নবিলের ঘাটে থাকার কথা।'

কালাচাঁদ বলল, 'একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল কর্তামশাই।' কালাচাঁদ মুখ থেকে রুমাল সরাল।

'ইস!' সদানন্দ শিউরে উঠলেন। 'কী ভাবে হল?'

কী ভাবে হল সেটা স্মরণ করে ভয়ে কেঁপে উঠল কালাচাঁদ।

'খুব বেঁচে গেছিস?'

'হ্যাঁ, বাবা পঞ্চানন বাঁচিয়ে দিয়েছেন।'

সদানন্দ নীচু গলায় বলল, 'কাল সকালে তোকে চয়নবিলের ঘাটে না দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম রে কালা। এদিকে স্বপ্নের কথা শুনে গাঁয়ের লোক সব এক এক করে জড়ো হচ্ছে চয়নবিলের ধারে। আর তুই শেষ পর্যন্ত এলি না। ভয়ে মনে হচ্ছিল আবার একটা স্ট্রোক হবে—'

'কর্তামশাই, আমায় ক্ষমা করে দেন—' কালাচাঁদ কাকুতিমাখা গলায় বলল।

'তবে এটা করলি কখন বল তো? আমরা কেউ বুঝে উঠতে পারছি না।'

'আমি কী করলাম?' কালাচাঁদ অবাক।

'ঘাট থেকে প্রথমে তো আমরা কেউ দেখতে পাইনি, তারপর ডোমের ছোটো ছেলেটা দেখাল, বাবা পঞ্চানন বিলের পাড়ে কাদা মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে। সকলে ছুটে গেল, জল দিয়ে কাদা পরিষ্কার করে দেখলাম তোর পঞ্চানন বাবার মূর্তি। মূর্তিটা দারুণ বানিয়েছে রে তোর কারিগর—পাঁচফুট উঁচু, একদম যেন জীবন্ত। পরে কথা হবে, তাড়াতাড়ি আগে ভিতরে গিয়ে হরু ঠাকুরের সঙ্গে দেখা কর। হরু ঠাকুর এখুনি মন্দিরের দরজা বন্ধ করে বাবার ভোগ-পুজো শুরু করবে, বেচারা তোর জন্য খুব চিন্তায় আছে।

কালাচাঁদ মন্দিরের দরজায় এসে দাঁড়াল। ভিতরে বাবা পঞ্চাননের বিশাল লিঙ্গ ; বাবার একটা মুখ দেখা যাচ্ছে। এটা পুব দিক, বাবা তৎপুরুষ—ধ্যান ও

BanglaBook.org

জ্ঞানের প্রতীক। বাবার মুখে যেন একটা চাপা হাসি। প্রভাতের সূর্যের আলো বাবার মুখে রক্তিমাভা রাঙিয়ে দিয়েছে। কালাচাঁদ অবাক হয়ে দেখল রূপোর মতো ঔজ্জ্বল্য বাবার মুখে। এক সময় এই মস্তক ধৌত পানি কালাজ্বরের রোগীদের যমের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে গোটা পঞ্চমুণ্ডকে রক্ষা করেছে। বদন ও কর্তামশাইয়ের সঙ্গে কালাচাঁদ মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিল। বাইরে ভক্তরা 'জয় বাবা পঞ্চানন' বলে জয়ধ্বনি করে উঠল।

'হরু ঠাকুর—' কালাচাঁদ অস্ফুট গলায় বলল।

পূজারির আসনে বসে হরু ঠাকুর পিছন ফিরে তাকিয়ে কালাচাঁদকে দেখল। হরু ঠাকুরের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জলধারা নামতে লাগল। মন্দিরের গর্ভগৃহের স্বল্প পরিসরে বাবা পঞ্চাননকে ঘিরে চারজন প্রতারক। চোখ মুছে হরু ঠাকুর বলল, 'তোর জন্য খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল রে কালা। ওই খুনিগুলো ভয়ানক।'

কালাচাঁদ বলল, 'সব ঠিক আছে। চিন্তা নেই কোনো।'

'বাবাকে দেখেছিস? কী সুন্দর।'

কালাচাঁদ মাথা নাড়ল।

'বদন, আমি আর কর্তামশাই ঠিক করেছি টাকাটা দিয়ে বাবার মন্দির পুনর্গঠন করব। এই মন্দিরের দালানে আবার কবিগান, ঝুমুর গান, কবিয়ালের আখড়া, কবির লড়াই এসব হবে। আমরা খুঁজে খুঁজে আনব হারিয়ে যাওয়া বাউল-ফকির-কবিয়ালদের। আমরা ধরে রাখব আমাদের প্রাচীন গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য। তোর যদি আপত্তি না থাকে—'

কালাচাঁদের চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা হয়ে গেল। ওইটুকু মন্দিরের গর্ভগৃহের ভিতরে যেন ঠাসাঠাসি ভিড়—বলরাম, ভানুমতী, নন্দীধন যেন কাল অতিক্রম করে এসে উপস্থিত হয়েছে। হরু ঠাকুরদের মতো তারাও যেন কালাচাঁদের উত্তর শোনার জন্য অধীর অপেক্ষা করছে। গর্ভগৃহের কোনায় আধো-অন্ধকারে আর একজন উৎকণ্ঠায় দাঁড়িয়ে আছে—কালাচাঁদ চিনতে পারল—'মধু' চোর, যে প্রতিজ্ঞা করেছিল তার বংশধর পাঁচমুড়োর কুলদেবতার মন্দিরের সংস্কার করাবার অর্থ দেবে। পাঁচমুড়োর আদি কুলদেবতা তো তার সামনেই। কালাচাঁদ আবিষ্কার করল কখন যেন আনন্দের প্রস্রবণ তার শুষ্ক পাথুরে বুক বিদীর্ণ করে তার চোখ দিয়ে ঝরতে শুরু করেছে। কালাচাঁদ কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে বলল, 'আমার জন্ম সার্থক, পাঁচমুড়োর পঞ্চানন মঙ্গল কর।'

তারপর কালাচাঁদ চোর মন্দিরের গর্ভগৃহে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

সমাপ্ত

BanglaBook.org

অকারাদিক্রমে শব্দ-সূচি

অ—অপরুব-অপরূপ

আ—আইলাহা-আসিলে, আখর-অক্ষর, আগর-অগুরু, আচরিজ-আশ্চর্য, আঝর-ঝরঝর করে, আঠকপালী-খন্ড কপালিনী, আড় দীঠি-বক্র দৃষ্টি, আঙ্গদ-কেয়ূর, আন পাণী-অন্ন জল, আন বাটে-অন্যপথে, আন্তরে-অন্তরে, আন্ধল-অন্ধ, আপুণী-স্বয়ং, আবগাহী-তলাইয়া, আরপি-অর্পণ করি, আয়াসিলী-শ্রান্তা, আরতিল-আর্তি যুক্ত ক্রন্দন, আলক-চুল, আলপাউ-অল্পায়ু, আশোআশেঁ- আশ্বাসে, আন্ধে সন্ধে-আমরা সকলে, আনলে-আগুনে, আবশেষ-অবশেষ, আরণে-অরণ্যে, আরতী-অভিলাষ, আসহন-অসহনীয়

ই—ইশর-ঈশ্বর

ঈ—ঈশর-ঈশ্বর

উ—উচে-উচ্চে, উতরল-অতিশয় চঞ্চল, উদগমতী-উৎকণ্ঠিত চিত্তে, উপাড়িল-উৎপাটিত করিল, উমত-উন্মত্ত, উয়িল-উঠিল

ঊ—উঝট-চরণাগ্রে আঘাত, উতাপঠ-খিন্ন, ব্যথিত

এ—একচীতে-অনন্যমনে, একলী-একাকিনী, এড়ি-ত্যাগ করিয়া, এবেঁ-এখন, এয়ি-এই

ও—ওগগর ভত্তা-ফ্যানা ভাত, ওঠ আধর-ওষ্ঠাধর

ক—কভো-কখনো, করাতেঁ-করপত্র দ্বারা, কলিআঁ-কলঙ্ক, কহিলান্ত-কহিলেন, কাঁচ কনয়া-কাঁচা সোনা, কাঙ্কড়ী-কাঁকড়, কাঠদাপ-বৃথা আস্ফালন, কাঢ়ে রাএ-চিৎকার করে, কানড়ী খোঁপা-কর্ণাটদেশের রীতিতে বাঁধা কবরী, কুসুম কোঁঅলী-কুসুম কোমল, কূলআ ঘাটে-খেয়া ঘাটে, কেমতেঁ-কেমন করিয়া, কৈলে-করিলে, কৌলে-ক্রোড়ে

খ—খর সোঁত-খর স্রোত, খঙ্গ-ক্রোধ, খেতি-কর্ষণ, খোম্পা-খোপা, খেড়া-খেলা, খোনেকেঁ-তৎক্ষণাৎ

গ—গাআঁ-গান করিয়া, গাইক ঘিত্তা-গাভীর ঘি

ঘ—ঘাঅ-ক্ষত

চ—চখুত-চোখে, চন্ডবাতে-প্রচণ্ড বাত্যায়, চলি জাহা-চলে যাও, চাহিতে-খুঁজিতে, চিআয়িলী-জাগাইল, চৌদিশে-চারিদিকে

ছ—ছছন্দে-স্বচ্ছন্দে, ছাতীঅন-ছাতিম, ছান্দে-ছন্দে, ছিন্ড-ছিন্ন

জ—জালিআঁ-জ্বালাইয়া, জিআইল-বাঁচাইল, জীহা-জিভ, জুতি-জ্যোতিঃ, জুদ্ধ-যুদ্ধ, জেন-যেন

ঝ—ঝাঁটে-ঝটিতি

ট—টালিলেক-বিচলিত করিল, টেস্টন-ধূর্ত

ঠ—ঠাঠী-প্রগলভতা

ড—ডরায়িলী-ভয় পাইল

ণ—নাম্বিলা-অবতরণ করিল

ত—তরাস-ত্রাস, তড়পথেঁ-স্থলপথে, তবেঁহো-তথাপি, তম্ভ-স্তম্ভ, তহি-তত্র, তিরছ-তির্যক, তিরী-স্ত্রী, তেঁহ-তদ্রূপ, তীন-তিন, তুতী-স্তুতি, তেঁএ-সেইজন্য, তেঁহ-তদ্রূপ, তোহ্মার-তোমার, তোহোর-তোমার, তোহাঁক-তোমাকে,ত্রিদশগণের-দেবগণের

থ—থান-স্থান, থাহা-জলনিম্নস্থ ভূমি

দ—দহএ-হ্রদে, দিহ-দিও, দাঢ়ী-দাড়ি, দাম্ভায়িলা-দাঁড়াইল, দীঘল-দীর্ঘ, দীঠি-দৃষ্টি, দুঅজ-দ্বিগুণ, দুখদিআঁ-দুঃখের, দুঠ-দুষ্ট, দুতী-দ্যুতি, দুবল-দুর্বল, দুরুবার-দুর্দান্ত, দুহেঁ-দুজনে, দুআর-দুয়ার, দেহযুতী-দেহকান্তি

ধ—ধাম-ধর্ম্ম, ধারে ঝরেঁ-অজস্র ধারায় ঝরে, ধির ধির-সতর্কতাবলম্বনে, ধেআই-ধ্যান করি

ন—নইকুলে-নদীতীরে, নবসূর-নবোদিত সূর্য, নমসি-নমস্কার করি, নাঅ-নৌকা, নিকুঁপে-নিশ্চুপে, নিছড়িআঁ-অধোবচনে, নিতি-নিত্য, নিচোল-উত্তরীয় বস্ত্র, নিধুবন-রতি বিলাস কুঞ্জ, নিলজী-লজ্জাহীনা, নিবেদিলোঁ-নিবেদন করিলাম, নেত পাটোল-রেশমি কাপড়, নেহ-প্রীতি, নেহালী-নিরীক্ষণ করিয়া

প—পরজা-প্রজা, পরসন-প্রসন্ন, পরিহরি-পরিত্যাগ করিয়া, পত্রীল-পরিধান করিল, প্রভাত আদিত-সকালের সূর্য, পন্ডিআঁ-পন্ডিত, পাএ-পায়ে, পাকিল-পক্ক, পাছেঁত-পিছনে, পাটে-সিংহাসনে, পাস্তর-প্রান্তর, পো-পুত্র, পাটোল-রেশমি কাপড়, পাটাবুক-নির্ভীক, পালাহা-পালিয়ে, পাস-পাশে, পুণমতী-পুণ্যবতী, পিআসত-পিপাসায়, পেলাইআঁ-ফেলিয়া, পৈসী-ঢুকে, পোহাইল-প্রভাত হইল, পৃথুবি-পৃথিবী

ফ—ফুকরে-চিৎকার করে, ফুটিলছে-ফুটেছে

ব—বঅনে-বদনে, বউল মাল-বকুল ফুলের মালা, বনমাহ্লী-বনমল্লিকা, বুয়িল-বলিল, বরিষে আঝর-ঝরঝর বর্ষণ ঝরে, বহু-বউ, বাএ-বাতাসে, বাখান-ব্যাখ্যান, বাট-পথ, বান্ধে-বাঁধে, বারিষী-বর্ষা, বাঢ়এ-বৃদ্ধি পায়, বাসলী-বাগদেবী, ভগবতী, বিচার-হিসাব, বিজুরি-বিদ্যুৎ, বিহা-বিবাহ, বিহাণে-প্রভাতে, বুক মেলে চীর-বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে, বুয়িলেঁ পাতেঁ পাতেঁ-পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিল, বেঢ়িআঁ-বেষ্টন করিয়া, বেথা-ব্যথা, বেজ-বৈদ্য।

ভ—ভকতী-ভক্তি, ভরায়িলিঁ-পূর্ণ করিলি, ভঞেঁ-ভয়ে, ভাগেঁ-ভাগ করে, ভৈলোঁ-লইলাম

ম—মচ্ছা-মাছ, মনত-মনের, মরমের হীত-প্রাণের বন্ধু, মল্লতোর-তোড়া মল, মাঞেঁ-মায়ে, মাষ-মাস, মাহাজন-শ্রেষ্ঠ পুরুষ, মুরুছা-মূর্ছা, মেদনীত-পৃথিবীতে, মোঞে-আমি, মোহোর-মম

য—যবেঁ-যদি, যোখমাপে-পরিমাণে, যোড়-যুক্ত

র—রআনী-রজনী, রম্ভঅ পত্তা-কলাপাতা, রাখুক-রক্ষা করুক, রাক্ষসিবেলাএ-সন্ধ্যাবেলায়, রাতী-রাত

ল—লঅ-লও, লুড়িআঁ-লুণ্ঠন করিয়া, লুলিত-লুণ্ঠিত, লোটন-বিন্যস্ত কেশপাশ

শ—শিঅর-শিয়র, শিশুমতী-বালস্বভাব, শিশের-সিঁথির, শুখা-শুকনো, শুন-শূন্য, শুণী-শুনিয়া, শেত-শ্বেত, শোভ-শোভা

স—সকতী-শক্তি, সগর্গ-স্বর্গ, সত্বরে-সতর্কভাবে, সন্ধাঞিঁ-সকলে, সামী-স্বামী, সংপুটে-যুক্ত করে, সরোঅরে-সরোবরে, সিনিয়া-স্নান করিয়া, সুন্ড-শুঁড়

হ—হাতাইড়া-হাতুড়ি, হাথ-হাত, হিআ-হৃদয়, হিছোলেঁ-হেঁচকা টানে, হের-হেথা

বাংলা লিপির ক্রমবিকাশ

খৃষ্টীয় শতাব্দী

বর্তমানে বাংলা অক্ষর	৭ম	৮ম	৯ম	১০ম	১১শ	১২শ	১৩শ	১৪শ	১৫শ	১৬শ
ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক
খ	খ	খ	খ	খ	খ	খ	খ	খ	খ	খ
গ	গ	গ	গ	গ	গ	গ	গ	গ	গ	গ
ঘ	ঘ	ঘ	ঘ	ঘ	ঘ	ঘ	ঘ	ঘ	ঘ	ঘ
ঙ		ঙ	ঙ		ঙ	ঙ	ঙ	ঙ	ঙ	
চ	চ	চ	চ	চ	চ	চ	চ	চ	চ	চ
ছ					ছ	ছ	ক	ছ	ছ	ছ
জ	জ	জ	জ	জ	জ	জ	জ	জ	জ	জ
ঝ	ঝ			ঝ	ঝ	ঝ	ঝ	ঝ	ঝ	
ঞ	ঞ	ঞ	ঞ	ঞ	ঞ		ঞ		ঞ	
ট	ট	ট	ট	ট	ট	ট	ট	ট	ট	ট
ঠ		ঠ	০	ঠ	ঠ	ঠ		০	ঠ	ঠ
ড	ড	ড	ড	ড	ড	ড	ড	ড	ড	ড
ঢ				ঢ	ঢ	ঢ	ঢ	ঢ	ঢ	ঢ
ণ	ণ	ণ	ণ	ণ	ণ	ণ	ণ	ণ	ণ	ণ
ত	ত	ত	ত	ত	ত	ত	ত	ত	ত	ত
থ	থ	থ	থ	থ	থ	থ	থ	থ	থ	থ
দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
ধ	ধ	ধ	ধ	ধ	ধ	ধ	ধ	ধ	ধ	ধ
ন	ন	ন	ন	ন	ন	ন	ন	ন	ন	ন
প	প	প	প	প	প	প	প	প	প	প
ফ	ফ	ফ	ফ		ফ	ফ	ফ	ফ	ফ	ফ
ব	ব		ব	ব	ব	ব	ব	ব	ব	ব

বাংলা লিপির ক্রমবিকাশ

বর্তমানে বাংলা অক্ষর	খৃষ্টীয় শতাব্দী										
	৭ম	৮ম	৯ম	১০ম	১১শ	১২শ	১৩শ	১৪শ	১৫শ	১৬শ
ঙ										
ম										
য										
র										
ল										
ব										
শ										
ষ										
স										
হ										

গ্রন্থপঞ্জি

1. *The Aryabhatiya* – Aryabhata (Printed By E. J. Brill)
2. *Brahma – Sphuta Siddhanta* (Published by Indian Institute of Astronomical and Sanskrit Research, New Delhi).
3. *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* – বড়ু চণ্ডীদাস।
4. *The Arthashastra* – Kautilya.
5. *Computing Science in ancient India* – T. R. N. Rao / Subhash Kak.
6. *বিজ্ঞানের ইতিহাস* — শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন।
7. *বঙ্গ ভূমিকা* – সুকুমার সেন।
8. *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* – সুকুমার সেন।
9. *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Published in 1900.
10. *The Origin and Development of the Bengali Language* – Suniti Kumar Chatterjee.
11. *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* – দীনেশচন্দ্র সেন।
12. *বৃহৎ বঙ্গ* – দীনেশচন্দ্র সেন।
13. *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* – মালাধর বসু।
14. *অশোক অনুশাসন* – চারুচন্দ্র বসু সম্পাদিত।
15. *প্রাচীন বাংলার গৌরব* – হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
16. *Shubhankari* – Santanu Chacraverti.
17. *বাংলা দেশের ইতিহাস* – শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।
18. *The Overall Survey of the Ocean's Shores by Chienese Traveller Huan Ma* (Year 1433).
19. *An anthology of Sanskrit Court Poetry* (Vidyakar's Subhasitaratnakosa) translated by Daniel H. H. Ingalls. (Harvard University Press, 1965).
    প্রাচীন বাংলাদেশের নিসর্গ বর্ণনার বিবরণ এই বই থেকে অনেকাংশে নেওয়া।
20. *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর – স্বাধীন সুলতানের আমল* – সুখময় মুখোপাধ্যায়।
21. *বাঙ্গালার ইতিহাস* – রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
22. *মহাজনী পদাবলি* — চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি।
23. *বাঙলাভাষা আর বাঙালীজাতের গোড়ার কথা* — সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।